ষড়্‌রসোন্যাস

প্রিয়গোপাল দত্ত

No. 6277
22.4.98

কুঞ্জবন, আগরতলা

পশ্চিম ত্রিপুরা

পিন — ৭৯৯০০৬

ফোন—২২-৬৮১০

ষড়্‌রসোন্যাস

প্রকাশ কাল : জুন ১৯৯৫ ইং
প্রকাশক ও গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : রানু দত্ত, কুঞ্জবন, আগরতলা
পশ্চিম ত্রিপুরা
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : সানগ্রাফিক্স. লেইক রোড
আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা
মুদ্রণ : ক্যাক্সটন প্রিণ্টার্স, কৃষ্ণনগর, আগরতলা
পশ্চিম ত্রিপুরা
প্রাপ্তিস্থান :
১। "অক্ষর"
প্রযত্নে : ক্যাক্সটন প্রিণ্টার্স
কৃষ্ণনগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা
ফোন—২২-৪৫০০
২। লক্ষী ভাণ্ডার
মোটরস্ট্যাণ্ড রোড, আগরতলা
পশ্চিম ত্রিপুরা
ফোন—২২-৬২৯৮
৩। ঝর্ণা বুক এজেন্সি
হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা
পশ্চিম ত্রিপুরা
ফোন—২২-৩৯৩১

☐ লেখকের অন্য বই ☐

''নঞ তৎপুরুষ''

"বিচিত্র সন্দর্ভ''

"অনুভব-অন্বেষন"

মূল্য ☐ ১২৫ টাকা

উপক্রমণিকা

আমি পাঠকদের কাছে তত পরিচিত নই কারণ আমার প্রকাশিত বই বিক্রী হয় না। তবু আমি নিভৃতে রীতিমত লিখি, স্বউদ্যোগে প্রকাশ করি এবং বন্ধু-বান্ধব স্বজনদের গিফ্‌ট্‌ দেই কারণ আমি মনে করি স্বপ্রকাশিত বই উপহার হিসেবে যথার্থ।

আমি যা লিখি সেটা ভাল কি মন্দ না সিরিয়াস নিক্তি মাপা চলে না। তবে সাধারণ্যে স্বীকৃতি না পেলেও কিছু সাহিত্য পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে অভিনন্দন পেয়েছি। ওটাই আমার প্রাপ্তি যোগ কিংবা বলা চলে অনুপ্রেরণা যা কিনা আত্মপ্রত্যয় জোগায়—আমার অহমিকা স্ফীত হয়।

আমার রচনাগুলিতে আমার দেখা জগৎই তুলে ধরতে চেষ্টা করি, সমাজে যা হচ্ছে অথবা বিভিন্ন সূত্রে জানা বা দেখা ঘটনা, চোখ ও মন সচল থাকলে কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রতিক্রিয়া হয় কোনরূপ দ্বিধা না করে সেটাই আমি সরাসরি লিখি। কিছু কভারেজ থাকলেও অনৃত ভাষণ নেই পাণ্ডিত্যের কচকচিও না, আছে শুধু নিজের মনের সত্য উপলব্ধি।

বয়স হয়েছে, শারিরীক যন্ত্রও স্বাভাবিক নয়। আজ একরকম তো কাল অন্যরকম, কিন্তু লেখা লেখির মধ্যে মগ্ন থাকলে মন খারাপ শরীর খারাপ ভাবটাই ডানা মেলে উড়ে যায়। এর উপর কেউ যদি আমার লেখা পড়ে জানায় 'সাবলীল লেখার জন্য ধন্যবাদ' তখন মনোবলটাই ধারালো হয়ে যায়—আমি সতেজ থাকি, আত্মশক্তি ফিরে পাই।

তা আমার লেখা যেমনই হউক এই অভ্যেসটাও যদি কেউ কেড়ে নেয় তবে আমার বেঁচে থাকাটাই বৃথা মনে হবে।

আগরতলা

জুন ১৯৯৫ ইং — লেখক

ষড়্‌রসোন্যাস

সূচীপত্র

১।	ভাগ্যচক্র	১—২১
২।	ওয়েদার কক্‌	২২—৩০
৩।	কে কতটুকু	৩১—৩৫
৪।	ভূয়োদর্শন	৩৬—৪১
৫।	ওয়ার্ক কালচার	৪২—৬৬
৬।	নাম-সুনাম-দুর্নাম	৬৭—৭৭
৭।	স্কোয়ার পেগ ইন্‌ এ রাউণ্ড হোল	৭৮—৮৭
৮।	সফর	৮৮—১৪৫
৯।	বিড়ম্বনা	১৪৬—১৬১
১০।	রহস্য	১৬২—১৬৩
১১।	বাবা শালা	১৬৪
১২।	দাগ	১৬৫—১৬৬
১৩।	দুর্মর চিহ্ন	১৬৭—১৭৪
১৪।	স্নেহানাবদ্ধ	১৭৫—১৮২
১৫।	রূপান্তর	১৮৩—১৯৮
১৬।	অত্যাগসহন	১৯৯—২১৫
১৭।	শুভস্য শীঘ্রম	২১৬—২২৩
১৮।	দুর্বোধ	২২৪—২৩৫
১৯।	খোয়াব	২৩৬—২৪৯
২০।	বর্ণচোরা	২৫০—২৫৪
২১।	পরম্পরা	২৫৫—২৬৭
২২।	ঠেকে শেখা	২৬৮—২৭৬
২৩।	গীতিকাব্যের গৌরচন্দ্রিকা	২৭৭—২৮২
২৪।	আত্মবীক্ষণ	২৮৩—২৯৯
২৫।	অভিজ্ঞান লিপি	৩০০—৩১৬

ভাগ্যচক্র

ভাগ্যলিপি কি? জানতে ইচ্ছা হয় শ্রীমানের। ইচ্ছা হয় হাতটা একটু দেখায় কোন একজন জ্যোতিষীকে। কুষ্ঠি থাকলে কুষ্ঠির বিচার করিয়ে নিলে মন্দ হয় না। কিন্তু কুষ্ঠি ত তার নেই!

রাস্তায় অনেকেই বসে বিচার করে, তাদের দেখাতে মন চায় না, ওরা অনেক আজে বাজে কথা বলে। না বললে, বলবে হস্তরেখা পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে।

তাই যাকে তাকে হাত দেখাবে না। খোঁজে আপন মনে কোন একজন ভাল জ্যোতিষীকে পায় কি না। এত যে দুর্দ্দশা তার প্রতি পদে পদে, জ্যোতিষী হাত দেখে হয়ত একটা বিহিত দিতে পারে।

চলতে চলতে দৃষ্টি পড়ে একটা মস্ত বড় সাইন বোর্ডে। লিখা আছে, "জগত্তারিণী জ্যোতিষালয়"।

নাম লেখা আছে জ্যোতিষের, পণ্ডিত নীলকণ্ঠ জ্যোতিষার্ণব এম, এ, বি, এল। জ্যোতিষ চূড়ামণি, জ্যোতির্বিদ্যালঙ্কার, জ্যোতির্ষবিশারদ।

আশেপাশের লোকের কাছে খবর নেয় শ্রীমান, সবাই বলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব নাকি এই জ্যোতিষ দেখতে পান। যে কোন রকমের সমস্যা সমাধান করে দিতে পারেন এই জ্যোতিষী।

ঢুকে পড়ে শ্রীমান. ঢুকতেই নজরে পড়ে অনেক সাইনবোর্ড। ছোট মাঝারি বড় নানা সাইজের সাইনবোর্ড।

একটাতে লেখা আছে, "সারা জীবনের বর্ষফল, ঠিকুজি, শুভাশুভ, ব্যবসায় লাভ লোকসান, কবে চাকুরী হতে পারে, বিদেশ ভ্রমণ, অর্থ, পরীক্ষার ফলাফল, বিবাহ, বাঞ্ছিত লাভ, মোকদ্দমা, লটারী বা অজ্ঞাত কোন কারণে ধনপ্রাপ্তির যোগ

আছে কিনা, যে কোন রকমের সমস্যার নির্ভুল সমাধান এবং জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে আসিতে পারেন, অথবা ডাকমাশুল সহ জন্ম, সময়, সন ও তারিখসহ দশ টাকা পাঠাইলে জানান হয়।"

আর একটাতে আছে, "স্বপ্নপ্রদত্ত মাদুলী, নবগ্রহ কবচ, সর্ব্বগ্রহদোষ নাশক তাবিজ, নাম গোত্র, ও মূল্য ৭॥ টাকা পাঠাইলে, ডাকমারফৎ যত্ন সহকারে পাঠান হয়।"

আর একটাতে, "মহাত্মা প্রদত্ত অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় বিনামূল্য দেওয়া হয়"। "দুষ্টগ্রহের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার উপায়ও বিনামূল্যে দেওয়া হয়।"

আর একটাতে, "যাহারা জীবনে বহু চেষ্টা করিয়াও হতাশা নিয়া ঘুরিতেছেন তাহারা মাদুলী ধারণে নবজীবন লাভ করিবেন।"

মাঝেরটিতে, "বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কলেজের অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, নামজাদা খেলোয়াড় ও চিত্রতারকাগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত"

ঘরে ঢুকতেই লেখা আছে ইংরাজীতে "*Consultation fee Rs. 10/-*" কৌতুহল হয় শ্রীমানের, ঢুকে পড়ে ঘরে। ৫০/৫২ বৎসর বয়সের এক ভদ্রলোক বসে আছেন। ধ্বধবে ফরসা কাপড়, কি পরিস্কার! দেখলেই ভক্তি করতে ইচ্ছা হয়। মনে হয় আশ্চর্য্য শক্তিমান পুরুষ এই ভদ্রলোক। কপালে চন্দন, কিন্তু তিলক কাটা নেই।

কিন্তু, একি! এ যে মাষ্টার মশায়! তারই মাষ্টারদা। পূর্ববঙ্গের একই জেলার লোক। মফঃস্বল সাবডিভিসন শহরে তিনি ওকালতি করতেন। তার আগে কিছুদিন মাষ্টারী করেছেন। পড়িয়েছেন শ্রীমানকে। শ্রীমানের গার্ডিয়ান টিউটার ছিলেন ইনি।

ভাল করে দেখে নেয় শ্রীমান। সন্দেহ হয়। মাষ্টারদা না ব্যাঙ্কসাল কোর্টে ওকালতি করতেন! তবে কি এখন আর উনি উকিল নন্? না, ভুল হওয়ার নয়, মাষ্টারদাই বটে।

এতক্ষণে জ্যোতিষ ভদ্রলোকও মুখ তুলে তাকান ; প্রশ্ন করেন, 'কি চাই, বলুন ? বসুন।'

পরিচয় দেয় না শ্রীমান, প্রথমেই প্রশ্ন করে জানতে চায়, "এইভাবে এতগুলো সাইনবোর্ড দিয়েছেন কেন ?"

ভদ্রলোক সোজা হয়ে তাকান। বুঝতে পারেন না। ভাবটা এই, "নিজের শুভাশুভ জানতে এসেছ, জেনে যাও। এরূপ প্রশ্ন করে নাকি কেউ ?"

ভাল করে চেয়ে দেখেন আবার, হঠাৎ মনে পড়ে চেনেন যেন এই আগন্তুককে। প্রশ্ন করেন, "তুই শ্রীমান না ?"

শ্রীমান শুনেও শুনতে চায়না, যেন খেয়াল নেই। আবার প্রশ্ন করে জানতে চায়, "এতগুলো সাইনবোর্ড দিয়েছেন কেন ?"

রেগে যান ভদ্রলোক, "তাতে তোমার কি ? কাজ থাকে ত বল, ত না হলে বেড়িয়ে যাও।"

শ্রীমান বলে, "না, আমি বলছিলাম, একটা সাইনবোর্ড দিলেই ত সব মিটে যেত, আপনি লেখাপড়া জানেন, মানানসই একটা সাইনবোর্ড দিলেই ত সব বুঝা যেত। তা কি আপনার মনে হয় নি ! "ভ্যারাইটি ষ্টোর্স" এ সাইনবোর্ড দিলেন না কেন ? সব ঢুকে যেত, সবাই বুঝে ফেলত আপনার ক্ষমতা কি ? অথবা 'ভানুমতির খেইল' এ সাইনবোর্ড দিলেও চলত। এতগুলো সাইনবোর্ড দিয়ে কেন মিছিমিছি খরচান্ত হলেন ? রোজগার করতে নেমেছেন, আয় করাটাই আসল নয়, খরচে হিসেব করাটাই আসল এটা, জানেন না ? মানুষের এত শুভাশুভ চিন্তা করে যাচ্ছেন, এ'টা বুঝেন না ? কপালে তিলক থাকলে জমতে ভাল। চোখে গগলস্ দিলে, চোখে চোখ পড়ত না।"

এমনি ধরণ কথায় ও তার ইঙ্গিতে জ্যোতিষ ভদ্রলোক মনঃক্ষুন্ন হন্। বলেন, "আমি না তোর মাষ্টার মশাই হই, গুরুজন হই, এতদিন বাদে দেখা হ'ল, আমার সাথে এভাবে কথা বলতে তোর এতটুকু বাধল না ? কত ছোট তুই ছিলি, তোকে আমি পড়িয়েছি, কোলে পিঠে করেছি, তুই ভেবেছিস, আমার সেসব মনে নেই ? মায়ের পেটের ভাই না হলেও তোকে ত আমি ছোট ভাই'এর মত দেখে এসেছি, সে সব কি তোর মনে নেই ?

শ্রীমান বলে যায়, "সে অনেক পুরোন কথা, যুদ্ধ গেল, রায়ট গেল, দেশ ভাগাভাগি হল, স্বাধীন হ'ল দেশ। আপনি হয়েছেন বিশারদ, চূড়ামণি, আর আমি হয়েছি দিগ্‌গজ। যাক, দেশ ভাগাভাগিতে আপনার খুব সুবিধে হয়ে গেল। বেশ কিছু করে নিচ্ছেন। করে ত খাচ্ছেন! হউক না মুখোস, হউক না মিছে, কিছু এসে যায় না, আপনার কত নাম ডাক লোকদের মুখে মুখে, লাইন দিয়ে লোক আসে আপনার শ্রীচরণে। বেশ দাদা, বেশ।"

এই লঘু পরিহাসে জ্যোতিষী ভদ্রলোক নিজেকে বিব্রত বোধ করেন। রুক্ষ গলায় বলে উঠেন, "তোর ত সাহস কম নয়। আমার ঘরে এসে, আমাকে যা না তাই বলে যাচ্ছিস? জানিস্, তোকে আমি গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারি, পুলিশে দিতে পারি।"

হেসে ওঠে শ্রীমান, হোঃ হোঃ করে হেসে যাচ্ছে। থামতে যেন চায় না। শেষে বলে, "মুখোস পড়েছো, ধরা পড়লেই গায়ে লাগে, না? অনেক মুখোস-ধারী দেখেছি জীবনে সাহস করে বলতে পারিনি, বলতে গেলেই তারা মারতে আসে, পালিয়ে বেঁচে গেছি। কিন্তু তোমার এখান থেকে পালাচ্ছি না, মাষ্টারদা। তুমি যতই আমাকে ধমক দাও, মার, ধর। তোমাকে ছোট বেলায় মেনে চলতাম। তোমার মার খেলে গায়ে লাগবে না। মাষ্টারদার আদরও পেয়েছি, মারও খেয়েছি। তোমাকে ত ঘৃণা করি না মাষ্টারদা, কিন্তু ঘৃণা করি মুখোস-টাকে। তাই ত বলছিলাম "ভ্যারাইটি ষ্টোর্স" নাম দিলে শোনাত ভাল। তোমার ঐ মুখোসের সাথে জমত ভাল।" একটু থেমে, শ্রীমান আবার বলতে থাকে, "মুখ ছিল না, তাই ওকালতিতে সুবিধে হলো না, মামলাই পেতে না, মক্কেল আস্‌ত না। এখন মাদুলি দিয়ে, কবচ দিয়ে, তাবিজ দিয়ে তাদের মামলায় জিতিয়ে দিচ্ছ। মার, ধর, যা ইচ্ছে হয় কর, আগে ত পায়ের ধুলো নেই, এগিয়ে এসো। আরো আগে কেন তোমার সাথে দেখা হয় নি!"

এগিয়ে যায় শ্রীমান, আবার বলতে থাকে, "ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে জ্যোতিষ খোঁজ করে বেড়াচ্ছিলাম, নিজের ভাল মন্দ জানবার চিন্তায় ছিলাম। কি করলে জীবনে সুখ শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারি তার ধাঁধায় ছিলাম। এখন তোমাকে পেয়ে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তুমিই আমার বাঞ্ছিত লাভ। চোখ খুলে

গেল, তুমিই আমার নবজীবন। সর্ব্বগ্রহদোষনাশক তাবিজ। এসো দাদা, এগিয়ে এসো। আগে ত প্রণাম করি।"

মাষ্টারদা রেগে গেছেন, কোন জবাব দেবার ইচ্ছা নেই, কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন, এমন ভাবে একটা লোক বসে হৈ চৈ করলে ব্যবসার ক্ষতি হবে বই কি। এগিয়ে আসেন মাষ্টার দা, সোজা হয়ে দাঁড়ান। ডান হাত দিয়ে এক চড় বসিয়ে দেন শ্রীমানের গালে, চীৎকার দিয়ে বলে উঠেন "তোর এত বড় সাহস! বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার সম্মুখ থেকে।

চড় খেয়ে শ্রীমান একটু গম্ভীর হয়ে যায়। চেয়ে থাকে মাষ্টারদার পানে। শেষে বলে, "তুমি ভেবেছ মাষ্টারদা, ঐ চড় দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে দেবে? যত চড়ই দাও না কেন, তোমার মুখোস ত ফেল্‌তে পারবে না! তোমার কলঙ্ক মোছাতে পারবে না! ভয় নেই, আমি রাস্তায় রাস্তায় তোমার কথা বলে বেড়াব না। কোন বদ্‌নাম করব না। যা দেখে গেলাম, যা বুঝলাম, সব চেপে থাক্‌ব। কেউ তোমার বদ্‌নাম করলে, তোমারই মত চড় বসিয়ে দেব। কিন্তু, মাষ্টারদা, তুমিই বল, এতে কি তোমার কলঙ্ক ঘুচবে?"

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাষ্টারদা ওর সব শুন্‌ছিলেন। চড় দিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। বলেন, "তোর কি? আমার বদনামে, কলঙ্কে তোর কি? তুই কি জানিস্, কি দেখেছিস্? বিয়েই করলি না, ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়ালি, তুই কি বুঝবি? আমার অবস্থায় তুই পড়তিস্ তবে তুইও পাল্টে না গিয়ে পার্‌তি না! যার কোন ঝামেলা নেই, তার মুখে এ সব বড় বড় কথা শোভা পায়। টাকা না থাকলে, টাকা উপায় না করতে পারলে, দুনিয়ায় কিছু নয়। টের পাস্‌নি এখনও?"

অবাক হয়ে যায় শ্রীমান, জানতে চায়, "তুমি না বল্‌তে টাকা কিছু নয়, আদর্শই আসল! সব পাল্টে গেল তোমার শিক্ষা, দীক্ষা আদর্শ?"

উত্তর দেন মাষ্টারদা, "হ্যাঁ অনেক পাল্টে গেছি। দেশে অভাব ছিলনা, প্রাচুর্যও ছিলনা। সে অবস্থায় যা ভেবেছি, দেশ ভাগাভাগির সাথে সাথে যে পরিবর্ত্তন এসেছে সমাজের প্রতিটি স্তরে, পাল্টে না গিয়ে উপায় নেই। বাঁশ-ডলা

দিয়ে যদি ওরা পরিবারের সবাইকে মেরে ফেল্‌তে পারত, বা আমি নিজে পারতাম তবে এই পরিবর্ত্তন থেকে বেঁচে যেতাম। কিন্তু তা ত হলো না, পারলাম না ওদের মেরে ফেল্‌তে। যারা আছে তাদের জন্যেই বাঁচতে হবে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। দেশে ত কিছু জমিজমা ছিল। সবাই চিন্‌তো, যা আয় করতাম চলে যেত। সব ফেলে ছেড়ে আস্‌তে হলো এখানে। ফলে, *I became the only asset of the family, only living property—Only means of livelihood of the family.* শরীর খারাপ হলেও রেহাই নেই। বস্‌ তুই, তোকে আমি সব বলব, তুই-ই ত আমার সবচেয়ে স্নেহের পাত্র ছিলি, বুদ্ধিমান ছাত্র ছিলি, তোর ধাতই আলাদা। এখন বলি, এমন হবে জানলে, তোদের আমি ঐ সব আদর্শের কথা বলতাম না। যখন যেমন পরিস্থিতি সেভাবে চল্‌তে উপদেশ দিতাম। *Life is adjustment to situation.* দিনকাল যেমন সে ভাবে চল্‌বি। আদর্শ বা হিতোপদেশ কিছু নয়। বাপ্‌-দাদা যে ভাবে আমাদের বলে গেছেন, সেভাবে তোদেরও পড়িয়েছি, কিন্তু সত্যিকারের *realisation* ছিল না কি! *What we need most is not to realise the ideal but to idealise the realities* আদর্শ কিছু নয়, বাস্তবই আসল।"

"বস্‌ তুই, অনেকদিন পরে তোকে পেয়েছি, তোকে আমি সব বল্‌ব। জানি, তোর মনে অনেক ঘৃণা জমে আছে। অনেক অভিযোগ মনে চেপে আছিস, শুনে যা সব, তারপর তুই বিচার করিস্‌।"

হাত ধরে শ্রীমানকে বসান, নিজেও বসেন।

শ্রীমান অনুভব করে মাষ্টারদা মনে মনে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছেন। বড় মায়া হলো শ্রীমানের। অনেকদিন পরে মাষ্টার মহাশয়ের সাথে দেখা হয়েছে, ঐভাবে কথাগুলো বলা ঠিক হয় ন, এমন মনে হে লাগে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মাষ্টার মহাশয়ের পানে চেয়ে থাকে।

মাষ্টার মহাশয় একটু নস্যি নেন। রুমাল দিয়ে নাকটা মুছে নেন। তারপর বলতে সুরু করেন, "দেশে থাকাকালীন, তুই ত জানিস্‌ একান্নবর্ত্তী পরিবারে ছিলাম, নিজে যা আয় করেছি, না কুলোলে ভাইদের আয়ের অংশ যোগ

করে সংসার চালিয়েছি। তাতেও না চললে জমিজমার আয় এসে যেত। অভাব ছিলনা, অভাব বুঝতে দেয়নি কেউ। পেশা নিয়েছিলাম ভালই, পসার যেমনই হউক সম্মান ছিল, সম্মান পেতাম। ঐ সম্মানের ভয়েই নিজেও ভালভাবে চলেছি। বাপ-দাদার সম্মান যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, এ চিন্তাই করেছি।"

"অভাব যেমন ছিল না, তেমনি প্রাচুর্য্যও ছিল না। ঐ আদর্শের দরুণ প্রাচুর্য্যের আকাঙ্ক্ষাও ছিল না, ঘৃণাই করতাম। বড় লোকদের যেমন এড়িয়ে যেতাম, তেমনি বড়লোক হই এ আকাঙ্ক্ষাও করিনি। বেশ চলে যাচ্ছিল। কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে ত জমি কিনেছি, পূজোপার্ব্বণে ভাল খরচ করেছি, পুকুরের ঘাটলা বাঁধিয়ে দিয়েছি, ঐ যারা অনেক দূর থেকে জল নিতে আসে তাদের যেন কোন অসুবিধা না হয়। কালীমন্দিরের কিছু অংশও বাঁধিয়ে দিয়েছি। মাঝে মধ্যে নিজের ঘর বাড়ী সংস্কার করেছি। এমন দুর্দ্দিন যে কখনো আসবে বা আসতে পারে কল্পনাও করিনি।"

"রায়ট বেঁধে গেল। অনেক লোক মারা গেল। অনেক লোক বিধর্ম্মী হলো, অনেকে পালিয়ে বাঁচল। অবস্থা বুঝে অনেকে জমিজমা বিক্রী করে চলে এলো আগে ভাগেই।

আমার বিবেচনায় ভূল হলো। ভাবলাম, দেশের গরম আবহাওয়া বেশী দিন থাকবে না। আবার থেমে যাবে। এত হৈ চৈ করে দেশ ছেড়ে যাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভুল যখন ভাঙ্গল, তখন আর জায়গা-জমি, বাস্তুভিটে কিছু বিক্রী করতে পারি না। কেউ কিনতেও চায় না। ওরা ভেবেছে, আমরা ফেলে যেতে বাধ্য হবো, আর ফেলে গেলে তারা এমনিতে ভোগ করতে পারবে।

সবার সাথে এমনি মৌখিক হৃদ্যতা তখনো আছে। ভেতরের মতলব বুঝতে পারিনি। বৃদ্ধ জ্যাঠামহাশয়কে তুই ত দেখেছিস্, একদিন বাজারেই ওদের ছুরির আঘাতে উনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে রইলেন। পরে শুনেছিলাম ২০/২৫ বার ওনার সারা দেহে ওরা ছুরি দিয়ে আঘাত করেছিল। খবরও নিতে পারিনি। থমথমে ভাব কাটতে চারদিন লেগেছিল। চারদিন বাদে আর ঐ মৃতদেহটা পাওয়া গেল না।"

"একটু কাঁদতে পর্য্যন্ত পারিনি. কি জানি, কি হয় এমন একটা ভাব সার।" সময়।

"এর পরেই লাগিয়ে দিল একতরফা দাঙ্গা, এক সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ীতেও বোমা ফেলে আগুন ধরিয়ে দিল। একবস্ত্রেই সবাই উঠে এলাম স্কুল ঘরে। আর থাকা যাবেনা। ওদের দৃষ্টি পড়েছে উঠতি বয়েস বিন্ধের উপর। বিন্ধের বয়স তখন ১৫/১৬। ছেড়ে দিলাম দেশের আকর্ষণ, চলে এলাম সবাইকে নিয়ে।"

"ভাইরা দুজন এসেই কাজে লেগে গেল। আমিও সনদ্ নিয়ে কোর্টে যাতায়াত সুরু করেছি। যাতায়াতই সার। নূতন জায়গায়, নূতন পরিবেশে এত সহজ নয়। একে ত কেউ চেনেনা, তার উপর জ্যানিস ত খুব মুখরাও ছিলাম না। জড়তা ছিল মুখে। কৃতী উকীল হতে হলে, জড়তা থাকলে চলে না। আমদানী একরূপ নেই বললেই চলে। এফিডেভিট পর্য্যন্ত কেউ করতে চায় না। কল্‌কাতায় ভীষণ কম্‌পিটিশন, এটা কি আর মফঃস্বল শহর! অনেক তফাৎ, তাছাড়া এখানে নানা ব্যাপার। টাউটদের মারফত ছাড়া কেস ধরা যায়না। উকীল আর টাউটে বখ্‌রা। এফিডেভিট থেকে আরম্ভ করে রেপ্ কেস পর্য্যন্ত। কি দেওয়ানী কি ফৌজদারী। পারিনা সুবিধা করতে। মনে ভীষণ দুশ্চিন্তা নিয়ে তবু কোর্টে যাতায়াত করি ঘুরি ফিরি।"

"ঐ ভাইরা যা আনে, তা দিয়ে কষ্টে সৃষ্টে চলে যাচ্ছিল। আমি যা আয় করতে সুরু করেছি, তা আমারই ট্রামে-বাসে ও টিফিনে চলে যেত। শীতের দিন জামা-কাপড় করে দিতে পাচ্ছি না ছেলে-মেয়েদের। না পারি স্ত্রীকে একটা শাড়ী কিনে দিতে। ছোট ছেলেটার দুধ নেই। মাত্র দেড় বছর ওর বয়েস। বাঁচবে কি করে? তখনি মনে হতো এই উপরি বাচ্চা এসময় না এলেই ভাল ছিল! তাহলে বোধ হয় একটু কষ্ট বা চিন্তা থেকে রেহাই পেতাম। ঐ দেড় বছরের শিশুটি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিল নিশ্চয়। একদিন কোর্ট থেকে ফিরে গিয়ে শুনি সেটিও নেই। স্ত্রীর মুখের পানে যেন আর চাইতে পারি না! আমার পাপেই যেন অকালে গত হল।"

"বিপদের উপর বিপদ। দেশের খাওয়া-দাওয়া আবহাওয়া একরকম ছিল। নূতন জায়গায় এসে, ঐ পরিশ্রমে ভাইদের দিন দিন শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছিল; শেষে ভেঙ্গেই পড়ল। দুজনেরই পরপর টাইফয়েড হলো। অনেক তদ্বির করে হাসপাতালে ভর্ত্তি করলাম। কোর্ট থেকে ফিরতে রোজই দেখে যেতাম। অবস্থা খুবই আশংকাজনক। শশীর অবস্থাই বেশী মারাত্মক। নিশীর অবস্থা চলৎশক্তিহীন।"

"সেদিন রবিবার সকালেই হাসপাতালে গেলাম। গিয়ে শুনি, শশী আর নেই। মনে হলো, আমার হাত পা যেন কে হাতুরী পেটা করে ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু কাঁদবার সময় নেই। ওরা বলেছে কিছুক্ষণের মধ্যে আত্মীয়দের কেউ মৃত দেহের ভার না নিলে ডোম দিয়ে সৎকার হবে। তাই টেলিফোন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, কয়েকবারই *'engaged engaged'*। শেষে অনেকবার চেষ্টার পড়ে 'সৎকার সমিতি'র সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হলাম। ওরা জানাল ঘণ্টা দুয়েক দেরী হবে। গত্যন্তর নেই।"

"ঠায় বসেই আছি। আর ভাবছি, উপায় জানি কি হবে? নিশীর অবস্থা ডাক্তারেরা যা বলেন, সেও কোন কাজ করতে পারবে বলে মনে হয়না। ডাক্তাররা বলেছেন ডান অঙ্গ প্যারালাইসিস্ হয়ে যেতে পারে। ভাবি, আর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।"

"হঠাৎ দেখি, রিক্সো করে, ট্যাক্সি করে অনেক রোগী আসছে। কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়েছে। কি সাঙ্ঘাতিক রুগী সব। বোধ হয় ঘণ্টা খানেক, এর মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। এমনি অবস্থায় বসে আছি। আর ভাবি আমার যদি এমনি হয়! ভেবেই শিউরে উঠি। আমার কিছু হলে তবে স্ত্রী-ছেলে মেয়েদের অবস্থা কি হবে। এখন ত আমিই সব। আমার উপরই নির্ভর। আমি মরে গেলে একেবারে রসাতলে।"

"বড়মেয়ে বিন্ধ্যের কথা মনে পড়ে গেল। তারই মত বয়েসের কত মেয়ে, গালে রঙ্গ মেখে, চোখে সুর্মা টেনে, ভুরুতে তুলি টেনে, ঠোঁটে লিপস্টিক মেখে রাত্রের অন্ধকারে কি পাপই না করে যাচ্ছে। অভাবের তাড়না। আমি মরে

গেলে আমার মেয়েও কি সেই একই উপায় অবলম্বন করবে? কে বাঁচাবে ওদের? না আমাকে বাঁচতেই হবে। আমাকে মরলে চলবেনা। আমি এ সংসারের একমাত্র রোজগারী, একমাত্র সম্পত্তি, আমাকে জীবিত থাকতেই হবে। বেঁচে থাকলে একটা উপায় হবেই। ডাল ভাত জোগাতে পারবই।"

"কিন্তু এই কলেরাতে ত বিশ্বাস নেই, যদি আক্রান্ত হয়ে পড়ি, তবে? ভরসা কী? আঁতকে উঠি মনে মনে। আমি না থাকলে আমার পরিবারের অবস্থা কি হবে, ভেসে উঠে মনে। মুছড়ে পড়ি। হঠাৎ মনে হ'ল, কলেরা রোগীকে দেখতে গেলে বা শুশ্রূষার সময় পেট খালি রাখলেই ভয়।"

"শশীর মৃতদেহ ওখানে পড়ে আছে। সৎকার সমিতির গাড়ী এসে যাবে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে। এতক্ষণ খালি পেট নিয়ে বসে থাকা মানে বিপদকে ডেকে আনা। মারাত্মক। অজানিতেই উঠে দাঁড়াই। একজনকে বললাম, একটু খেয়াল রাখবেন এই মৃত দেহের প্রতি। গিয়ে ঢুকলাম এক খাবারের দোকানে। রুটী তরকারী, চা পেটের ভেতর চেপে গুজে ফিরে এসে অপেক্ষা করতে লাগলাম ঐ সৎকার সমিতির গাড়ী আসবে কখন তারি জন্যে। মনের ভয় তখনো যায়নি। ভগবানকে খুব ডেকেছি, এ অসময়ে আমি যেন না মরি।"

"ভাই মরেছে, কাঁদতে পারি না, খাবার দোকানে দৌড়ই ঐ কলেরাকে দুরে সরিয়ে রাখার জন্যে। ভগবানকে ডাকি আমি যেন না মরি। আমার মৃত্যু হলে একেবারে সর্বনাশ। আমি যে এখন *Living property* আর কেউ বুঝুক আর না বুঝুক আমার প্রতি যত্ন আমাকেই করতে হবে ঐ ওদেরই জন্যে।"

"সেদিন ঠায় বসেছিলাম প্রায় সাত ঘণ্টা। সেই আটটা থেকে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত। সৎকার সমিতির গাড়ীগুলিও খুব ব্যস্ত। অনেক লোককে সৎকার করতে হয়।"

"নিমতলা ঘাটে ভাইকে সৎকার করে, গঙ্গায় ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়েই বাড়ী আসি। স্ত্রী ছেলে মেয়েরা আমাকে সেদিন দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। প্রিয়জনের মৃত্যু হয়েছে কান্নায় কান্নায় ওরাও ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু ওরই মধ্যে ওদের মনের চেহারা যেন প্রতিফলিত হয়। যে গেছে সে ত গেছে। কিন্তু যে

এখনও বেঁচে আছে, তার যদি কিছু হয় তবে উপায় কে ? স্ত্রী প্রবোধ দেয় আমাকে। ছেলে মেয়েরা আমার কাছ ঘেষে বসে ছিল যতক্ষণ না আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের মধ্যে আঁতকে উঠেছিলাম বার বার। লক্ষ্য করেছিলাম, স্ত্রী ঠায় সে রাত্রি বসে ছিল আমার শিয়রে।"

"ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেছে মন। সব যেন অন্ধকার। পাকিস্তানে থাকাই ভাল ছিল। কেন মরতে এলাম। মুসলমান হয়ে গেলে এমন কি হতো ! স্ত্রী ছেলেমেয়েরা খেতে পরতে ত পারত ! ইজ্জতের ভয়ে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এসেছি। কিন্তু এখানেও ত সেই ইজ্জতেরই ভয়। মুসলমান হলে বিধর্ম্মী হতাম। কিন্তু ইজ্জত ত বেঁচে যেত।"

"স্ত্রী ছেলে মেয়েদের চোখে মুখেও হতাশা ফুটে উঠেছে। দোকানে বাকী পাওয়া যায়না। প্যারালাইসিস্ ভাই নিশীকেও হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছি। একটু ভাল চিকিৎসা করতে পারলে সেরে যায়। কিন্তু উপায় নেই। কোলের ছেলেকে হারিয়ে স্ত্রী মন মরা। ধিক্কারে মন ভরে উঠে। আমি এম, এ, বি, এল,। এমন হবে কে জানত। কলকাতাই ত লেখা পড়া শেষ করেছি। ডিগ্রি পাওয়ার সাথে সাথে যদি এখানেই বসতাম, এতদিনে নিশ্চয়ই ঐ ঘোষালের মত একজন মাঝারী আয়ের উকিল হয়ে যেতাম। ঘোষাল কি আমায় চেয়ে বেশী বুঝে নাকি ! প্রফেসরী করলেও পারতাম ! কোনটাতেই গেলাম না।"

"দুইটা প্রাইভেট টিউশনি নিয়েছি। কিন্তু সারা দিনের খাটুনি র ভাল লাগে না পড়াতে। পড়াতে হলে পড়তে হয়। এত পরিশ্রম করতে পারি না, অভ্যেস অনেক দিন থেকে নেই। স্কুলমাষ্টারী নেব কিন ভাবছি। অন্তত ৩০০/৩৫০ টাকা দরকার এই পরিবারকে চালিয়ে নিতে হলো। যা দাম আজকালকার দিনে। সামাজিকতার কথা বাদই দিলাম। কোর্টে একঘণ্টা দেড়ঘণ্টার বেশী কাজ নেই। টাউটদের দিয়ে থুয়ে এমন কিছু হয়না। বাকী সময় ধাঁধাঁয় ঘুরি। যদি একটা পার্ট টাইম কিছু করতে পারতাম ! ভেবেই পাই না কি করব !"

"কলকাতায় অনেকেই ত অনেক কিছু করছে, আমি কেন পারব না ? বিভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি ফুটপাতে ফুটপাতে, এ অফিসে, সে অফিসে।

"ডালহাউসীর এখানে সেখানে অনেক কিছু নজরে এসে গেল। ফল বিক্রয় করছে, আঁখ চিবিয়ে রস বিক্রী হচ্ছে। সাড়ে ছয়আনার দোকান, ফাউন্টেন পেন, ডালমুট, গেঞ্জী, রুমাল, কাপ ডিস, কত রকমারী জিনিষ। সবাই একটা না একটা কিছু করে ত যাচ্ছে! একটা কিছু আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেষ্টা করছে। অগনিত লোক, ট্রামে, বাসে, রাস্তায়। কেউ কেরাণী, কেউ ডাক্তার, কেউ ক্যানভাসার, কেউ পকেট মার, কেউ বাটপাড়, উকিল, মুক্তার, পুলিশ, ফরিয়াদী, পলাতক-আসামী, সবাই এই যে ঘুরে বেড়াচ্ছে—পয়সা রোজগারের ধাঁধাঁতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। করে ত খাচ্ছে! সংসার ত চালিয়ে যাচ্ছে! আমি কেন পারি না? আমি ত উকিল, এম, এ, বি, এল,।"

"এসব দেখে যাচ্ছি, আর ভাবছি। এরই ভিতর নজরে পড়ে গেল এখানে সেখানে ছড়িয়ে বসে আছে ফুটপাথের উপরে, একপাশে পাঁচ সাত জন, ২/১ জনকে ঘিরেও আছে। বাকা সবাই অপেক্ষা করছে ঐ লোকদের জন্যে। এরা ফুটপাতের উপরই হাত দেখে, কুষ্ঠি বিচার করে, কুষ্টী দেখে, তাবিজ দেয়, কবজ দেয়। আটআনা, একটাকা করে আদায় করে, মোটামুটি আয় এদের মন্দ নয়। এক একজন ১০/১২ টাকা দিনে আয় করে।"

"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখে যাই এদের বিচার ও লেনদেন। "তুই ত জানিস্ ছাত্র-জীবনে এবং পরেও শুধু 'হবি' হিসেবে হাত দেখা আমার একটা অভ্যেস ছিল। পড়াতে পড়াতে ছোর হাতও দেখতাম। খেয়াল খুশী বা অবসর সময় কাটাবার জন্যেই ঐ চর্চা করতাম। বিদ্যেটা ইণ্টারেষ্টিং। গবেষণা করার মতই বিষয়। ঐ একটু আধটু পর্যন্তই থেমে যায়। তারপর রায়ট, দেশ বিভাগ, আবার রায়ট, শেষে দেশ ত্যাগ।"

"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখে যাচ্ছি। হঠাৎ অজানিতেই মনে এসে যায়, জ্যোতিষী করলে ক্ষতি কি? এদের থেকে ত ভাল বিচার করি। আরো পড়ে শিখে নেব। এদের মত এখানে বসব না, বসতে পারব না। ঘর নিয়ে বসলে ক্ষতি কি?"

"এমনি ভাবতে ভাবতে সেদিন বাড়ী ফিরি, ঢুকেই দেখি আবহাওয়াটা কেমন যেন গুমট্। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপার কি?" চাপা একটা মন্তব্য করে এমন একটা ভাব দেখাল যেন আমার সাথে বাক্যালাপও করতে ইচ্ছা যায় না। আমি বিভ্রান্ত, বিমূঢ়, বিস্মিত। কৌতুহলে প্রশ্নও এসে গেল অনেক।

"স্ত্রীর সাথে ত কোন খারাপ ব্যবহার করিনি। কেন এমন হলো? আগে কেমন এগিয়ে এসে জলটা, গামছাটা, চা টা, দিত। এখন মেয়েদের বা ছোট কাউকে দিয়ে ঐ সব করে। বেড্ টি খাওয়ার অভ্যেস। এখন আর সময়মত পাই না। আরো অনেক কিছু অভিযোগ করা যায়। নিজে চেপে থাকি।"

"কিন্তু এত বাড়াবাড়ি ত কখনও হয়নি। দিন দিন সম্পর্ক যেন খারাপ হতে খারাপতর হতে চলেছে। কেমন যেন একটা চাপা ক্রোধ, চাপা বিদ্বেষ আমার বিরুদ্ধে। বৈচিত্রময় এ সংসার। আগে আমার কাছে সব কথা বল্‌ত। এখন কথাই বলতে চায় না। সেই নরম চেহারাটাও যেন নেই, কর্কশ হয়ে পড়েছে গলার স্বর। দরিদ্রতার সাথে সাথে মনের দরিদ্রতাও ফুটে বেরুচ্ছে। ছাপ পড়ে গেছে চোখে মুখে।"

"এমনিতে নিজে রোজগারের ধাঁন্দায় ঘুরে হয়রাণ বাড়ীতেও যদি এমনি অসদ্ভাবের বহ্নি জ্বলে, জ্বলতে থাকে তা হলে উপায়?"

"ইচ্ছে হচ্ছিল দুটো ধমক দিয়ে দেই। এমন অসভ্যতা কি করে এলো তোমার মধ্যে? চেপে থাকি। বিরোধ বাড়িয়ে লাভ নেই। ছেলেমেয়েরা মন খারাপ করে থাকবে।"

কিন্তু বিন্ধ্যে কোথায়? বিন্ধ্যেকে যে দেখছি না?

অনুর মানে অনন্তর কথায় সব পরিষ্কার হয়ে গেল। তাকে নিয়েই এ পরিস্থিতি। আসল ব্যাপার জান্‌তে দেরী হলো না।

বিন্ধ্যে বলছিল তার মাকে, "শাড়ীটা একেবারে গেছে, বেরোবার উপায় নেই।" তার মা ধপ্ করে জ্বলে উঠে বলে, "চারিদিকে দেখতে পাচ্ছিস না

মেয়েটা কি করে উপায় কচ্ছে? বাপের ত গুণের অবধি নেই, সব বুঝা গেছে।”

সামান্য একটা শাড়ীর কথায় এত সাংঘাতিক ইঙ্গিত বেরিয়ে পড়বে বিন্ধ্যে বুঝতে পারেনি। মায়ের যেন ধৈর্য্যের শেষ সীমা! মেয়েকে চূড়ান্ত অপমান করতেও দ্বিধা নেই। বিন্ধ্যে কি দেখে না সন্ধ্যে হলেই এত সুন্দরীর সমাবেশ কেন এখানে সেখানে, অলিতে গলিতে? লুব্ধ পুরুষদের আনা-গোনা, হাসি হুল্লোড়! কিসের জন্যে? প্রতিদানে কি পায় ঐ মেয়েরা! ছিঃ ছিঃ মা যেন কি? এত নীচে নামতে চিন্তা করেন কি করে?

মায়ের এ ইঙ্গিতে হতবাক্ সে, লজ্জায় সে সরে পড়ে। নিজেকে আত্মগোপন করে রাখতে হবে। শেষে এই মা-ই হয়ত তাকে পথে বসাবে। সেই যে বেড়িয়ে গেছে না খেয়ে, এখনো ফিরেনি। তাই বিন্ধ্যের মা'র অমন ভাবে বসে থাকা, অনুতাপে দগ্ধ। আগের সেই নরম চেহারার সাথে বর্ত্তমান চেহারার কোন মিল নেই।

“পথে আসতে আসতে মনে মনে ভাবছিলাম, স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে ঠিক করে নেব পেশা পাল্টাব কি না। বাড়ী এসে পরিস্থিতি ভিন্ন। ঘেন্না ধরে গেল নিজের উপর। টাকা নেই, পয়সা নেই, তাই না এ অবস্থা। এমনি অবস্থা চললে কি জানি কি হবে।”

“তক্ষণি বেড়োলাম, স্ত্রীকে কিছু বললাম না। মেয়ে কোথায় গেছে আগে সে খোঁজ করতে হবে। কোথায় যেতে পারে মনে মনে অনুমান করে গেলাম দিদির বাড়ী, পেলাম তাকে দিদির বাড়ীতেই। খবর দিতে ইতিমধ্যে ভাগ্নেকেও পাঠিয়েছে দিদি। পথে আসতে দেখা হয়নি।”

“যাক্ নিশ্চিন্ত হলাম। বিন্ধ্যে আমাকে দেখেই কেঁদে ফেলল।”

“মাথায় হাত দিয়ে বললাম—কাঁদিসনে। তোর মায়ের উপর রাগ রাখিস নে। সব দেখবি আগের মতই ফিরে আসবে। আমি পথ পেয়ে গেছি। তুই থাক এখানে যতদিন তোর ইচ্ছে। সময় ফিরলেই আমি তোকে নিয়ে যাব। তুই ভুল করিসনে। আমি তোকে ছুঁয়ে বলছি, দিন ফিরে আসবেই, আর দেরী নেই।”

"বিন্ধ্যে আমাকে বিশ্বাস করেছে। আমি ফিরে এলাম। এসে দেখি, ঠায় সে ভাবেই বসে আছে স্ত্রী। তার মন ত অত কুৎসিত নয়। এমন হলো কেন? কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাতটা ধরতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কত দূরে যেন সরে পড়েছি দিনে দিনে। হয়ত না ধরেই বললাম বিন্ধ্যে কিছুদিন আর পিসির বাড়ীতেই থাকবে।"

"স্ত্রী একদৃষ্টে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ আমার পানে। আর যেন বাধ মানে না। ডুকরে কেঁদে উঠল আমাকে জড়িয়ে। সে কান্না যেন আর থামতে চায় না। কাকে দোষ দেব?"

"তার পরদিন থেকে আর কোর্ট নয়। বন্ধু বান্ধব, ছাত্র, যারা জানত, বিশ্বাস করত তাদের দুয়ারে দুয়ারে যাতায়াত সুরু করে দিলাম। আমার একটা ইন্সুরেন্স পলিসির সারেণ্ডার ভেলু তিন হাজার টাকা, ইন্সুরেন্স অফিসে গিয়ে কাগজে সই করে সারেণ্ডার করে দিয়ে এলাম। একমাস লাগল সব ব্যবস্থা ঠিক করতে। হাতে টাকা এল।"

"প্রথমে যেটা প্রয়োজন, সে নাম পালটিয়ে ফেললাম। সুনীলকান্ত লোধ এখন আর আমি নই। এখন আমি পণ্ডিত নীলকণ্ঠ জ্যোতিষচুড়ামণি। দেখলি ত সব।"

"ভবানীপুর এরিয়া ছেড়ে, এখন কলকাতার মধ্যস্থলে আস্তানা নিয়েছি। জগত্তারিণী জ্যোতিষালয়। বাসা করেছি দিলখুসা খ্রীটে, কিছু অসুবিধা নেই; গাড়ী আছে। ভাই নিশি সেরে উঠেছে, তাকেও আমি টেনে নিয়েছি এই ব্যবসায়, এখন সে নিজেও আলাদা বসতে পারে।"

"প্রথম প্রথম এ ব্যবসার মর্ম্ম বুঝতে পারিনি। খুব পড়াশুনা করে বিচার করে যা বুঝতাম তাই বলে দিতাম। এতে দেখলাম নানা বিপদ। যদি বলেছি, "আপনার একটা বিরাট ফাড়া আছে"। এমন ভাবে চেয়ে থাকত আগন্তুক, বড় কষ্ট হতো, আমার প্রাপ্য চেয়ে নিতে লজ্জা করত। যদি বলেছি, আপনার আত্মীয় বিয়োগ সহসায় হবে, তবে এমন হাউ মাউ করে কাঁদত যে

হৈ চৈ লেগে যেত। মেয়েছেলে হলে অজ্ঞান হয়ে যেত। এমনি কাঁদলে কি প্রাপ্য আদায় করা যায়। তাই সাইবোর্ড দিয়েছি *"Consultation fee Rs. 10/-* অগ্রিম দিতে হবে। এখন ওটা আগেই নেই।"

"এমনি করে আস্তে আস্তে ব্যবসার মর্ম বুঝে নেই। কিন্তু সত্যিকারের বিচারের ফল বলতে পারি না। মানুষের মন বুঝে বলতে হয়। রেখে ঢেকে রদবদল করে বললে বলতে হয়। যারা আসে তাদের খুশী মনে বিদেয় দিতে হয়।

যদি বলি, "দুর্ঘটনায় আপনায় স্ত্রী বিকলাঙ্গ হবে।" তবে এমনভাবে চেয়ে থাকে যেন পিস্তল থাকলে তখনি গুলি করে বসবে।

"একজনকে একদিন বলেছিলাম, "আপনি হার্টফেল করে মারা যাবেন।" এমন ভাবে তাকিয়েছিল তখনি এ্যাম্বুলেন্স আনিয়ে হাসপাতালে পাঠাতে হল, দুই ঘণ্টা বাদে হাসপাতালেই মারা যান।"

"পুলিশের লোক এসে ধমকে গেল, "মশায় এমন যা তা বিচার করবেন না। আপনার জন্যেই তো উনি মারা গেলেন।"

"তাই এখন বিচার করি, কিন্তু বলার কায়দা পাল্টে ফেলেছি। যারা আসে বিশ্বাস নিয়েই আসে। কিন্তু অশুভের ইঙ্গিতে ভরকে যায়। অতি স্পষ্ট ভবিষ্যত সহ্য করতে পারে না। বিরক্ত হয়।"

"এখন কেউ এলে বলি, "আর্থিক অবস্থা ভাল চলবেনা।"

"চাকুরী স্থলে মানসিক অশান্তি। বেহিসাবী কাজের ফলে মনস্তাপ। ছেলে মেয়েদের শিক্ষা বা স্বাস্থ্য ব্যাপারে মানসিক উদ্বেগ। স্বাস্থ্য ভাল চলবে না। মানসিক ক্লেশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই মাদুলীটি ধারণ করুন।"

"কাউকে বলি, নিজগুণে সম্মান লাভের ইঙ্গিত আছে। মাতার ক্ষুন্ন স্বাস্থ্য মনের শান্তির অন্তরায়। পারিবারিক আবহাওয়া প্রতিকূল হতে পারে। ক্ষতির কারণ অবশ্যই নাই। চাকুরী ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন যোগ আছে। প্রতিযোগিতামূলক কাজে সাফল্যের ইঙ্গিত আছে। বাসগৃহ সমস্যা হতে পারে। যেমন আয় তেমনি ব্যয়। মনস্থির রাখবেন। এই তাবিজটি আপনার স্ত্রীকে ধারণ করতে বলবেন।"

"আবার কাউকেস—তিরিক্ত পরিশ্রম এড়িয়ে যাবেন । চাকুরীস্থলে শত্রুতা হতে পারে। মন কিছুদিন বিক্ষিপ্ত থাকবে। আর্থিক ইঙ্গিত অনুকূল। সুনাম অর্জন যোগ আছে! কোন কাজে নিজগুণে সম্মান অর্জন হতে পারে। স্ত্রীর সাথে পারিবারিক কারণে মত বিরোধ হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামোটি। ভ্রাতাদের সাথে মনোমালিন্য হতে পারে। বৈষয়িক সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কোন ব্যাপারে ভুলের দরুণ অর্থক্ষতি হতে পারে, দ্রব্যক্ষতিরও সম্ভাবনা রয়েছে। নিকট আত্মীয়দের সাথে ঝগড়া এড়িয়ে যাবেন। এই কবজটি নিয়ে যান।"

"এভাবে ব্যক্তিগত রাশি অনুযায়ী সম্ভবপর ফলাফল বলে যাই। মানে এককথায় সত্যি কথা বলতে পারি না। গোজামিল দিয়ে মান রক্ষা করে বলতে হয়।"

"তবে হ্যাঁ এখন আর পয়সার অভাব নেই। স্ত্রীর মুখে হাসি। আগের দিন ফিরে এসেছে। বিন্দ্যোকে ভাল বিয়ে দিয়েছি। ওর বর ইঞ্জিনীয়ার, দমদমে আছে; যে অশান্তির বীজ বাড়ীতে ঢুকতে যাচ্ছিল রক্ষা পেয়ে গেছি।"

"নিজের অসহায় অবস্থা ভাবলে এখনও শিউরে উঠি, কত লোক এমনি দুঃসহ অবস্থায় পড়ে লজ্জাকর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। কোন গতি যেন নাই ওদের। আসল পেশা ওকালতি যদি ছেড়ে না দিতাম তবে আমারও ঐ একই গতি হতো। আভাস পেয়েছিলাম ঐ দিন।"

"তুই বলতে পারিস 'ভ্যারাইটি ষ্টোর্স' নাম দিলেই ঠিক হতো। আমিও স্বীকার করি। এমনি অবস্থায় না পড়লে, আর কাউকে যদি দেখতাম তবে আমিও ঐ প্রশ্নই করতে এতটুকু দ্বিধা হয়ত করতাম না, মনের দিক দিয়ে তাই হয়ে গেছি। তবে বিশ্বাস কর মানুষকে ঠকাই না। ওরা ঠকতে চায়, গোঁজামিলই পছন্দ করে।"

"আমার অবস্থা যখন ঐরূপ নীচে নেবে যাবে যাচ্ছিল, সামাজিক সম্মানও আমার দিন দিন কমে যাচ্ছিল, পাড়ার ছেলেরা মেয়ের পেছনে লাগতে চাইতো। সমস্ত মেয়ে বেড়াতে পারত না। এমন ভাবে চেয়ে থাকত যেন বলতে চায়, খাওয়া ভাল করে জোটে না আবার সতীপনা। এমনি দুর্দ্দিন

গেছে আমার। যেই টাকা এসেছে হাতে অমনি সব পাল্টে গেল আবার। তারা বদলে গেল। পাড়ার কোন ছেলে মেঝ মেয়েকে এখন শিষ দিতেই সাহস করে না। দিলে মেয়েই জুতিয়ে সমান করে দেবে। টাকার সাথে সাথে ওদেরও মনে জোর এসেছে। তাই বখাটে ছেলেদের সাহসও কমেছে। সামাজিক সম্মান বেড়ে গেছে। কত বড় বড় লোক আসে আমার কাছে জানিস্? যারা আসতে পারে না তারা গাড়ী পাঠায়।"

"মনে পড়ে সে সব দুর্দ্দিনের কথা। সেদিনকার সন্ধ্যাবেলার সেই কদর্য্য আবহাওয়া। বিদ্ধো বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে পিসীর বাড়ী! স্ত্রী ঠায় বসে আছে। টাকার মুখ যদি দেখতে না পারতাম তবে সব রসাতলে। মা, মেয়েকে ইঙ্গিত দিয়েছিল, এর চেয়ে সাংঘাতিক অপমান আর কি? এক দিন গিয়ে শুনতাম স্ত্রী নিজেই বেড়িয়ে পড়েছে টাকার অন্বেষণে। টাকার অনেক দাম। অভাবে মানুষকে যেমন তড়িৎগতিতে নামায় নীচে, আবার টাকার জোরে উন্নতির ধাপে ধাপে তুলেও দেয় তত দ্রুতগতিতে। আদর্শ কিছু নয়। টাকাই আসল। দিনকাল পাল্টে গেছে। *It is time to accept realities. None but the fools will stick to ideals.*"

"তোকে বলতে কোন আফ্‌সোস নেই। তুই আমাকে আগে দেখেছিস্। এখনো দেখে যা, পাল্টে গেছি অনেক। তবে বিচার খারাপ করি না। সবাই বিশ্বাস করে। তুই ত হাত দেখাতে এসেছিস! দে না হাতটা, এগিয়ে দে, বিশ্বাস কর। তোকে আমি সত্যি কথাই বলব। তোকে কিছু দিতে হবে না। তুই ত আমার ছাত্র ছিলি। তোর কপাল দেখেই বলতে পারি। তুই প্রেমে পড়েছিলি। কিন্তু বিয়ে হলো না। ঠিক কিনা বল?"

"খুব *Ambitious* ছিলি তুই। জীবনে আই, সি, এস, হতে চেয়েছিলি, কিন্তু শেষে হলি অখ্যাত একজন জার্নালিষ্ট। দে না তোর হাতটা দেখি, তোর বিদেশ যাত্রা আছে কি না? তোর শুভাশুভ বিচার করে দিতে পারব।"

"বিশ্বাস করতে চাস না? এত অবিশ্বাস তোর আমার উপরে? আগে ত এমনটি ছিলি না। যা বলতাম তাই বিশ্বাস করতি।"

"কত সার্টিফিকেট পেয়েছি জানিস! তুই ঘুরে ঘুরে দেখ্, দেওয়ালে সব কিছু ঝুলিয়ে রেখেছি। বাঁধাই করে রেখেছি।"

"ঐ কোণে যেটি সেটি হলো ইউরোপের একজন প্রিন্সের দেওয়া সার্টিফিকেট। পাশেরটি ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সেলারের। পর পর দেখে নে। নামজাদা অনেকের সার্টিফিকেট আছে। দেশনেতা, ক্রিকেট প্লেয়ার, হকি প্লেয়ার, ফিল্ম আর্টিষ্ট। দেশের বিদেশের সবাই বলে আমি সত্যি জ্যোতিষ বিশারদ।"

"এর পরেও তোর বিশ্বাস হয় না? তুই ত এমন ছিলি না? এত পাল্টে গেলি কি করে? এতো অবিশ্বাস করিস তুই আমাকে? আমি কি তোর মাষ্টারদা নই? আগে যদি বলেছি *'Do or die'* কেমন অম্লান বদনে বিশ্বাস করতিস্। এখন করতে চাস্ না?"

"কেন কর্‌বি বিশ্বাস! বিশ্বাস আমাকেও আমি করি না, জানিস? এত লোকের শুভাশুভ বলে যাই কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভয় হয়। সব সময় মনটা খচ খচ করে। বাড়ী গিয়ে কি জানি কি শুনব! টাকা রোজগারের জন্যে অনেক গোঁজামিলই দিয়ে যাচ্ছি। এর ফল জানি কি হবে। হয়ত গিয়ে শুন্‌ব ট্রাম থেকে নাবতে অনন্ত পা ভেঙ্গে ফেলেছে। হেমন্ত জলে ডুবে মরেছে। মেয়ে নলিনীকে গুণ্ডারা চুরি করে নিয়ে গেছে। বা বিন্ধ্যের বর হঠাৎ থ্রম্‌বসিসে মারা গেছে। অথবা স্ত্রীর ক্যান্‌সার ধরা পড়েছে, বা হৈম গলায় দড়ি দিয়েছে প্রেম করে বিয়ে করতে পারল না বলে। কার পাপে কার শাস্তি! তাই মনটা সব সময় দমে থাকে। সেই আগের মত আমি আর যেন নেই। নই। ভেতরে ভেতরে শেষ হয়েই গেছি।"

"আজ অনেকদিন পরে তোকে পেয়ে, তোকে মনের কথা বলে একটু হালকা হলাম। তুই আমাকে অনেক দোষ দিতে পারিস!"

"দরকার নেই তোর হাত দেখাবার। এই ভাল আছিস। কি বলতে কি বলে ফেলব ঠিক আছে নাকি?"

"এখন আর আদর্শের কথা বলি না। *It is not the time to realise the ideals but to idealise the realities* তবে মানি

great thoughts if reduced to practice become great acts. কিন্তু আদর্শের চিন্তা কাজে লাগাতে অনেক বিপত্তি, দেখলি ত আমার জীবনে, যদি আদর্শকে ছেড়ে ছুড়ে না দিতাম, তবে আমার সংসার ছারখার হয়ে যেত।"

এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরে সবই শুনল শ্রীমান। এবার সে বলে, "মাষ্টারদা, তোমার উপরে আমার আর কোন ঘৃণা নেই। তুমি আমায় মাপ কর। তোমার ঐ কথা '*to idealise the realities*' যদি আমি তাবিজ ধারণ করে, প্রতি-দিনকার জীবনযাত্রায় মেনে চলতে পারি, তবে আমার ভবিষ্যৎ নিশ্চয় মঙ্গল। হাত দেখে, এর চেয়ে বেশী আর কি বিচার করবে? দরকার নেই আমার শুভাশুভ জেনে।" শ্রীমান কথা শেষ করে উঠতে দাঁড়ায়।

মাষ্টার মশায় বাঁধা দেন। বলেন, "শোন্ উঠিস না। আমার বিচার করে যা। তুই কি বলতে চাস এর চেয়ে আদর্শকে আঁকড়ে থেকে পরিবারের সবাইকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিলেই ভাল হতো?

"তুই বলতে পারিস, মন যখন এত খচখচই করছে কি জানি কি হবে তবে এ লাইন ছেড়ে দিলেই পারেন! তা হয় না, বুঝলি, বিয়ে করলে, সংসারে ২/৪ জন এসে গেলে আর হয় না। সমূহ উদ্ধারই আসল। তা না হলে স্বার্থপর বলতো সবাই। ওদের যে বাঁচিয়ে রাখলাম, ভাইকে রোগমুক্ত করলাম, এতে কি আমার একটুও পুণ্য হবে না? জ্যাঠামশায় মরলেন। জোয়ান ভাইটি মরে গেল, তাদের জন্য কাঁদিনি। কেঁদেছিলাম আর যারা রয়ে গেল তাদের কি করে বাঁচাব বলে। তাইত দেশ ছেড়ে চলে এলাম। আমি কি ...র কথায় কেবল "ভ্যারাইটি ষ্টোর্স"ই হয়ে গেলাম। আমি কি শুধুমাত্র এক জন ধাপ্পাবাজ?"

"তুইত জানিস না, ওদের বাঁচিয়ে রাখার আসল কর্ত্তব্যটুকু যদি না করতাম, আমার সব গুণ দোষ হয়ে যেত। সেদিনকার সন্ধ্যেয়, সে আভাস পেয়ে-ছিলাম ... আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর চোখে মুখে। সেদিন কি কম কেঁদেছিলাম! স্ত্রী ... মত অত ... করে কাঁদিনি বটে, কিন্তু বুক ফেটে গিয়েছিল।"

... L.P

"কাউকে এতদিন কিছু বলিনি। কেউ জানতেও চায়নি। আজ তোকে পেয়ে হালকা হলাম।"

মাষ্টারদার বলা শেষ হলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন। অনেকক্ষণ ধরে শ্রীমান শুনেছে, যে দৃষ্টি দিয়ে প্রথমে মাষ্টারদাকে দেখেছিল, সে দৃষ্টি সরে গেছে। এত তলিয়ে ত সে দেখেনি। এখন সব জেনে সেও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। মনে হয় ভেতরে ভেতরে মাষ্টারদা, সেই আগের মাষ্টারদাই আছেন। তাঁর কোন উপায় ছিল না। *Men are creature of circumstances. Good thoughts are good but seem tall talks when one is to struggle for his very existence.* আসলে কর্মই ভাগ্য।

শ্রীমান এবার উঠে দাঁড়ায়। মাষ্টার মশায়ের পায়ে প্রণাম করে বলে, "মাষ্টারদা, তোমার মনে যখন এত কান্না, কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি ভেবো না। ভগবান তোমার মঙ্গলই করবেন। আমি প্রার্থনা করব, তোমার যেন কোন অমঙ্গল না হয়। তুমি আমায় ক্ষমা কর, না বুঝে আমি তোমায় অনেক কথা বলেছি।" এ বলেই সে বেড়িয়ে পড়ে।

মনে মনে স্থির করে, আজ আর কোন কাজ নয়। প্রেসেও যাবে না। কালীঘাটে যেতে হবে। মাষ্টারদার মঙ্গল কামনা করে প্রণাম করে বলবে, 'হে জগত্তারিণী মা কালী, মাষ্টার মশায়ের যেন কোন অমঙ্গল না হয় "□

ওয়েদার কক্

জীবনে কত চেনা অচেনা লোকের সঙ্গেই না হঠাৎ হঠাৎ যোগাযোগ হয়েছিল। অনেকের নাম ধামও এখন আর মনে পড়েনা। তবু অনেকের অনেক স্মৃতি, বাঁচন বঙ্গী, ভাবভঙ্গী, আচার আচরণ এখনও আমার মনেতে গেঁথে রয়েছে। কারও চেহারা মনে পড়ে তো নাম মনে পড়ে না। মনেই করতে পারিনা। আবার কারও নাম মনে পড়ে তো চেহারাটা কেমন গুলিয়ে গেছে। আবার নাম চেহারা দুই-ই মনের চোখে ভেসে উঠলেও আসল লোকটিকে তো আঙুল দিয়ে দেখানো যাবে না! আগের আকৃতির সঙ্গে কিছু কিছু মিল থাকলেও প্রকৃতিটা কেমন যেন পাল্টে গেছে—একেবারে আগের থেকে ভিন্নরূপ। এমনি অতি চেনা লোকও কেমন অচেনা হয়ে গেছে।

আগের দিনের মানুষ কেমন অকপট ছিল। আন্তরিকতায়, হৃদ্যতায়, আতিথেয়তায় এতটুকু আবরণ ছিল না। জমিদার, গোমস্তা, নায়েব, পেয়াদা অবস্থার অনেক পার্থক্য কিন্তু আন্তরিকতায়, হৃদ্যতায়, আতিথেয়তায় এতটুকুও না। স্নেহ-ভালবাসা-সেবা আর বিশ্বাস দিয়ে ঘেরা ছিল সমাজ তখন। ওটাই ছিল সমাজ জীবনের ঐতিহ্য তখন।

এখন এই মুহূর্ত্তে সেই আগের দিনের কথাই লিখতে ইচ্ছে করছে। কার কাছে কেমন স্নেহ পেয়েছি, পেয়েছি মমতা, অন্তরঙ্গতা-হৃদ্যতা কে কেমন সরল অকপট ছিল।

মন আমারও তখন বড়ই ইমোশ্যানেল ছিল। বুক ভরে টেনে নেবার মতই খোলা ছিল মন। হাটে বাজারে পরিচিত জনের সাথে হঠাৎ দেখা হলে কেমন অকপটে বলতাম, "চল্ বাড়ীতে চল্, পাব্‌দা মাছ কিনেছি, কালি বোয়ালের লেজ কিনেছি, চল এক সঙ্গে খাব।" তেমনি অপরজনও আমাকে টেনে নিয়ে গেছে পাল্টা দিতে। আমার কোন ওজর আপত্তিই গ্রাহ্য করেনি।

তখন রাস্তায় রুগী পড়ে থাকলে ঘাড়ে করে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সেবা যত্ন করেছি, অথচ এখন রাস্তায় মরা পড়ে থাকতে দেখেও দেখেনা অনেকে। একটা টেলিফোন পর্যন্ত করতে চায় না হাসপাতালে বা থানায় পাছে নিজে জড়িয়ে পড়ে—এমন হয়েছে মানুষ!

তাই তো এখন এই মুহূর্তে সেই আগের দিনে ফিরে যেতে চায় মন। কিন্তু লেখক হবো আমি কি কখনও ভেবেছিলাম? ভাবিনি। ভাবিনি বলেই এখন মনে করে করে লিখতে হয়। বিগত দিনের কথা লিখতে হিম্ সিম্ খেতে হয়। কারণ দেখতে যেমনটিই হই না কেন বয়স তো হয়েছে! এবং বয়সের দোষেও পেয়েছে। অনেক কিছুই মনে আসে না। মনে করবার চেষ্টা করলে কেমন এলোমেলো হয়ে যায় মনের ভাবনা। তখন ভাবি কোথায় গেল সেই দিন! সেই দিন তো আর নেই। অনেক রঙ বদল হয়েছে, হয়ে হয়ে সমাজে পুরাতন মূল্যবোধ হারিয়ে গেছে। চারিদিকে অস্থির ঘটনা প্রবাহ, নীতিহীন কাণ্ড, নৈরাশ্য আর অস্থিরতার শিকার প্রায় সবাই কম বেশি। নানা সব মহা-সঙ্কটের আবর্তে সমাজ জীবনে কি ভাবে ভাঙ্গন ধরেছে তার পটভূমিকাকে ভিত্তি করে না লিখে হারানো দিনের কথা লিখতে গেলে ভাল লাগবে না। দূর অতীতের কথা খুঁজতে গেলে যা পাওয়া যাবে তা হবে অতীতেরই কঙ্কাল।

ওটা যাক্, সে সব ওয়ান্স আপন্ এ টাইম।

আচার ব্যবহারে, কাজ কর্মে, কি ব্যক্তিগত, কি সমষ্টিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবাহে আজকের মানুষ রঙ বদলে কি ভাবে আপন আপন জৌলুষ বাড়াতে ব্যস্ত সেটাই লিখতে মন চায়।

এমন ভাগ্যবান অনেকে আছেন প্রথম বয়সে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য শুধু ভিক্ষে করাটাই বাকী ছিল। উপায়ও ছিলনা, পেটে গুলি মারলেও এক ফোঁটা বিদ্যে বের হতো না। কী করে সেই লোক এত টাকার সম্পত্তি করলেন সে এক বিচিত্র ইতিহাস। অমন ভাগ্যে চাকা ঘুরে যাবার কারণে হাল চালও বেমালুম বদলে ফেললেন। অগাধ সম্পত্তির অধিকারী বলে এখন মনে করেন সব কিছু

অন্য সকলের চেয়ে বেশি বোঝেন। জানেন। অন্যান্য সাধারণ। এবং সুযোগ পেলেই বিজ্ঞতা জাহির করেন। নিজেকে মনে করেন কাস্টোডিয়ান অব অল্ উইজডম্।

এমন লোক বাহবাও পান জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। হেঁ হেঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ লোকও জোটে চারপাশে। কত চরিত্রের লোক যে এদের ঘিরে।

আবার আর এক টাইপ আছে, এই রূপ বদলানোর যুগে কী সুন্দর ওয়েদার কক্—হাওয়ার তালে চলে।

যিনি এককালে আদর্শের জন্য যেমন পারতেন নিজেকে আত্মবলী দিতে, তেমনি আদর্শভ্রষ্ট মানুষের খুলিও উড়িয়ে দিতে পারতেন অবলীলাক্রমে। সেই মানুষই এখন অন্য খোলসে, দেখলে বিষম খাবার দশা।

মানুষ চেনার শেষ নেই। আগে যিনি বলতেন, "টাকা আমার দরকার নেই। দিন কোন মতে গেলেই হলো।" কিন্তু গ্রহের কল্যাণে এখন সুযোগ পেয়ে টাকার জন্য নানা জাল ছড়িয়ে ফেলেও লোভের শেষ নেই। যত টাকা বাড়ছে ততই স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে। সেই স্বার্থ উদ্ধার করতে কত কেরামতির খেল! কেরামতির নানা কারুকার্যে অবলীলাক্রমে বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করে দাবড়ে বেড়াচ্ছে।

চারিদিকে কত গ্রহ নক্ষত্র! অসংখ্য তাজ্জব বনে যাবার কথা এক এক-জনার চোখ উল্টানি দেখলে। তখন মনে হয় চোখ উল্টোতে না পারলে বর্তমান জগৎ কী!

এমনি মানুষদের কথাই আজ লিখতে বসেছি। নানা জনের মুখে যা যা শুনেছি। যে যা অনুভব করেছে এক এক জনার কাণ্ড কীর্তি দেখে তারই নির্যাস ছড়াতে বসেছি প্রত্যক্ষদর্শীর মত।

নাম ধাম যদিও কল্পিত, ঘটনাগুলো নির্ভেজাল সত্য। তা বলে কোন ব্যক্তি বিশেষকে অঙ্গুলি দিয়ে নির্দেশ করছে না। কোন ব্যক্তির সাথে মিল হবার কথাই নয়—ইম্‌পসিব্‌ল্। তবু যদি ঘটনা চক্রে কারও সঙ্গে মেলে—ওটা একান্ত দৈবযোগ—আমার কলমের কোন হাত নেই।

তবু কেউ যদি পড়তে পড়তে মনে করেন কিছু ছিটে ফোটা তো মিলছে নিজের ব্যক্তিত্বের সাথে এবং সে কারণে টেম্পর লুজ করে আমার বিরুদ্ধে চার্জ আনতে চান তা হলে করজোড়ে জানাব—এ কাহিনীর ৮০ শতাংশ মিথ্যে বাদবাকী সব কল্পনার ভেজাল।

ছাত্র জীবনেই অনাদি কুশারী বৃটিশ শাসকদের ইনফরমার এর কাজ করত। দেশের মুক্তি সংগ্রামের নানা মুভমেন্টে যে সব সহপাঠীরা এগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশকে মুক্ত করবার সঙ্কল্পে, তাদের সঙ্গে করেছে সে জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতা। সহপাঠীদের চলাফেরা কাজকর্মের গোপন খবর জায়গামত সরবরাহ করত। স্বদেশী হয়ে খবর দিত বিদেশীদের কানে। স্বদেশদ্রোহিতার পুরস্কার স্বরূপ বিদেশী শাসকরাই কুশারীকে বি. এ. পাশের সঙ্গে সঙ্গে করে ছিল সাব-ইনস্পেক্টর অব পুলিশ। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কুশারীও করেছে চরম অত্যাচার স্বদেশীদের উপর। বন্দেমাতরম জয়হিন্দ ধ্বনি কানে প্রবেশ মাত্রই কুশারীর গাত্রদাহ হতো।

স্বদেশীদের ঘৃণাও সে কম কুড়োয়নি। বিপদও গেছে। মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত সহপাঠীরা করেছে অনেক অ্যাটেম্পট্। কপালজোরে মরতে মরতে বেঁচেছে কুশারী, কানের কাছ দিয়ে গুলি গেছে কয়েকবার।

কিন্তু সে অনেক কালের কথা। সেই "অনুশীলন" "যুগান্তর পার্টিও" আর নেই। অনেক রক্ত কাণ্ড আর হাহাকারের পর দেশ হয়েছে স্বাধীন। দেশের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। পাল্টে গেছে দিন কাল। পাল্টে গেছে মানুষ যখন যেমন জোয়ার এসেছে। নিজের দেশটি রাতারাতি বিদেশ হয়ে যাওয়ার ফলে কেউ পালিয়ে উদ্বাস্তু হলো। কেউ ভোল পাল্টে বাঁচল। সাধারণ লোকও বোকা থাকল না। অনেক কিছুই এমনিতে হলো। বিপাকে পড়ে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে ত! অনেক চেঞ্জ হলো। বিদেশীর সাথে বন্ধুত্ব হলো। ফুলের মালা কুড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন দেশ নেতারা। শান্তির বাণী সংহতির বাণী আকাশে বাতাসে। শহীদ সৌধ

এখানে সেখানে। ফুলের মালা গলায় নিয়ে, তোড়া হাতে অর্ঘ দিয়ে, চোখ ছল্‌ছলিয়ে শাসন দণ্ড স্বদেশীদের হাতে তুলে দিয়ে বিদেশীরা দেশ ছাড়ল।

কিন্তু রাজত্ব গেলেও রাজকর্মচারী যায়না। রাজা বদল হলেও রাজ কর্মচারী থেকে যায়। কুশারীও রয়ে গেল, শুধু রয়ে গেল না, অনেক উন্নতি হলো। পদোন্নতি হতে হতে হয়েছে কুশারী সেরা সাহেব—পুলিশের সর্বময় কর্ত্তা। তবে এখন আর মিঃ কুশারী নয়—শ্রী-এ, এন, কুশারী—বিরাট বাংলোর ফটকে। অফিস চেম্বারের সম্মুখে নেম-প্লেট জ্বল জ্বল করে।

প্রহরীরা শুধু লোক তাড়ায় কেউ যেন হঠাৎ বিনা স্লিপে বিনা-অনুমতিতে সাহেবের কাছে না ঘেষে।

স্লিপ দিয়েই একদিন গেলাম সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়ে। কোন কাজে নয়, শুধু পুরাতন পরিচয়টা ঝালিয়ে নেওয়া। এক জেল থেকে অন্য জেলে এস্‌কর্ট করে নিয়ে গিয়েছিল এই শর্মাকে তৎকালীন সাব-ইন্সপেক্টর কুশারী।

"গুড্‌মর্নিং" সম্ভাষণ করে সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করলাম, গুড্‌মর্নিং শব্দটা কানে যেতেই চকিতে চোখ মেলে তাকালেন শ্রী কুশারী। আমার ইংরেজী বুলি "গুড্‌মর্নিং" বরদাস্ত করতে পারলেন না যেন, তাই সম্ভাষণ গ্রহণ করে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে গাম্ভীর্যের আওয়াজে বললেন, "গুড্‌মর্নিং" কেন, জয়হিন্দ বলতে পারেন না ?"

ভাবটা—"কি আশ্চর্য! আপনারা যারা দেশের কাজ করেছেন তারাই যদি এখনও এসব বিদেশী-বুলি ছাড়তে না পারেন তাহলে দেশে দেশাত্মবোধ জাগবে কি করে ?"

কথা গুলো কানে বাজতেই 'থ' হয়ে গেলাম—এ যেন জ্যান্ত বায়স্কোপ! 'বন্দেমাতরম' 'জয়হিন্দ' যার এককালে গাত্রদাহ হতো, রিভলবার হাতে নিয়ে আঁতি পাঁতি করে খুঁজে বেড়াত কার এমন দুঃসাহস এসব ধ্বনি তোলে! সেই ব্যক্তিই কিনা স্বদেশীর ঢঙে অভিযোগ-ভৎসনা করছে, "জয়হিন্দ বলতে পারেন না ?" গলার স্বরে নিষ্ঠাবান সুষ্ঠু স্বদেশীয়ানা!

এ কি শুনলাম! এ কি দেখলাম! বুদ্ধি-লোপ পাওয়ার সামিল। দু-চোখ কপালে ওঠার উপক্রম।

সর্বশরীরে এক প্রস্থ ঝাঁকানি খেলাম, ঝাঁকানি খেয়ে ভূরু আর কপালের মাঝে কুঞ্চন রেখা নিয়ে বিমূঢ় সত্ত্বের মত্রে দাঁড়িয়েই রইলাম বসবার কথা ভুলে।

কুশারী-ও বসতে বলার কথা ভুলে গেছেন, সুযোগ যখন পেয়েছেন অপব্যবহার না করে বলে চললেন, "দেশ এখন আমাদের স্বাধীন, কিন্তু সীমান্তের ওপারে

ওৎ পেতে আছে শত্রু। এমন অবস্থায় ভেতরে দেশাত্মবোধ জাগান আপনাদেরই তো কর্তব্য। দৈনন্দিন আদব কায়দায় আমাদের এই বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে জনসাধারণের মধ্যে এটা ভুলে যান কেন? ঐ সব গুড্‌মর্নিং টর্নিং ছাড়ুন, জয়হিন্দ বলবেন।"

কথাগুলো বলতে বলতে এবার ইঙ্গিত দিলেন বসতে।

এরকম পরিস্থিতিতে অপরে কি করত জানিনা। তবে দু-একজনকে যেমন জানি লজ্জায় জিভ্ কেটে তখনি হয়ত বলত। "এক্সট্রিমলি সরি স্যার, জয়হিন্দ"—অবস্থাটা "হুজুর মার্জনা ভিক্ষা করছি, ক্ষমা করুন। আর কোন দিন এমন ভুল করব না।" বলতে বলতে অতি সঙ্কোচে ছোট হয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে চেয়ারের ওয়ান থার্ড নিয়ে হয়ত বসে পড়ত। এবং বসে থেকে অনেক হেঁ হেঁ করে একসময় 'জয়হিন্দ' বলে বিদেয় নিত।

কিন্তু আমি শর্মা যে ভিন্ন ধাঁচের, বসব কি! ঘেমে উঠেছি, সারা শরীরে ঘাম দিচ্ছে। কপালের সেই শিরাটা যেন ফুলে ফুলে উঠতে চায়, মাথাটা ঘুরছে, একটু শুতে পারলে ভাল হতো। অন্তত চেয়ারের গদিতে ঠেস্ দিয়ে শরীরটাকে যতটা সম্ভব ছেড়ে দিতে পারলেই যেন একটু স্বস্তি পেতাম।

বুঝলাম বেশিক্ষণ অমন মেজাজ নিয়ে এই ব্যক্তির সম্মুখে থাকাটাই বিপদজনক। রুমাল দিয়ে ঘামটা মুছে নিলাম, ঘাম মুছে নেওয়া তো নয়। এ যে ভেতরের আক্রোশের অপকে ঠাণ্ডা করার কৌশল। মাথাটা যেন গরম না হয় এমন

ভাবতে ভাবতে নাকে মুখে চোখে রুমাল বুলিয়ে ভেতরের উত্তেজনায় বুকে পিঠে স্বান্তনার প্রলেপ দিতে থাকলাম যেন। ইচ্ছে করছিল কুশারীর টেবিলে হুইস্কির বোতলটা টেনে ঢক্ ঢক্ করে গিলে নেই বেশ কয়েক ঢোক্। শরীরটাকে কষ্ট দেওয়ার দরকার কী!

এমন জানলে কে আসত! মাথাটা না বিগড়ে যায় ভেতরের তাপে-উত্তাপে। মেজাজ গরম হলে আমার আবার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সেই কাণ্ডজ্ঞান-হীনতার ফল আমি অনেক পেয়েছি এবং পেয়েছি বলেই এখন নাকে মুখে অমন করে রুমাল বুলিয়ে চলি। কিন্তু এক কালের বেইমান কুইস্‌লিং কুশারীও উপদেশ দেবে, "জয়হিন্দ বলতে পারেন না?" তাও আমাকে!

আমার মধ্যে ভীষণ সেন্‌সেশন ক্রিয়েট হলো, এখন আমি কি করি? আমার মনে হলো আমি যদি পাগল হতাম তা হলে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারতাম, পাগলের অনেক সুবিধে, তার সাত খুন মাপ। বড় জোর ধরে বেঁধে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয়, চিকিৎসার সুব্যবস্থা করে, সুস্থ হলেই খালাস।

কিন্তু সুস্থ সবল মানুষ হয়ে অমন বেপরোয়া পাগলামি করলে ফল যে বিপরীত, তা জানি বলেই জলে বসতি করে কুমীরের সঙ্গে বিরোধ করার ফলাফলের প্রাজ্ঞতাটুকু অনেক ঠেকে শিখেছি। ন্যাড়া দু-বার বেলতলায় যায় না।

আমার কাঁধে তো আর দুটো মাথা নেই! আবার অথৈ জলে কে পড়ে! আমি এখন সংসার করি। করি মানে কি? সংসারে যত ঝামেলা আছে সমস্যা আছে, তার নমুনা আমার সংসারে যে কেউ গেলেই পাবে। কী ভাবে যে সামলাচ্ছি ভগবান জানেন। জ্যোতিষী বলে রবি আমার পক্ষে মোটেই মঙ্গলজনক নয়, তাই আমার এই অবস্থা। জীবনে অনেক আলো দেখতে পেয়েছিলাম আবার আলোটা মিলিয়ে গেছে আলেয়ার মত—ঐ রবির দোষে। তাই বড় ভয় ধরে গেল, বিশ্বাস কি অনভিজ্ঞের মত সেই আগের মত মাথাটা বিগড়ে ঝাঁঝের কথা বেড়িয়ে যেতেও তো পারে! তা হলে রবি আবার পেয়ে বসবে।

ঝাঁঝের কথা বলতে না পারলেও মুখের যা চেহারা হয়েছে ভাল করে লক্ষ্য করলেই কুশারী সাহেব বুঝে ফেলবেন ভেতরে আমার কি চলছে। আর বুঝলেই

মুস্কিল। সামান্য তম সুযোগ পেলেই ক্ষমতার দাপটটা ঝাড়বেন বাঘের থাবা নিয়ে। আর বাঘে ছুলেই আঠার ঘা।

ছুতেই বা হবে কেন, প্রহরীকে ইঙ্গিত মাত্রই একেবারে পাকা ধোলাই। বেশিক্ষণ এই পরিবেশে থাকাটাই সমীচিন নয়। সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এসব লোকের সংস্পর্শে না আসাই ভাল অন্তত যতদিন না সেন্‌সেশনটা একদম যাচ্ছে।

তাই ভাবছিলাম কি করে এখান থেকে ছুটে পালাই!

যাক্ গতিকে কপালটা ভাল ছিল, হঠাৎ ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। শব্দটা কানে যেতেই টেলিফোনের মাউথ-পিসে মুখ লাগাতে লাগাতে প্রশ্ন করলেন কুশারী—"কী ব্যাপার?" মানে, কেন এসেছেন? খুব কি জরুরী দরকার?

প্রশ্নটা এমন প্রকারান্তরে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন উনি তো ব্যস্ত মানুষ, কত দায়-দায়িত্ব ওনার! ২/১ মিনিটের বেশি কি কাউকে উনি দর্শন দিতে পারেন!

ওনার ভাব-সাব আমি বুঝলাম কিনা বা বুঝব কিনা হয়ত কুশারার সন্দেহ ছিল তা টেলিফোনটা বাঁ হাতে ধরে মাউথ পিসে ডান হাতটা চেপে আমার পানে তাকিয়ে বললেন—"বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে বরং…" মানে আমাকে চলে যেতেই ইঙ্গিত দিলেন।

অমন অবস্থায় আমার হাসবার কথা নয়। আমার মুখ দেখে কে বলবে ভেতরে কি চিন্তা চলছে। ঠোঁটে সামান্য মাত্র কৌতুকের হাসির রেখা ফুটিয়ে আমি, "আচ্ছা, নমস্কার স্যার," বলে মনে মনে চিয়ার ইউ হ্যাট্‌স্ অফ্ করে বেরিয়ে এলাম কুশারীর ঘর থেকে।

ঐ স্যার বলাতে আপত্তি করলেন না শ্রী কুশারী। আমার 'নমস্কার স্যার' এর প্রতি উত্তরে 'নমস্কার নমস্কার' কানেও বাজল।

শালা, বেইমান, মিরজাফর, কুইস্‌লিং এসব ছাড়া তো কোন দিন কুশারীকে ডাকিনি। সেই দিন নমস্কার স্যার-ই করলাম কুশারীকে।

কী রূপ দেখেছি তার আর কী স্বরূপেই না দেখলাম আজ। বুঝতে কষ্ট হলো না। এই যে এত উন্নতি হয়েছে তার এই উন্নতির আসল কৌশলটা এই রূপ বদলানর মধ্যে-ই লুকিয়ে। এই কৌশলের দৌলতেই তদানীন্তন কালের অনেক জাঁদরেল জাঁদরেল সিভিলিয়ানদের রূপই আজকের দিনে একেবারে বিপরীত।

ওয়েদার কক্‌ আর কাকে বলে ☐

কে কতটুকু

তেলে জলে মিশ খায় না, কিন্তু মিশ না খেলেও তেল স্বচ্ছন্দেই জলের উপর ভাসে। ঢেউ এর তালে চলে। এবং ঢেউ জোরালো হলে তেল আর জল চেনা যায় না। চেনা দুঃসাধ্য।

ভেজালদারীদের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু হয়েছে, সর্বত্র অভিযান। খাদ্য সামগ্রীতে ভেজাল এ যে অসহ্য।

রোজ খবরের কাগজ খুললেই ভেজালদারদের বিরুদ্ধে নানা হুমকি। আর বেশী দিন সহ্য করা হবে না এদের উৎপাত।

উৎপাদকদের, ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে এডিটোরিয়েলে গরম গরম লেখা চলছে।

আমার রাজনৈতিক দাদা শ্রীকুশল নাথ মিত্র এই ভেজালদারদের বিরুদ্ধে গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে শহরে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।

কুশলদার অনেক কীর্ত্তি, অনেক সাফারিংস্। দেশের মুক্তি সংগ্রামের নানা আন্দোলনের সাথে উনি সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। পরাধীন ভারতের শাসক সম্প্রদায়ের সন্দেহ ছিল কুশারীকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রে কুশলদাও লিপ্ত ছিলেন। ফলে হয়েছিল ওনার দীপান্তর।

মুক্তি পেয়েছিলেন সেই যে ইউনিয়ন জ্যাক সরে গিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পূর্বাহ্নে জেনারেল এ্যামনেস্টির আদেশ হলো, সেই সময়ে।

জেলখানায় খুব লেখাপড়া করেছেন, জেল থেকে বের হয়েও রাজনীতি ছাড়েন নি। সমাজতন্ত্রবাদের অনেক খুঁটিনাটি জানেন। দেশে সমাজতন্ত্রবাদ কি করে প্রতিষ্ঠিত হবে সে সম্বন্ধে লেখেন, বক্তৃতা দেন।

খাদ্যের দাবী ও ভেজালদার চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে এই যে সারা দেশময় আন্দোলন তার পুরোভাগেই কুশলদা।

কুশলদার বক্তৃতার ঢঙই আলাদা উনি বলেন, "এসবের প্রতিকার করতে হলে শুধু কাগজে কলমে বা বক্তৃতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে বড় বড় কথা লিখলে বা বললেই চলবেনা, সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারে ওদের সামাজিক বয়কট করে।"

যেমন কথা তেমন ব্যবহারও করতেন কুশলদা দৈনন্দিন জীবন যাত্রায়। কোন কালোবাজারী কালীপূজো করলে যেতেন তো নাই-ই, পূজোর প্রসাদ পাঠালেও ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। স্পষ্ট বলে দিতেন ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার স্মাগলারদের সঙ্গে আবার সামাজিকতা কী।

সেই কুশলদা নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন।

ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলোর দরকার তাই বোধ হয় কুশলদা আমার কাছে এলেন ভোটের ক্যানভাসে।

আগে পড়েছি *Democracy is the govt. of the people, for the people, by the people.* বাস্তবে যা দেখছি তাতে মনে হয় *Democracy is the govt. off the people, bar the pecple and buy the people* তাই মনের ভেতরে আকাঙ্খা অপূরণের একটা চাপা আগুণ সর্বক্ষণই জ্বলছে। তাই কুশলদা নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন শুনেই মনেতে একটা আশা হলো এবার কুশলদা মন্ত্রী হলে হয়ত সেই অপূরণটা এবার যাবে।

সুতরাং কুশলদাকে ভোট দেবনা তো কাকে দেব? মনে মনে প্রার্থনাই তো ছিল কুশলদার মত জনপ্রতিনিধি—সুতরাং "কুশলদা কি জয়।"

কুশলদাকে নিয়ে পাড়ার ঘরে ঘরে গেলাম ক্যান্‌ভাসে। সবাই আশ্বাসও দিল কুশলদাকেই ভোট দেবে।

ক্যান্‌ভাস শেষে কুশলদার সঙ্গেই ফিরছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম সহরের সেরা কালোবাজারী ঝুমরলাল, ছগনলাল আসছে।

ঝুমরলাল ছগনলাল সম্বন্ধে অনেক কথা। এক নম্বরের ভেজালদার পাঁজি হারামজাদা—দেশের নিকৃষ্টতম শত্রু। কুশলদার মত সেরা আদর্শবাদীর সঙ্গে চলেছি বলেই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, ঐ ঝুমরলাল আসছে দেখেই মনের ভেতরে একটা প্রতিক্রিয়া খেলা করছিল। ইচ্ছা করছিল চীৎকার করে গালি-গালাজ করি শালা, পাঁজি, নচ্ছাড়, চোট্টা। ইচ্ছা করছিল বাঁ-হাত দিয়ে বিরাশী দশআনা, ডানহাত দিয়ে আধমনি থাপ্পর ঘুষি, জুতোর ডগা দিয়ে থুতনি, বাঁ পা দিয়ে নিতম্ব, ওয়াক্ করে ছটাক খানেক থুঃ—মানে সব একযোগে।

কুশলদা যখন সঙ্গে রয়েছেন ওনাকে আমার বোঝান দরকার আমি ওনার কত বড় সাকরেদ। তাই চলতে চলতে ভেতরটা শানাচ্ছিলাম কি ভাবে তা ঝাড়ব।

ইতিমধ্যে পেট দোলাতে দোলাতে ঝুমরলাল এগিয়ে এলো। কুশলদার মুখোমুখি হতেই ফোঁকলা দাঁত বের করে কুশলদাকেই "নমস্তে বাবু সাব। বাল-বাচ্ছে আছে তো ?"

যেই না বলা কুশলদা যেন কী! এতদিন বলে এসেছেন এদের সঙ্গে সামাজিক বয়কট করতে হবে। ঝুমরলালের বিরুদ্ধেও কম উদগার ছোড়েন নি। সেই কুশলদাই কিনা চটপট প্রতি নমস্কার করে বললেন, "আপ্‌কা মেহেরবানীসে আচ্ছা-ই হ্যায়।"

তারপর বললেন "গদিতে থাকবেন একটু পরেই আমি আসছি, তখন কথা হবে।"

বিগলীত ভঙ্গিতে শেঠজী বললেন "আপকা লিয়ে হামারা গদি হামেশা কা লিয়েই খোলা হ্যায়। আইয়ে গা, আপকা মরজি হোনেসে জরুর আইয়ে গা।"

ঝুমরলাল চলে গেলে কুশলদা আমার গাম্ভীর্য লক্ষ্য করে আমাকে হাসাবার জন্যে নিজেই হাসতে লাগলেন। ভাবটা এতদিনে শেঠজীকে বাগে পেয়েছেন।

একটা যোগসূত্র মনের মধ্যে আবিষ্কার হয়ে গেছে কুশলদা আর ঝুমরলালের মধ্যে। পরিস্কার হয়ে গেল কুশলদার পরিবর্ত্তী কথায়, "বেটা চোট্টা খুব কামিয়েছে। এবার কিছু খসাব। বেটাও বুঝেছে এবার আমার জয় নির্ঘাৎ, তাই না দিয়ে পারবে না। ইলেকসনে টাকা দরকার। বেটাকে হাতে রাখতে হবে।"

আশ্চর্য লাগল কুশলদার কাণ্ড। যে ঝুমরলাল ফুলে ফেপে উঠেছে কালো টাকার দৌলতে সেই তার সাথে এক জোট হয়েছেন এক কালের সর্বত্যাগী উগ্র স্বদেশী কুশলদা নির্বাচনের প্রাক্কালে? যাকে বলে একেবারে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি! তাদের সঙ্গে তাল দিচ্ছেন গাইয়ে বাজিয়ের মত। তাল দিতে দিতে হয়ে পড়েছেন আর দশজন প্রার্থীর মতই কালে ওয়াৎ।

হায় হায় এ কি হলো!

অনেকক্ষণ ঘুমোনর পর জাগলে যেমন চেহারা হয় তেমন চেহারা নিয়ে কুশলদার মুখাবলোকন করতে থাকি। ভয়ে নয়, রাগে নয়, ভক্তিতেও নয়— কৌতুকে। এমন লোককে এতদিন আমি দাদা বলে মেনেছি! জানতাম কুশলদা একজন আদর্শবাদী। এখন যা জানলাম আমার মন বলল তা হলে আমি ওনার চাইতে নির্ঘাৎ বড় আদর্শবাদী।

মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম নির্বাচনে জিতে কুশলদা মন্ত্রী হোক। এই মুহূর্তে মনে মনেই অভিশাপ দিলাম-নিপাত যাক্।

বিরূপ প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে গেল ভেতরে ভেতরে। মনের আগুণ চেপে একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে কুশলদার পানে তাকিয়ে বললাম। "আপনার তো এখন অনেক বড় বড় সাকরেদ জুটে গেছে, আমাকে আর আপনার প্রয়োজন কী? আপনি একাই একশ, আমি চললাম।

কুশলদা আমাকে থামাতে, "শোন্ শোন্ যাস্ না, *let me explain*

কিন্তু কার কথা কে শোনে। ওনার *explanation* আমার দরকার নেই। হয়ত বলবেন, "দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এসব লোকেরও প্রয়োজন আছে"।

পোজ নেবেন *As if he is the sole custodian of all wisdom* আমরা যেন সবাই ঘাস খাই! যত্তসব।

কুশলদা নিজে হয়ত ঐ ঝুমরলালের দোষে দুষ্ট নয়, কিন্তু কুশলদার মত লোকেরাই তো *indulgence* দিচ্ছেন! তা না হলে এত জোর পায় কোথা থেকে এই ঝুমরলালরা?

কে কতটুকু *it is a matter of degree*. মনের বিতৃষ্ণা নিয়ে বিরাট আদর্শবাদীর মত আমি কুশলদার সঙ্গ পরিত্যাগ করলাম। আদর্শবাদী লোক তো কখনও অভিভূত হয় না—না দুঃখে, না শোকে—যে কোন কারণে। কিন্তু আমি যা করলাম এর চাইতে বড় হঠকারীতা আর কি হতে পারে? ব্যাপারটা উপলব্ধি করতেই ফিরতি পথে একলা একলা ভাবলাম, "আমি কেন রাগ করছি? আমার তো রাগ করা উচিৎ নয়। আমি যে সাংবাদিক, ভাষ্যকার। আমার যা লেখ্য তা তো পেয়ে গেছে।"

কিন্তু সাংবাদিক ভাষ্যকার হলেও আমিও তো একজন ভোটার। ভোট না দেওয়া যে অন্যায়—গণতন্ত্রের পরিপন্থি। সুতরাং ভোট কাকে দেব না দেব সেটা ভাবতে হয়।

আদর্শের কারণে জীবনে যতজনকে সমর্থন করেছি, সেই সুভাষ বোসের সময় থেকে আজ পর্যন্ত, ফল পেয়েছি বিরূপ। কেউ পালিয়ে গেছে, কেউ মরেছে, নয়তো ভোট যুদ্ধে হেরেছে। আমার সমর্থন বড়ই অপয়া।

তাই না কুশলদার আচরণ দেখে মনে মনে সত্যিকারের আকাঙ্খা জাগল, আদর্শের মিল না থাকলেও কুশলদাকেই আমি ভোট দেব, আমার অপয়া ভোটের কারণে যদি কুশলদা ভোট যুদ্ধে হারেন, এই ভরসায় ☐

ভূয়োদর্শন

দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক বীরুপাক্ষ পুরোহিত একজন নামজাদা সন্মানিত ব্যক্তি। এত বড় জ্ঞানী গুণী লোক এই এলাকায় নাই বললেই চলে।

যেমন আদর্শবান পুরুষ তেমনি ওনার ব্যক্তিত্ব। সারাটা জীবন আদর্শের কথাই বলে এসেছেন। নিন্দে করেছেন আদর্শচ্যুত ব্যক্তিদের।

কালোবাজারীদের কতই না নিন্দা করেছেন। এক কথায় বলতেন ওদের ফাঁসি হওয়া উচিত।

সেই জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞ অধ্যাপক শেষে কিনা অবসরান্তে খুলে বসলেন এক রেশন সপ! বিক্রি করতে লাগলেন চাল আটা চিনি কেরোসিন গম লবন।

অনেকেই প্রশ্ন করেছে ওনাকে "শেষ বয়সে এ কি করছেন প্রফেসর? প্রাইভেট কোন কলেজে চাকুরি নিলেই তো পারতেন? অথবা নিজের ঘরেতে টিউটোরিয়েল ক্লাস খুললেও তো পারতেন। গ্রুপ করে পড়ালে অন্তত হেলে ফেলে পাঁচ-সাত হাজার টাকা মাসে আয় হতো! যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য কাজ হতো! এ কি কাণ্ড করলেন প্রফেসর?"

এসব প্রশ্নে প্রফেসর পুরোহিত খোঁকিয়ে ওঠেন। খেঁকিয়ে বলেছেন কাউকে কাউকে "এক ঘণ্টা ঝাড়া বক্তৃতা দিয়ে ছেলে খেদিয়ে মাসে যা আয় হয় তুলনায় সেই একঘণ্টা দোকানদারি করলে অনেক বেশী আয় হয়। তাল মত হলে তো কথাই নাই। বাণিজ্যেই বসতি লক্ষ্মী। সারা জীবন ছেলে খেদিয়েছি আর কত?"

সে যা হউক এলাকার লোকেরা কিছুদিন নানা কথা বলে বলে শেষে অভ্যস্ত হয়ে চুপ মেরে গেল।

কিন্তু আবার আলোড়ন তুললেন প্রফেসর। বেছে বেছে মেয়ে সুরেখার বিয়ে দিলেন উঠতি এক কালোবাজারী যুবকের সঙ্গে।

আশ্চর্য হয়ে গেছে সবাই প্রফেসরের কাণ্ড দেখে। মাথা কি তবে প্রফে-সরের খারাপ হয়ে গেল?

"এলাকায় জ্ঞানী গুণী লোকই যদি এমন কাণ্ড করেন তবে আমরা কাদের দেখিয়ে এলাকার বড়াই করব?"—এমন আক্ষেপ প্রতি জনের মুখে।

অথচ এই প্রফেসরই বলতেন—শুনেছি, "মেয়ের যোগ্য বর হবে সেই যে এম, এ-তে প্রথম হবে।"

এমন উক্তিতে অত্যুৎসাহী প্রথম সারির ছাত্রদের মধ্যে রীতিমত কম্পিটিশন হতো, কে কাকে পেছনে ফেলবে এমন প্রতিযোগীতা।

সেই প্রফেসরই কিনা শেষে নিজের উক্তির খেলাপ করে বিয়ে দিলেন সুন্দরী সুরেখার এক কালোবাজারীর সঙ্গে। লেখাপড়ায় যার দৌড় মাত্র ম্যাট্রিক পর্যন্ত—নন্-ম্যাট্রিক।

কেন এমন কাণ্ড করলেন প্রফেসর? কৌতুহল চেপে রাখতে পারি না। এলাম দেখা করতে প্রফেসর বীরুপাক্ষ পুরোহিতের সঙ্গে।

কৌতুহল নিয়ে এসেছি তো, তাই কি ভাবে আসল কথাটা তুলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। সুরেখার বর কালোবাজারী হউক আর যাই হউক এখন তো প্রফেসর-জামাতা!

শিষ্টাচারের দায় মিটলে, কুশলাদি প্রশ্নের পর প্রফেসর জানতে চাইলেন, "বিয়েতে কেন এলি না?"

উত্তর দেবার আগেই প্রফেসর গিন্নী—মাসীমাই ঝাপ্টা দিয়ে বলে উঠলেন,

"আসবে কেন ? মানসম্ভ্রম খুইয়ে মেয়েকে এক কালোবাজারীর হাতে তুলে দিয়েছ এখন আবার প্রশ্ন করছ কেন বিয়েতে এলে না ?"

মাসীমার খেদোক্তিতে আমার অধ্যাপক স্যার ক্ষণিকের জন্য বিচলিত হলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে বলতে সুরু করলেন, "তোমরাও যেমন ! আদর্শ নিয়ে কি জীবন ধারণ করা চলে ? বিশেষ এই দুর্মূল্যের দিনে ? এ যুগে সেই পুরাতন আদর্শ আঁকড়ে থাকলে জীবনটা হাড্ডিসার হবে। সেই আগের ভাবধারা নিয়ে চলা সম্ভব নয়। টাকা ছাড়া ভদ্রোচিত জীবন যাত্রা হয় না, এবং টাকা উপায় করতে এ যুগে আদর্শ বাঁচিয়ে রাখা চলেও না। শুধু আদর্শ আর শিক্ষার বড়াই করলেই তো বাঁচা যায় না ! বাঁচতে হলে জীবন দর্শন পাল্টান একান্তই দরকার, তা না হলে উপাই নাই। দেখলাম তো অনেক ! এ যুগে সেই আদ্যিকালের বাল্য-শিক্ষার হিতোপদেশ আঁকড়ে থাকতে যাওয়াটাই বাতুলতা। আগের হিতোপদেশ বা শিক্ষার ধারা সব বাতিল। নতুন করে সাজাতে হবে বাস্তোপযোগী হিতোপদেশ। সারা জীবন সৎ জীবন যাপন করেছি, দর্শন শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছি, কিন্তু দুঃখ কষ্ট থেকে তো রেহাই পাইনি। জীবন দর্শনের তত্ত্বকথা বলেছি, সবাই সম্মুখে জ্ঞানী-গুণী বলেছে, কিন্তু পেছনে টিট্‌কারি দিয়ে মন্তব্য দিয়েছে—তত্ত্ববাগীশ। তত্ত্বকথা শুনে কেউ আমার বাড়ীতে চাল, আটা, তেল, কেরোসিন, চিনি পৌছে দেয়নি, আমাকে গিয়েই সেই লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে। সেই লাইনের কেউ বলেনি 'স্যারকে আগে দিয়ে দিন।' অপেক্ষা করতে হয়েছে সেই কখন ক্রমিক পর্যায়ে আমার নাম ডাকা হবে। অভিজ্ঞতা তো কম হয়নি ! অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারি বাল্য শিক্ষার সেই সব হিতোপদেশ যদি আঁকরে থাকি তাহলে নিজের জীবন যে ভাবে গেছে তো গেছে মেয়ের জীবনেও অভাব অনটন ও দুর্দশার একই রিপিটেশন।"

প্রফেসর পুরোহিত একটু থামলেন, এক টিপ নস্যি নিলেন তার পর সেই বক্তৃতার ঢঙে বলতে সুরু করলেন—জামাতাকে উল্লেখ করেই বলেন, "এত অল্প বয়সে বাবাজী যেভাবে জাঁকিয়ে বসেছে, তোমরা দেখবে, আমার বয়সে সে একজন সেরা বিত্তবান ব্যবসাদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, প্রতিষ্ঠিত হবেই। আদর্শ

কিছু নয় জীবনে প্রতিষ্ঠাই আসল। প্রত্যেকের জীবন দর্শন পাল্টে যাচ্ছে, যে বুঝতে পারছে সুযোগ নিচ্ছে, যে বুঝছে না সেই ঠকছে, ঠকবে। আমি ঠকেছি, কিন্তু মেয়েকে ঠকতে দিতে পারি না। মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবেই আমি অমন যুগোপযোগী পাত্র নির্বাচন করেছি। সে সুখে থাকবে। দেখে নিও।"

প্রফেসর একটু থামলেন। নাকটা মুছে নিতে রুমালটা পকেট থেকে বের করলেন।

ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার হউক আর যাই হউক সুরেখা বিত্তবানের ঘরে পড়েছে, ওর যা স্বাদ-আহ্লাদ সবই পূরণ হবে। মাসীমার মত অভাব অনটনের জ্বালায় দিন কাটাতে হবে না। মেয়ের সুখে মাসীমাও খুশী।

কিন্তু একজন আদর্শবাদীর হঠাৎ করে এমন কাজ করাতে দেশের লোক নানা কথা বলছে বলে মাসীমা মর্মাহত। এত দিন দার্শনিকের স্ত্রী হিসেবে গর্ব করেছেন, সেই হারানো গর্বের ক্ষতিপূরণ কালোবাজারী জামাতার স্বচ্ছলতা দিতে পারে না, তাই মাসীমার মনে বড়ই অস্বস্তি।

আমি বুঝতে পারি মাসীমার মনের কথা। তাই "স্যার"-এর পানে তাকিয়ে বললাম "লোকেরা নানা কথা বলছে কিনা তাই মাসীমার ভাল লাগছে না।"

স্যার যেন ওনার স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে পেলেন, তাই দরাজ গলায় বলে ওঠেন 'পাবলিক ওপিনিয়নের কথা বলছ? সেটা বড়ই সিপ্টিং। দেখলে না রাজেন তরফদারের ব্যাপারটা! কত টাকা কামাই করেছে এই রাজেন? চাউলে কাঁকর মিশিয়ে, আটায় তেঁতুলের বীচি, কাঁঠালের বীচি, ঘি'তে চর্বি, তেলে শেয়ালমূত্রা মিশিয়ে সে কি কম আয় করেছে? ঐ ভেজাল খেয়ে কত লোকও মরল! রাজেনের তো রাস্তায় বেরোনই মুস্কিল হয়ে ছিল, পথে ঘাটে মারপিটের ভয়ে সে তো পালিয়েই বেড়াত। এমন অবস্থা মনে হয়েছিল যে জনসাধারণ নিজেরাই এর একটা বিহিত করবে, দেবে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ঐ বিত্তবান মুনাফালোভীকে।

কাগজে কাগজে কত লেখালেখি! তোমরাই তো লিখেছ। এনফোর্সমেন্ট লাগল তার পেছনে। নেতারা ঘোষণা করলেন, "রাজেন তরফদারের বিরুদ্ধে তদন্ত সুরু হয়েছে, জনসাধারণ যেন বে-আইনী ভাবে কিছু করে নিজেদের হাতে বিচারের ভার না নেয়। সতর্ক করে দিয়েছিল একদিকে, অপর দিকে আশ্বাস বাণী ছিল। প্রতিবিধান হচ্ছে, হবে, দেশের আইন কানুন চোখ বুজে নাই ভেজালদার মুনাফাখোড়, কালোবাজারী কেউ রেহাই পাবেনা।"

এত লোক মারা গেল তার প্রতিশোধ নাহলেও অন্তত প্রতিবিধান হবে এমন একটা আশ্বাস ক্ষমতাশালী নেতৃস্থানীয়দের বিজ্ঞপ্তিতে ছিল।

ধরেই তো নিয়েছিলাম রাজেনের শেষ অনিবার্য, তার কপালে যমযন্ত্রনা নির্ঘাৎ।

কিন্তু দেখলে তো রাতারাতি কেমন রঙ বদল হয়ে গেল। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ আসলে কোন বস্তু নয়, ব্যাপারটা হলো বুদ্ধির তাহেরা-বাছেড়া। সেই বুদ্ধি খেলিয়েই রাজেন তরফদার বেঁচে গেল। সবাই বলেছে সে প্রভাবান্বিত করেছিল ক্ষমতাশালী মহলকে, তাই সে বেঁচে গেছে।

প্রফেসর-এর কথার মাঝে ভৃত্য চা নিয়ে এল। পেয়ালায় চুমুক দিয়ে প্রফেসর কথায় জের টেনে বলতে লাগলেন, "গোপনে কে কি ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল তা তো আর স্বচক্ষে দেখিনি কিন্তু পরবর্ত্তী ব্যাপার তো তুমিও জান আমিও জানি, কেমন সে এখন জে'কে নেতা সেজেছে। যারা এক সময় তার বিরুদ্ধে কথা বলেছে তারাই এখন তার বাহন। জনমত তার অনুকূলে। বলতে বলতে প্রফেসরের বক্তৃতার ঢঙ ফিরে পেয়েছেন যেন ঃ—

"এর পেছনে আসল রহস্য যে ভাঁওতা সে সবাই জানে। ভোট আদায় করার প্রাক্কালে মাঠে ঘাটে বক্তৃতা দিয়ে বলেছিল,—"ঐ যে মাঠ, সে মাঠে সে জনসাধারণের জন্য ধর্মশালা, দরিদ্রনারায়ণের মন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয় ও জলাশয় দেবে, দেবে স্কুল ও তৎসংলগ্ন হোস্টেল, বিরাট সেই পরিকল্পনা যা কার্যকরী করতে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার! স্তম্ভিত বিগলিত হয়ে

পড়েছিল জনসাধারণ, এত বড় মহানুভব ব্যক্তি হয় না, তাকে ভোট দেবে না তো কাকে দেবে ? অভ্যর্থনার হিড়িক এখানে সেখানে, সবাই এক বাক্যে বলেছে "হ্যাঁ, রাজেন তরফদার সত্যিকারের একজন দয়ালু ব্যক্তি। হি ইজ ম্যাগনানিমাস। জয় রাজেন তরফদার কি জয়।" জনসাধারণই তো তাকে ওঠাল।

"কিন্তু কৈ কেউ তো জিজ্ঞেসও করে না ঐ মাঠের পরিকল্পনার কি হল ? মাঠ যে মাঠই রয়ে গেল! থাকবেও, জানা কথা।"

"মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে সব, আদর্শ ফাদর্শ ওসব সব বাজে, জীবনে প্রতিষ্ঠাই হলো আসল। এবং প্রতিষ্ঠা পেতে হলে টাকা চাই। টাকাওয়ালা পৃষ্ঠপোষক চাই।"

"প্রতিষ্ঠিত লোককেই সবাই সমাদর করে, মানে। শোনে, তোয়াজ করে। কেউ গোপনে, কেউ প্রকাশ্যে। আমার সব দেখা আছে।"

"যখন সত্যিকারের অধ্যাপক ছিলাম তখন ছেলেদের উপদেশ দিয়ে কত বলেছি, 'জীবনে উন্নতি করতে হলে মানুষের নিঃস্বার্থ উপকার করবে, স্বার্থ ত্যাগ করবে, সৎপথে চলবে, সৎজীবন যাপন করবে, তাহলে দেখবে মানুষ ভালও বাসবে, বিশ্বাসও করবে, কিন্তু অত অভ্যর্থনা পাইনি। আনাচে কানাচে এ ও বলেছে, পাগল মার্কা কথা।"

"আর এখন, জামাতার কল্যাণে এ্যামবেসেডর চড়ে নিমন্ত্রন রক্ষা করে চলছি, যেখানেই যাই অহেতুক এক্সটেম্পো কথা বলি, কিন্তু ভাল অভ্যর্থনা পাই, এবং যা বলি তার সবটুকু কাগজে ছেপেও যায়। জনসাধারণ গোগ্রাসে পড়ে, আলোচনা করে, মন্তব্য দেয়, 'হ্যাঁ' প্রফেসর পুরুহিত ন্যায্য কথাই বলেছেন।"

"আসলে কি জান ? সাধারণের প্রশংসা নির্ভর করে ফলাফলের উপর। কে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো তা নিয়ে বেশিদিন কেউ মাথা ঘামায় না, মাথা ঘামায় শুধু ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য, স্বার্থের জন্য,—বাঁচতে হবে ত ☐

ওয়ার্ক-কালচার

শিরোমণি সাহেব আজ খুব ব্যস্ত, জরুরি কি একটা তদন্তে তাকে মাইল দশেক দূরে কোথায় যেতে হবে। তাই সাংবাদিক বন্ধু নন্দলালকে বলেন "একলা বাড়ীতে বসে থেকে কি করবে, আজ বরং এখানকার কোন একটা অফিসের পরিবেশ দেখে এসো। আমি একজন অফিসারকে তোমার সাথে দিয়ে যাচ্ছি, সেই তোমাকে সব দেখাবে, আমি গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি সেই অফিসারও এসে গেল বলে, ওর কম্প্যানি তোমার ভালই লাগবে।"

নন্দলালের কোন আপত্তি নেই, শিরোমণি তৈরি হতে ড্রইং রুম থেকে অন্দরে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জীপ এল। জীপ থামতেই নেমে এল একজন তরুণ, নন্দলাল বুঝেছে এই সেই অফিসার যার সাথে তাকে আজ ঘুরতে হবে।

"স্যার আছেন নাকি, স্যার!" বলতে বলতে তরুণ অফিসারটি ঘরে ঢোকে, সাথে সাথে শিরোমণিও অন্দর থেকে বেরিয়ে 'এসো এসো' বলে তরুণ অফিসার-টিকে স্বাগত জানায়, তারপর নন্দলালের পানে তাকিয়ে বলেন, "হি ইজ মিঃ এন্, কে, মুন্সী—নবকুমার মুন্সী, সংক্ষেপে আমরা বলি এন্ কে। – অ্যান্ ইয়ং অফিসার অব দিস্ গভর্নমেণ্ট, আজকে ইনিই তোমাকে নিয়ে ঘুরবেন। ভালই লাগবে একে তোমার, তোমার ফীচার লেখায় সহায়ক হবে।"

নন্দলাল বসে থেকেই হাত জোর করে নমস্কার জানায়। প্রতি নমস্কার করে নবকুমারও আসন গ্রহণ করে।

বেয়ারা চা-জলখাবার দিয়ে গেল। খাবার খেতে খেতে নন্দলাল ও নবকুমার একের অগোচরে অপরকে দেখে নেয়। ফেস্ ইজ দি ইন্‌ডেক্স অব ম্যান্, ফেস্ দেখে একে অপরকে ভালই লাগল।

বাইরে জীপ প্রতীক্ষমাণ। এই জীপেই শিরোমণি বেরিয়ে পড়বেন, তাড়াতাড়ি চা-খাবার খেয়ে শিরোমণি উঠে দাঁড়িয়ে দুজনার পানে দৃষ্টি বুলিয়ে বলেন, "তা হলে আমি উঠ্‌লাম; দেরী করে রওনা হলে ফিরে আসতে আবার দেরী হয়ে যাবে।" বলে ড্রইংরুম থেকে বেরোতে পা বাড়াতে বাড়াতে নবকুমারের পানে চেয়ে বলেন, "তোমার হেফাজতে আমার বন্ধুকে রেখে গেলাম, ইউ মে ফ্রিলি সো হিম্‌ দি এন্‌ভারনমেণ্ট ইন্‌ হুইচ্‌ উয়ী ওয়ার্ক।"

সাথে সাথে নবকুমারও "আচ্ছা স্যার" বলে দাঁড়িয়ে গেল।

শিরোমণি, "উইস্‌ এ-গুড ডে" বলে নন্দলালের পানে "আচ্ছা যাই ঢঙে" মাথা দুলিয়ে জীপে এসে উঠলেন। স্টার্ট দেওয়ার সাথে সাথেই জীপ আর্ত্তনাদ করে উঠল, নন্দলাল নবকুমার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। জীপ চলতেই শিরোমণি বাঁ-হাত দেখিয়ে "বাই বাই" জানালেন। নন্দলাল প্রতি উত্তরে ডান হাত নেড়ে "টা" "টা" ভঙ্গি করল। নবকুমারও দুই হাতের তালু জোড় করে বিদায় নমস্কার জানাল।

শিরোমণি চলে যেতেই নবকুমারের জড়তা সরে গেল, আবার ড্রইংরুমে ফিরে আসতে আসতে বলে, "তাহলে আপনি স্নানটা সেরে নিন, আমিও তৈরী হয়ে আসছি।" একটু থেমে বলে, "আমার সাথে ঘুরতে হলে কিন্তু আপনার অসুবিধে হবে, আমার তো জীপ নেই। আছে স্কুটার, কিন্তু স্কুটারের পেছনে কি আপনি বসতে পারবেন?"

নন্দলাল তৎক্ষনাৎ বলে, "খুব পারব, আপনি আসুন না স্কুটার নিয়ে, তখন দেখবেন পারি কিনা।"

"আচ্ছা ঠিক আছে।" বলে তখনকার মত নবকুমার বিদায় নিল।

ঘণ্টা খানেক পরে নবকুমার আর নন্দলাল চলেছে স্কুটারে করে। নবকুমার চালাচ্ছে, নন্দলাল পেছনে বসেছে, নবকুমার কথা বলছে, নন্দলাল শুনে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে দুই একটা প্রশ্ন করছে মাত্র। স্কুটারের স্পীড্‌ খুব নয়।

"চলুন আজ আমার অফিসের পরিবেশটাই আপনাকে দেখাব, যা দেখলে আরও দশটা অফিসের পরিবেশ অনুমান করতে পারবেন" বলেই নবকুমার স্কুটার চালাতে থাকে মন্থর গতিতে তার অফিসের দিকে।

যে রাস্তায় ওরা যাচ্ছে তার দুই পাশে দুই বিরাট দীঘি। এই দীঘি দুইটির দক্ষিণ পারের একদিকে শিববাড়ী অপর দিকে কালিবাড়ী। এবং সেই কারণেই এই দীঘি দুইটির নামাকরণ হয়েছে একটার শিব-দীঘি অপরটার কালী-দীঘি। রাস্তাটাই বলতে গেলে এই দুই দীঘিকে বিভক্ত করেছে।

শিববাড়ি ও কালিবাড়ীর ঠিক মাঝামাঝি বিরাট সিংহদ্বার। সিংহদ্বার থেকে এই রাস্তা জমিদার বাড়ী বরাবর এসেছে।

নবকুমার জমিদার বাড়ীর সম্মুখে এসে স্কুটারের গতি আরও মন্থর করল।

এলাকাটি বড়ই মনোরম। এককালে যে আরও মনোরম ছিল, বর্ত্তমান চিহ্ন থেকেই অনুমান করা যায়।

নন্দলাল মন্তব্য দেয়, "এমন সুন্দর জায়গাটার এমন পরিণতি হলো কেন? এখন কি কেউ এখানে থাকে না? কেমন ছাড়া ছাড়া মনে হচ্ছে।"

নবকুমার জানায়, "কে আর দেখবে, জমিদার বাহাদুরের এখন আর সেই জমিদারী নেই, সম্পত্তি বিক্রী করতে সুরু করে দিয়েছেন, কিছু কিছু বিল্ডিং সরকারের কাছে ভাড়া দিয়েছেন, নানা অফিস এই জমিদারবাড়ী এলাকাতেই। ঐ ত আমাদের অফিস। ওকে বলে রঙমহল।" ডানপাশের একটা দোতলা বড় বাড়ী দেখিয়ে দেয় নবকুমার। অদুরে দেখা যাচ্ছে সেই রঙমহল।

কথা বলতে বলতে চলেছে নবকুমার,—"এই রাস্তা ধরেই আমি রোজ অফিসে যাতায়াত করি। বেশ লাগে এই এলাকাটা।"

ওরা প্রায় এসে পড়েছে রঙমহলে। গাড়ী বারান্দায় স্কুটার এসে থামতেই নন্দলাল পেছনের সীট থেকে নেমে দাঁড়াল। নবকুমারও স্কুটার থেকে নেমে স্ট্যাণ্ডের উপর দাঁড় করিয়ে নিজের ঘড়ি দেখে নেয়।—সময় কাটায় কাটায় সাড়ে নয়টা।

স্কুটারের শব্দ শুনে ঝাড়ুদার সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছে। ঝাড়ুটা নিজ বগলে চেপে সে নন্দলাল ও নবকুমারকে "সেলাম সাব" বলে স্যালিউট দেয়। একসময় নাকি এই ঝাড়ুদার মিলিটারীতে ছিল।

নবকুমার মাথা নেড়ে তার সম্ভাষণ গ্রহণ করে। নন্দলালকে বলে, "আমি এটেণ্ডেন্স সম্পর্কে বড়ই পারটিকুলার। কাটায় কাটায় সাড়ে নয়টায় এসে যাই। আমি যখন আসি প্রায় দিনই এই ঝাড়ুদার আমাকে এমনি করে সম্ভাষণ জানায়। সব দরজা এখনও খোলেনি। পাহারাদায় এতদিন ধরে দেখে আসছে বলে সে দয়া করে আমার কামরাটা খুলে রাখে সাড়ে নয়টার একটু আগে। বলতে বলতে বিল্ডিংটিকে ঘিরে যে ঘোরান রেলিংটা আছে, অনেক একে বেঁকে, সেই রেলিং ধরে পূব দক্ষিণ কোণের একটা কামরায় নন্দলালকে নিয়ে নবকুমার ঢুকল।

টেবিল চেয়ার কিছুই ঝাড়মোছ করা নেই। ধূলো বালিতে পূর্ণ।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে নবকুমার নিজেই একটা আধ ময়লা তোয়ালে বের করে নিজের বসবার চেয়ার ও আর একটা চেয়ার ঝেড়ে পরিষ্কার করে 'বসুন' বলে নন্দলালকে বসতে বলে নিজেও বসে।

নন্দলাল বুঝে নেয় নবকুমারের নিজস্ব কোন চেম্বার নেই। পাশের সীট গুলো দেখে অনুমান করে এই ছোট কামরায় আরও দুই জন অফিসার বসেন। কোন সুইংডোর নেই, পর্দা নেই। সব খোলামেলা। নন্দলাল চোখ ঘুরিয়ে সব দেখে নেয়।

প্রাইভেসি না থাকলেও আলো হাওয়া প্রচুর।

নবকুমার যেখানটায় বসে সেখানটা হলো বাড়ীর পূর্ব দক্ষিণ কোণ। কামরাটা হলো অনেকটা ইংরেজীর 'এল' প্যাটার্নের। নবকুমার 'এল' এর নীচের অংশে

বসে, বাকী দুইজন অফিসার অপর অংশে। তার মানে নবকুমার ঘরের ভাল দিকটাই দখল করেছে।

নবকুমার পূব দিকে মুখ করে বসে, সামনে দরজা, ডানে দরজা।

পূর্বদিকের দরজা বরাবর একটি হ্যাংগিং লোহার সিঁড়ি আছে। ঐ সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠা যায়।

নবকুমারই বলে, "এই বিল্ডিংটি মার্টিন কোম্পানী তৈরী করেছিল। যখন বাড়ী তৈরীর মাল মশলার দাম ছিল খুব সস্তা, সেই সস্তার দিনেও এই বাড়ী তৈরী করতে জমিদার বাহাদুরের খরচ পড়েছিল প্রায় দুইলক্ষ টাকা। এখন এমন একটা বাড়ী তৈরী করতে হলে প্রায় সাত আট লক্ষ লাগবে। বলা আর শেষ হলো না, তার আগেই উপর থেকে টুকরো টুকরো চুন সুরকি মেশানো ইটের ছোট ছোট কণা নবকুমারের ডান পাশ ঘেঁষে টেবিলের উপর ছিটকে পড়ল ঝুরঝুর করে।

কথায় জের টেনে নবকুমার বলে—"এই দেখুন না, বাড়ীটা একেবারে পুরোণ হয়ে গেছে. প্রায় সর্বক্ষণই এমন চুন সুরকির গুড়ো পড়তে থাকে। মেরা-মতের বালাই নেই। বাদলার দিনে তো বসাই যায় না। চেয়ার টেবিল সব ভিজে যায়। গভর্নমেন্ট যত টাকা ভাড়া দিল গত কয়েক বছরে, ঐ টাকা দিয়ে নিজস্ব বাড়ীই করা যেত। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সব স্বার্থপর অলিতে গলিতে কত অফিস দিন দিন হচ্ছে। প্রায় সবই প্রাইভেট হাউস। কেবল মাত্র মেইন অফিসগুলো সেক্রেটারিয়েট আর ডাইরেক্টোরেট ছাড়া।"

নন্দলাল প্রশ্ন করে, "গভর্নমেন্ট কেন নিজেদের বাড়ী করে না?"

নবকুমার চটপট বলে, "কেন করবে? করলে তো নিজেদের অনেক লোকসান হয়ে যাবে। যে বাড়ীর ভাড়া চাকুরিজীবিকে দিলে পেত খুব জোর পঞ্চাশ বা একশ টাকা, সে বাড়ীই সরকারকে দিয়ে আদায় করে পাঁচশ হাজার টাকা। আর এই সব বাড়ীগুলোর মালিকরা প্রায় সবাই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষদের কারও না কারও আত্মীয় বন্ধু বা পাত্র মিত্র। অনেক বড় বড় অফিসার সরকার থেকে লোন নিয়ে বাড়ী করে সেই বাড়ী সরকারকে ভাড়া দিয়ে নিজেরা থাকে

সরকারী কোয়ার্টার্সে। সুতরাং সরকারী বাড়ী হলে নিজেদের অ্যাডিশ্যানেল আয় বন্ধ হয়ে যাবে না ? তাই যাদের সরকারী নিজস্ব বাড়ীর প্রস্তাব দেওয়ার কথা তারা নিজেদের স্বার্থেই দেয়না। দিলেও দেয় ঢিমা-তালে। সংখ্যায়ও প্রয়োজন অনুপাতে কম।"

নন্দলাল কথা শুনতে শুনতে চারিদিকে তাকায়। চোখ বরাবর তাকালে অনেক কিছু দেখা যায়।

নবকুমারের দরজা সোজা দুইটি তেমাথা-মানে তিন রাস্তার সঙ্গম। দক্ষিণ দিক থেকে যে রাস্তাটি এসে একটু বেঁকে পশ্চিমে ঘুরেছে সেখানে একটি, আর একটি সোজা চোখবরাবর দক্ষিণ দিকে চলে গেছে।

ঠিক এমনি সময় ডানের রাস্তা কাঁপিয়ে "নাইটসয়েল" বোঝাই বিরাট একটা ট্রাক্‌টার চলে গেল। বাতাসে ওর দুর্গন্ধ নাকে আসতেই নন্দলাল ও নবকুমার রুমাল দিয়ে নাক চেপে ধরে।

কিছুক্ষণ নাকে রুমাল দেওয়া সত্বেও যেন গন্ধ যেতে চায় না।

নবকুমার নাকের রুমাল সরিয়ে বলতে থাকে, "এটা রোজকার ব্যাপার। এ সহরটি উত্তরোত্তর ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ জিনিষটির পরিবর্তন হলো না। আগে রাতের অন্ধকারে গরুতে গাড়ী টেনে ময়লা নিয়ে যেত। এখন ট্রাক্‌টারে টেনে নেয়, এই যা তফাৎ। সময় নেই অসময় নেই হঠাৎ এই গাড়ীকে দেখা যায়। ঠিক অফিসে এসেই একবার ঝাড়ুদার, তারপরে ঐ নাইটসয়েল বোঝাই গাড়ী মনের ফূর্তি নষ্ট করে দেয়। দেখুন না রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছে সবাই নাকে একটা না একটা কিছু চেপে ধরে চলেছে।"

ঐ দুর্গন্ধে মুখটা নন্দলালের বিস্বাদ মনে হচ্ছে। এক গ্লাস জল হলে ভাল করে মুখটা ধুয়ে নিত। কিন্তু কাকে বলবে সে জল দিতে। কোন পিয়ন তো দেখা যাচ্ছে না। তাই সে প্রশ্ন করে— "আপনার পিয়ন এখনও আসেনি ?"

নবকুমার জানায়, "সেসব কথা বললে অনেক কথা বলতে হয়। পিয়নের আধঘণ্টা আগে হাজির হবার নিয়ম। কিন্তু প্রায় দিনই ও বেটা দেরী করে আসে। কিছু বললে এমন একটা উদভ্রান্ত কাচু মাচু ভাব দেখিয়ে কৈফিয়ত দেয়, সে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। কোন দিন বাজার করেই দৌড়ে এসেও বাস ধরতে পারল না। তাই হেটে এসেছে। কোন দিন বলে হাসপাতালে গিয়েছিল স্ত্রীর অসুখ, মেয়ের অসুখ অথবা নিজের অন্য কোন কারণ।

প্রথম প্রথম ধমক ধামক দিতাম। রিপোর্ট করে পাল্টিয়েও দেখেছি সবই উনিশ বিশ। ভাল পিয়ন আমরা পাই না। ভাল মনে হলেই অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে এখানে দেবে যত সব আধা পাগলাটে, খাম্‌খেয়ালী, আড্ডাবাজ দলবাজ ফাঁকিবাজ সব। আগে আমরা চারজন অফিসারে দুইটি পিয়নের সার্ভিস পেতাম। বর্তমানে একজনকে সরিয়ে নিয়ে গেছে বড় সাহেবের বাড়ীতে গোদুগ্ধ দোহন, কুকুর পালন, বাগানের কাজ ও মেমসাহেবের ফাই ফরমাস, হাট বাজার করবার জন্যে। হাজিরাটা কিন্তু এই অফিসের এটেণ্ডেন্স খাতায় ঐ অফিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট রীতিমত দিয়ে যাচ্ছে। কিস্‌সু বলবার জো নেই।

ফলে আমাদের চারজন অফিসারের ঐ একটি পিয়নকে দিয়েই ভাগাভাগি করে চলতে হয়। চলা কি আর যায়! জরুরী প্রয়োজনে কতদিন ডেকে ডেকেও পাই না। কলিং বেলে কাজ না দিলে গলা ছেড়ে চিৎকার দিয়ে ডেকে ডেকে যখন পাই না তখন বুঝে নেই হয়ত বাকী তিনজনার মধ্যে যে কোন একজনার হুকুমে সে কোথায়ও গেছে, কিন্তু সামনে তা নয়। চার-জনের কাজের তাগিদ যত বেশী ওর পক্ষে ফাঁকি দেবার মজাও তত বেশী। আমি ডেকে না পেলে, সে বলে নিয়োগী সাহেবের কাজে পোষ্ট অফিসে গিয়েছিল, নিয়োগী সাহেবের ডাকে সারা না দিয়ে অনেক পরে এসে হয়ত বলবে সান্যাল সাহেবের ফাইল নিয়ে জেনারেল সেক্‌শনে নিয়েছিল; সেখানে কি একটা কাজে সেক্‌শনের বড়বাবু আঁটকে রেখেছিল। মানে সে ঘুরে নানা ধান্দায়। আর সুযোগ পেলেই ঢোকে গিয়ে ঐ চায়ের দোকানে। সেখানে

আড্ডা মারে। কোন দিন তাস পিটে। একান্ত যখন পারে না তখন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলে যদি জানতে চাই, "কোথায় ছিলে ?" উত্তর দেয় "চা খেতে গিয়েছিলাম স্যার।" এমনি করে কতবার যে চা-খেতে যায়। সে আর বলে লাভ নেই। গণতন্ত্রের যুগ, শুনতে পাই সে নাকি তার এলাকার একজন মাতব্বর। গত ইলেক্‌শনে কোন এক এম এল এর ভোট সংগ্রহ করে তার স্বীকৃতি হিসেবে এই চাকুরী পেয়েছে. আগামী ইলেক্‌শনে সে হয়ত নিজেই দাঁড়াবে। সুতরাং এম, এল, এ, হলে সে নিজেই আমাদের উপরে ছড়ি ঘোরাবে আর মন্ত্রী হলে তো ওভারনাইট শেয়াল থেকে সিংহ। এমন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে কার বাপের সাধ্যি অকর্মা বলে চাকুরি থেকে সরায়! সেও বুঝে নিয়েছে তাকে সরাবার ক্ষমতা আমাদের নেই, রিপোর্ট দিলেও কিস্‌সু হবে না, তাই ফাঁকি দিয়ে বেড়ায়।

"আর ফাঁকি সে একা দেয় নাকি! অফিসের বাবুদের অবস্থাও তাই। ঐ চায়ের দোকানে সময় নেই অসময় নেই, একবার চা, একবার পান, কোনবার হয়ত সিগেরেট. এক এক দিন ইচ্ছে করে তাদের ডেকে বলি, আরে মশায় আপনারা যখন ঐ চায়ের দোকানেই বেশীক্ষণ বসেন তা হলে আমার জন্যেও একটা জায়গা দেখুন। যদি জায়গা থাকে তবে আমার এই চেয়ার টেবিলগুলো নিয়ে সেখানে একটা জায়গা করে দিন, তাহলে আপনাদের কোন চিন্তা নেই কেবল আড্ডা আর চা, বুঝতে পেরেছেন!"

"কিন্তু বলতে পারিনা। নিজের মান-ইজ্জৎ-সম্মান বাঁচিয়েই চলি। পপুলারিটি রাখতে হবে ত!"

"আমার কি ক্ষমতা! যাদের আছে তারাই দেখেও দেখে না। কিস্‌সু করে না। মাঝখানে আমি কেন গায়ে পড়ে শুধু শুধু আন পপুলার হতে যাব? এই বেশ আছি।

"কি আর করা যাবে, স্বভাব খারাপ তাই অফিসে সময়মত আসি। এবং যতক্ষণ ওরা না আসে বসে বসে সিগেরেট খাই। অপেক্ষা করতে থাকি কখন

দিয়া করে পিয়নটি আসবে। হাতের আঙ্গুলের নখ্ কাটতে হলে এই সময়ই কেটে নেই। তা না হলে চারিদিক দেখে নেই।"

"সবই দেখা. প্রায় মুখস্ত তবু দেখি, আবার দেখি, রোজই দেখি।"

উঠে দাঁড়িয়ে নন্দলালও দেখে নেয়। রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছে সে।

ইলেকট্রিক পোষ্টের সারি। পাওয়ার হাউসটি পূর্বদিকে একটু এগিয়ে গেলেই দেখা যায়। শব্দও কানে আসছে। নবকুমারও বেড়িয়ে এসে নন্দলালের পাশে এসে দাঁড়ায়।

নবকুমার দেখিয়ে দেওয়ার ঢঙে বলতে থাকে, "এখানে দাঁড়ালে চোখ বরাবর অনেক দূর দেখা যায়। ডানে বাঁয়েও অনেক কিছু। এ বাড়ীটি জমিদার বাড়ী এলাকায় একপাশে বলে এইসব রাস্তা দিয়ে চলাচল একটু বেশী। অফিসের সময় এসব রাস্তায় চলাচল বেশী। স্কুলের মেয়েরা এই রাস্তা দিয়ে সম্মুখের বড় মাল্‌টিপারপাস্ স্কুলে যায়। আবার সাড়ে চার পৌনে পাঁচটা নাগাদ ঐ মেয়েরা স্কুল শেষে এ রাস্তা ধরেই বাড়ী ফিরে যায়। তখন দৃশ্যটি বেশ মনোরম। শীতকালের পড়ন্ত বেলায় ঝাঁকে ঝাঁকে একই রঙের স্কুল পোষাক পরিহিতা নানা বয়সের মেয়েরা বাড়ী ফিরে যেতে থাকে। ঠিক ঐ সময়ে আকাশেও নানা রঙের পাখী— কাক, বক ও নাম না জানা অনেক পাখী রাতের আশ্রয়ে ফিরে যায়। তখন দৃশ্যটি বেশ লাগে দেখতে। আমার মনেও কবিত্ব জাগে, কিছু লিখিও।"

ইলেকট্রিক হাউসটা নিকটে বলে এখানে ইলেকট্রিক পোষ্টের সংখ্যা বেশী এবং ঘন ঘন। নন্দলালের দৃষ্টি আকর্ষন করে একটা পোষ্ট। পোষ্টের গায়ে কাঁটা তার—একটা টিনপ্লেট আছে ঐ পোষ্টে তাতে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে, "*Danger. 11000 wts,*" একটা কঙ্কালের চিহ্ন ও দুটি হাঁড় ক্রশ্‌ওয়াইজ। *Danger*-এর প্রতীক।

একটা কদম ফুলের গাছ, গোটা তিন কলা গাছ, একটা তেতুল গাছ, রাস্তার পাশে তিনটা করবী ফুলের গাছ, রাস্তার উপর ফুল ঝরে পড়েছে। একটা দেশী ও একটা বিলেতী খেজুর গাছও সৌন্দর্যের প্রতীক।

নবকুমারের বসবার ঘর থেকে ৩০/৪০ গজের মধ্যেই নবকুমার বর্ণিত সেই চায়ের দোকান। উপরে ছনের ছাউনি, সেই ছাউনিকে একটা লাউ গাছ ছেয়ে ফেলেছে। গোটা কয়েক লাউ নানা সাইজের, নন্দলাল ওখান থেকেই দেখছে। যাতে দৃষ্টি পড়ে গাছের বা ফসলের ক্ষতি না হয় সে কারণে দোকানের মালিক সতর্কতা হিসেবে ছেড়া জুতো, ভাঙ্গা হাড়ি ঝুলিয়ে রেখেছে, ঘরের ছাউনিতে দুটি বাঁশের কঞ্চি বেঁধে একটা ছেড়া জামা এমন ভাবে সাজিয়েছে অন্ধকারে যদি কেউ দেখে নিশ্চয় মনে করবে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দোকানটির পাশেই একটা লেটর-বক্স।

শিব দীঘিতে স্নান সেরে মেয়ে পুরুষরা আশেপাশের বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। নবকুমার বলে, "এ দীঘিতে স্নান করাটা ওরা খুব পবিত্র গঙ্গাস্নানের তুল্য মনে করে। অল্প বয়সের মেয়েরা বধূরাও স্নান করে যায় এই দীঘিতে। চায়ের দোকানে যারা বসে থাকে তাদের দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে কেমন জড়সড় হয়ে যায় ওরা, আমি ভেবে পাই না, অমন খোলামেলায় স্নান করতে আসাটা অল্প বয়সী মেয়ে-বধূদের উচিত কিনা, বেটা-মর্দ'রা স্নান করে করুক। কিন্তু মেয়েরা অমন ভাবে স্নান করে চোখের সম্মুখ দিয়ে যেতে থাকলে কার না নজর কাড়ে!" বলেই নবকুমার মুচকি হাসে।

কেরানী বাবুরা এক এক করে আসতে থাকল, নন্দলাল ও নবকুমার আবার যথাস্থানে এসে বসে। সাড়ে দশটা বেজে গেছে, আরও পনের মিনিট বাদে নবকুমারের পিয়ন এল।

পিয়নকে দেখেই নবকুমার বলে, "চলুন একটু বাইরে দাঁড়াই, টেবিল চেয়ার-গুলো একটু ঝাড়-মোছ করে দিক, যা বালি।"

ওরা আবার বাইরে এসে দাঁড়ায়। কেরানীবাবুরা এটেণ্ডেন্স রেজেষ্ট্রিতে নাম সই করে বাইরে রোদে দাঁড়িয়েছে। নবকুমার ওদের দিকে না চেয়েই মৃদুস্বরে

বলে, "রোদ পোহান হয়ে গেলে কাজে বসবার আগে একবার ঐ চায়ের দোকানে আসবেই, তারপর আধঘণ্টা পৌনে একঘণ্টা কাটিয়ে তারপর নিজ নিজ আসনে গিয়ে বসবে, এই নিয়ম।"

ইতিমধ্যে পিয়ন নবকুমারের টেবিল চেয়ার ঝাড় মোছ করে দিয়েছে। ওরা আবার ফিরে এসে বসে। নবকুমার পিয়নকে নির্দ্দেশ দেয়, "আমাদের জন্য দুই পেয়ালা চা এনে দাও।" বলেই নন্দলালের পানে চেয়ে বলে, "একটু চাঙ্গা তো হয়ে নি!"

নন্দলাল এতক্ষণে জলের প্রয়োজন ভুলে গেছে, ভাবটা চা হলেই চলবে।

কিছুক্ষণ বাদে নবকুমারের পাশের অফিসার মিষ্টার সান্যাল এসে গেলেন। দেখেই অনুমান করা যায় উনি অনেক দুর থেকে হেঁটে এসেছেন।

মিঃ সান্যাল ঘরে ঢুকেই নবকুমারের পানে তাকিয়ে জানতে চান। "পিয়ন শ্রীমান কি এখনও আসেনি?" বলেই নবকুমারের উত্তরের অপেক্ষা না করে কলিংবেল চাপতে থাকেন। ক্রিং ক্রিং শব্দের সাথে মুখে বলেন। "দেখুন না, টেবিল চেয়ারের অবস্থা কি করে রেখেছে! 'ক্রিং ক্রিং এ কোন ফল হচ্ছে না দেখে মুখে চিৎকারও দেন। 'নেপাল, নেপাল'—বলে। নিজেই হাতের দৈনিক খবরের কাগজটি নিয়ে নিজের চেয়ার ঝেড়ে নেন। নেপাল ঠিক সময়ে দুই হাতে দুই কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

সান্যাল ওকে দেখেই ধমকের সুরে বলে ওঠেন। "ঝাড়-মোছগুলু আগে করতে পারনা হতচ্ছাড়া কাঁহাকার! এগুলো ঝেড়ে দাও। তারপর ডাক লক্ষ্মীবাবুকে।"

নেপাল হাতের পেয়ালা দুটি নবকুমার ও নন্দলালের টেবিলে রেখে, সান্যালের টেবিল ঝাড়-মোছ করতে ব্যস্ত হয়। হয়ে গেলে সরে পড়ে, বোধ হয় সান্যালের নির্দ্দেশে লক্ষ্মীবাবুকে ডাকতে যায়।

লক্ষ্মীবাবু, মানে লক্ষ্মীচরণ সিংহ, সান্যালের ক্লার্ক, অল্প বয়সের এক ছোকড়া, মাথার চুল উঠে যাচ্ছে। দেখে মনে হয় বড় নম্র এবং ভদ্র স্বভাবের এসে দাড়ায় সান্যালের টেবিলের সম্মুখে।

লক্ষ্মীবাবুকে দেখেই সান্যাল বলে ওঠেন—"আরে লক্ষ্মীবাবু আমাকে ভবানীবাবু বলেছিলেন স্কীমের ফাইলটা নাকি পাওয়া যাচ্ছে না, দেখুন, দেখুন খুঁজে দেখুন। নিশ্চয় পাওয়া যাবে। না পেলে তলাপাত্রকে ফোন করুন সে বের করে দিয়ে যাবে।"

লক্ষ্মীবাবুর নির্দ্দেশ নিয়ে 'আচ্ছা স্যার" বলে যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে অমনি সান্যাল আবার বলতে শুরু করেন, "আর শুনুন কার্ত্তিকবাবুকে ফোন করে বলে দিন জিনিষগুলো যেন ধনীকে ডেলিভারী দিয়ে দেয়।" একটু থেমে, "একটা রসিদ তৈরী করে রাখবেন আমি স্যাটিফাই করে দেব, বুঝলেন?" লক্ষ্মীবাবু বুঝেছে ভাব প্রকাশ করে।

সান্যাল বলেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যান, দেখুন ওরা কতদুর কি করল।'

লক্ষ্মীবাবু সব আদেশ নির্দ্দেশ শুনে ফিরে যাবেন, যাচ্ছেন আবার সান্যাল বলে, "হ্যাঁঃ, দেখবেন মালগুলো যেন ভাল করে প্যাক্ করা হয়, বুঝলেন?"

লক্ষ্মীবাবু 'আচ্ছা স্যার' বলে সরে গেলে সান্যাল হাঁক ছাড়েন। "এই নেপাল, দেখ পিন কুশনে আলপিন রাখতে পারিস না? খাবার জল দে। সিগেরেটের এস্‌ট্রেটি পরিষ্কার করে রাখতে পারিস না? কিছু বলি না বলে খুব ভাল মানুষ পেয়েছিস না? আরে বেটা, যদি রিপোর্ট করি তবে টের পাবি। তখন বড় সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে পা চেটেও কুল পাবি না। যতসব অকর্মার ধাড়ি, যা নিয়ে যা, আর উপেনবাবুকে ডেকে দে।"

নেপাল এস্‌ট্রেটি তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায়। সান্যাল ঘরের কোনটি লক্ষ্য করে স্বগতই বলে চলেন, "ওখানকার জিনিষগুলো আবার কোথায় গেল? মুস্কিল হয়েছে, যতসব ইরেস্‌পন্‌সিবল! কি যে হয়েছে দিন কাল কেউ ঠিক মত কাজ তো করেই না করতেও দেয় না।" কলিং বেল এ হাত চেপে মুখে 'নেপাল, নেপাল' হাঁক দেন।

এমন সময় একজন কেরানীবাবু এসে ঢুকেই বলেন, "স্যার পার্লামেন্ট কোশ্চেনের উত্তর সংগ্রহ করতে হলে আমাকে একবার তারকপুর যেতে হয় স্যার, ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা গাড়ী কি পাওয়া যাবে না স্যার ?"

সান্যাল চটে ওঠেন। "দেখুন কল্যাণবাবু, সরকারী গাড়ী টাড়ী চাইবেন না মশায়। রিক্সা করে যান না হয় হেঁটে যান। ওসব গাড়ী হলো বড়-কর্ত্তাদের খোস্ টহলের জন্য। রিক্সা করে যান, ভাউচার দেবেন আমি সার্টিফাই করে দেব। যান যান তাড়াতাড়ি উত্তর সংগ্রহ করে নিয়ে আসুন। পার্লামেন্ট কোশ্চেন! হেলা খেলা নয়! আজই উত্তর দিতে হবে।"

সান্যালের মেজাজ দেখে কল্যাণবাবু সরে পড়েন।

এবার সান্যাল নবকুমারের পানে চেয়ে মন্তব্য দেয়—"দেখলেন তো, ওরা আমার কাছে গাড়ী চায়, কিন্তু গাড়ী আমি কোথা থেকে দেব ? দেখছেন না ওগুলো সব পেস্টেড্ হয়ে আছে বড় কর্ত্তাদের বাটক্স্-এ! খোলা যাবে না কি! ইমপসিব্যল! যত সব হামব্যাগ! মুখে বড় বড় কথা বলবে ইকনমি করুন বাজে খরচ কমিয়ে ফেলুন, অফিসকে টিউন করুন, অথচ নিজেরা পেট্রল পোড়াচ্ছে খোস্ টহল দিয়ে। বাপের জন্মে কোন দিন গরুর গাড়ী চড়তে পারে নি। এখন বড় অফিসার হয়ে, মন্ত্রী হয়ে গাড়ী না হলে চলে না। যেন নিজের শ্বশুরের দেওয়া গাড়ী। বাথরুমে যেতে হলেও গাড়ী চাই। অথচ কাজের প্রয়োজনে পাওয়া যাবে না! দেশ থেকে অনাচার যাবে কি করে ? সদাচার সদাচার করে চীৎকার দিলেই হলো!"

কথা বলতে বলতে বা পাশের ড্রয়ারটা খুলতে গিয়ে তালা দেওয়া দেখে আবার হাঁক ছাড়েন—"আরে নেপাল ড্রয়ারটা খুলে দিলি না ? তুই একটা হোপলেস্! অফিসে এসে অমন ভোলানন হয়ে কাজ করিস কেন ?"

নেপাল ড্রয়ার খুলে দিলে নিজের আপন মনেই বলতে থাকেন—'তিন দিন ধরে খবরের কাগজটা পড়তে 'সময় পাইনি' বলেই খবরের কাগজটা খুলে চোখ বুলাতে থাকেন।

হঠাৎ যেন নবকুমারের সম্মুখে একজন নবাগত বসে রয়েছেন লক্ষ্য করলেন। তাই নবকুমারকে বলেন, "মিঃ মুন্সী ওনাকে তো চিনতে পারলাম না! ওনাকে কোনদিন দেখেছি বলে তো মনে হয় না।"

নবকুমার পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলে। "ইনি হলেন নন্দলাল মুখার্জী, আমাদের শিরোমনি সাহেবের একজন বন্ধু।" বাকী পরিচয় গোপন করে রাখে।

সান্যাল প্রশ্ন করে এবার নন্দলালকে—"এখানে বেড়াতে এসেছেন বুঝি।" নিজেই আবার বলেন। "বেশ বেশ আমাদের হাল চাল দেখে যান।"

নন্দলাল মৃদু হাসে।

কিন্তু নবাগতের সাথে আলাপ জমাতে মোটেই ব্যস্ত না হয়ে সান্যাল জানতে চায়—"আচ্ছা মিঃ মুন্সী এ, জি, থেকে পে-স্লিপ না পেলে কি করে একটা লোক তিন মাস ধরে সংসার চালায় বলুন ত! ডি, ও, লেটর দিয়েও উত্তর পেলাম না। বলবেন না ওদের কথা। এমন সব অফিস হয়েছে। চিঠি দিয়েও উত্তর পাওয়া যায় না, নিজে গিয়ে তদ্বির না করলে কিস্সু হবে না। অফিসার হয়েও যদি তদ্বির করতে হয়, সাধারণ লোকদের কথা ভেবে দেখুন। তারা ধর্ণা দিয়েও কুল পাবে না। আর আমাদের হেড্-অফিসটাই বা কি দেখুন। একাউন্টস্ অফিসারের সাথে আমি আলাপ করেছি, উনি বলেন ওটা ট্রান্সফার হবে ডিপুটেশন নয়। হেড্-অফিস কোন কাগজ পত্তর দেখবে না, অথচ একটা অর্ডার দিয়ে দিল। আজকাল অফিসারগুলোও তেমন হয়েছে, না দেখে, না জেনে সই করবে। কেন রে বাবা একটু দেখে শুনে সই করতে পারিস না? ওদের খামখেয়ালির জন্যে এখন আমার লাগবে একটি বছর ঐ অর্ডারটির মডিফিকেশন বের করতে! তার মানে এর কাছে যাও, ওর কাছে যাও, আবার সেই তদ্বির! দেখলেন ত!"

বলতে বলতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে, "যাই দেখি মিঃ পালকে একবার টেলিফোন করি, ও বেটাদের তাগিদ না দিলে আমার ফাইলই ধরবে না।"—

বলেই পাশের দরজা দিয়ে নবকুমারের পেছনের কামরায় চলে গেলেন বোধ হয় টেলিফোন করতে।

সান্যাল চলে যেতেই নবকুমার হেসে বলে, "এই হলো আমার সহকর্মী অফিসার মিঃ সান্যাল। গলায় ভলিউম আছে, যতক্ষণ থাকবেন এমন ব্যস্ত ভাবেই কাটাবেন। প্রথম প্রথম বিরক্ত হতাম, এখন হই না, এক কান দিয়ে ঢুকে অপর কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। মাঝে মাঝে কিন্তু বেশ ইণ্টারেষ্টিং কথাই বলেন।"

"ভদ্রলোকের কাজ করবার ইচ্ছা. কিন্তু কাজ কি করে করতে হয়,—মোটেই জানেন না। একজনকে একটা কাজ দিয়েই আবার ডেকে পাঠাবেন। অন্য কাজের হুকুম দেবেন, শেষে সব গোল প্যাকিয়ে তোলেন। অনেকেই বিরক্ত হয়।"

"আমিও বিরক্ত হতাম, এখন হই না, কারণ মিঃ সান্যাল আসলে অতি গোবেচারা। যে কাজে নিযুক্ত হয়েছেন একেবারে মিস্-ফিট্। মাষ্টারী লাইনটাই ওনার ঠিক লাইন ছিল। ছিল, তবে এখন আর বলি না, কারণ স্কুল-কলেজে পড়ানটাও লাটে উঠেছে— টিউশানী সর্বস্ব।"

নন্দলাল একটা সিগেরেট টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে সান্যালের বাঁ পাশের চেয়ার টেবিল দেখিয়ে জানতে চায় "উনি বুঝি আজ আসবেন না ?"

নবকুমার বলে, "আসতে পারে, নাও আসতে পারে, খুব ট্যুর করে বেড়াচ্ছেন, আর সাব অর্ডিনেট অফিসারদের মাথা ভেঙ্গে খুব মাংস পোলাউ খেয়ে নিচ্ছেন। উপর মহলে যাতায়াত আছে খুব, সব সময় পরিকল্পনা নিয়ে চলেন. ফেরেন, বড় বড় মহা মহারথীদের সন্তুষ্ট করবার কায়দা কানুন খুব ভাল জানা আছে ঐ মিঃ নিয়োগীর। রিপাবলিক ডে-তে কে ফ্ল্যাগ হোয়েষ্ট করবে, কে গেস্ট ইন্ চিফ্ হবে, বিশেষ বক্তৃতার জন্যে কাকে অনুরোধ করা হবে এবং কার মারফতে—এসবে খুব ওস্তাদ ব্যক্তি। সব সময় মুখে চোখে একটা উদ্‌ভ্রান্ত ব্যস্ততার ভঙ্গি। আসলে কেরিয়ার তৈরীর দিকে ঝোঁক্ বেশী। করিৎকর্ম্মা ব্যক্তি যাকে বলে।"

"এই বিল্ডিং-এ আরও তিনজন অফিসার আছেন। মিঃ দাস বসেন ঠিক আমার পেছনের কামরায়, উনি আমাদের চেয়ে একধাপ উপরে কিনা তাই ওনার

চেম্বার আলাদা। ওনার রিটায়ার এর আর বেশী দিন নেই, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসেই রিটায়ার করার বয়স হয়ে যাবে, মাত্র গত বছর বর্ত্তমান পোষ্ট পেয়েছেন। রিটায়ার করবেন তো তাই পাবলিক সার্ভিস কমিশান অনুগ্রহ করে বা জেনারাসলি ওনার বয়সটা ভেবেই ওনাকে সিলেক্ট করেছে। সেই দম্ভে সুযোগ পেলেই বলেন, "আমি সার্ভিস কমিশন দ্বারা মনোনীত।"

"সুবিধে পেলে উনি আরও অনেক কিছু বলেন, ২৫ বছর উনি হেডমাষ্টারী করে তারপর অফিসার হয়েছেন, তাই সময় অসময় বলেন, "পঁচিশ বছরের হেড-মাষ্টারীর চাকুরীতে আমি এমন ইনডিসিপ্লিন দেখিনি, কেউ কারও কথা শোনে না, মানে না, দিন কাল হলো কি! এমন গড়িমসি, অপটুতা, অব্যবস্থা অফিসগুলোতে আছে জানলে কে মশায় অফিসার হতো!"

"অথচ ভদ্রলোক হলেন নাম্বার ওয়ান অলস। অবসর পাবেন বলে এখন আর কিস্সু করতে চান না।"

দেখতে ভদ্রলোক বেশ স্বাস্থ্যবান, আর দশ বছরেও ওনার স্বাস্থ্য ভাঙ্গবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু ওনার 'ম্যানিয়া' আছে, প্রায়ই বলতে শুনি, "শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, মাথাটা কামড়ায়, খাটুনির জন্যে বড়ই দুর্বল বোধ করছি।"

"অফিসেই 'ওভালটিন' আর 'হরলিক্স্' আনিয়ে রেখেছেন, কোন কাগজ নিয়ে ক্লার্ক এলেই উনি আগে নিজের এসাইন্‌মেন্টের কাগজটা দেখে নেন। টেবিলের উপরই বড় কাঁচটির নীচে চাপা থাকে ঐ কাগজটি, যদি ওনার এলট-মেন্টের বাইরে হয় তবে চটপট লিখে দেন, 'দিস্ পেপার ডাজ্ নট রিলেট টু মাই সেকশন,' আর যদি ওনার এসাইনমেন্টের ভেতরেই পড়ে "ফাইলটা রেখে যান," বলে পিয়নকে ডেকে বলেন, "কৈ রে একটু ওভালটিন্ দিলি না?"

"ওভালটিন খাওয়া হয়ে গেলে অর্ডার দেওয়ার ভঙ্গিতে লিখে রাখেন ঐ ফাইলের নোট সীটে, "প্লিজ স্পীক," তারপর 'স্পীক' করতে ক্লার্ক এলে, "আজ রাখুন, একটু অবসর পেলেই আপনাকে ডাকব," বলে ফিরিয়ে দেন।

"এভাবে অনেক জরুরী কাগজ উনি চাপা দিতে ওস্তাদ, তারপর কিছু কাল পরে যখন ঐ জরুরী কাগজের জন্য উপর মহল থেকে তাগিদ আসে, সেই কাগজ নিয়ে এসে যদি ক্লার্ক বলে, 'স্যার, আপনি বলেছিলেন আলাপ করবেন, বড্ড দেরী হয়ে গেছে স্যার।' তৎক্ষনাৎ মিঃ দাস নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে বলেন. "এতদিন ফেলে রেখেছেন কেন ? করিয়ে নিলেই ত পারতেন। কিস্সু করবেন না মশাই আপনারা, তাগিদ পেলে তারপর কাগজ নাড়াচাড়া করবেন। আপনাদের এই গড়িমসি চাল আর আমার ভাল লাগে না, তাই দিন গুণছি কবে রিটায়ার করব। আপনাদের পাল্লা থেকে যেতে পারলেই বাঁচি। ভাবছি এবার ডিপার্টমেণ্ট এক্সটেনশন দিতে চাইলেও আমি আর থাকব না।"

"অথচ আমরা জানি উনি ভিতরে ভিতরে চেস্টা করছেন এক্সটেনশন পাবার জন্য। ধরপাকড় করে দরবার করে পেয়েও যাবেন এক্সটেনশন নিশ্চিত।"

"শরীরটা আজ মোটেই ভাল যাচ্ছে না, কাজের চিন্তার আরও খারাপ হয়ে গেল।—এসব বলে প্রায় রোজই বেলা তিনটে নাগাদ বাড়ী চলে যান।"

"যদি ওনাকে খুশি রাখবার জন্যে বলা হয়, কিন্তু আপনি চলে গেলে এত কাজ করবে কে ? ষ্ট্যাটিস্‌টিকস্‌ কি চারটি খানি কথা !"

তৎক্ষণাৎ বলবেন, "দেখুন না, সারাজীবন সাহিত্য নিয়েই কাটালাম আর শেষ জীবনে কিনা আমি ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল অফিসার ! কি বুঝি আমি ষ্ট্যাটিস্‌টিকস্‌-এর ? শুধু এইটুকু বুঝেছি ষ্ট্যাটিস্‌টিকস্‌ কেবল মাত্র লাই নয় ড্যাম্‌ লাই গোজামিল।"

নন্দলাল আশ্চর্য হয়ে বলে, "এমন ই ব্যাপার বুঝি !"

নবকুমার—"সত্যি তাই। রিটায়ারমেণ্টের আর দেরী নেই অথচ ষ্ট্যাটিটিকস্‌-এর ট্রেনিং নিতে উনি এখন বাইরে গেছেন। থাকলে আপনাকে নিয়ে যেতাম ওনার কাছে। আলাপ করে মজা পেতেন।"

নন্দলাল—"আজ বাদে কাল উনি অবসর নেবেন অথচ এমন সময় ট্রেনিংও নিচ্ছেন, এ জন্যই সরকারের এত সমালোচনা হয়।"

নবকুমার "আরে মশাই, আপনারাও যেমন! পেন্সন আর ট্রেনিং দুটো দুই সেক্শনে ভিন্ন ভিন্ন ফাইলে ডিল হয়। টু সেপারেট ইসুজ। যখন ট্রেনিং এর কাগজ তৈরী হয় তখন জানবার প্রয়োজন নেই ভদ্রলোক কবে অবসর নিচ্ছেন।"

নবকুমার বলেই যাচ্ছে, "এই তো গেল মিঃ দাসের ব্যাপার। মিঃ দাসেরই মাথা বরাবর উপর তলায় বসেন মিস মল্লিক, বয়স ৪০/৪২। স্পিনিষ্টার, বিগত যৌবনা, যৌবনকালেও উনি খুব সুন্দরী ছিলেন না তবে লাবন্যতা ছিল। তাই তখনকার অনেক কাহিনী এখনও নানা মহলে আলোচিত হয়। মন্ত্রীমহোদয়দের কারও সাথে এক সময় মজে বর্তমান পুরস্কার পেয়েছেন। এখনও খুব না হলেও আগের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডটা ভুলে যেতে পারেন না। তখনই ওনাকে সীটে পাওয়া যাবে না। প্রায় সব সময়ই বসে থাকেন পৌঢ় অফিসার মিঃ বোসের কামরায় একেবারে মুখোমুখি, অবশ্য জনবার্ত্তা বা টাউনম্যান বা অন্য কোন খবরের কাগজ খোলা থাকে সম্মুখে। ওদের দুজনকে জড়িয়ে অনেক কানাঘুষা বেশ মুখরোচক।

আর অফিস কাচারিগুলোও দিনকে দিন হয়ে যাচ্ছে যাকে বলে "যোগা-যোগের অফিস" বা "প্রজাপতির অফিস"। গত পাঁচ বছরে আমার জানামতেই এই সহরের নানা অফিসে এমন যোগাযোগের সূত্র ধরে প্রণয় ও অনুরাগের রূপ নিয়ে অন্ততঃ পক্ষে জনা পঞ্চাশেক মেয়ে কেরানী উৎরে গেছে। জনা দশেক আমাদের এই অফিসেই। 'পাত্র চাই' বিজ্ঞাপন দিয়ে যেসব কুমারী মেয়ের অভিভাবকরা পাত্রের খোঁজে হিমসিম্ খাচ্ছিলেন শেষে তাক্ত বিরক্ত হয়ে বসে থাকার চেয়ে চাকুরি করুক এই মনোভাব নিয়ে মেয়েদের চাকুরিতে ঢুকিয়েছিলেন সেই মেয়েরা উপার্জন-ক্ষমা হয়ে নিজেরাই নিজেদের অনুরাগের পুরুষ খোঁজে নিয়ে সংসার পেতেছে। তেমনি অনেক পৌঢ়-যুবকও যারা একার আয়ে চলে না বলে গড়িমসি কচ্ছিল বিবাহে ভয় পাচ্ছিল তারাও উপার্জন-ক্ষমা পাত্রী পেয়ে প্রথম সুযোগেই কালক্ষেপ না করে ঝুলে পড়েছে।

এছাড়াও তলে তলে পছন্দের নায়ক নায়িকাও কম নয়। মিঃ বোস মিস মল্লিক অনেকে আছে। কেবল অনুষ্ঠানটা বাকী। আরও কত ফুস্‌লাফুসলি চলছে কে জানে!"

হঠাৎ চায়ের দোকানের সম্মুখে প্রচণ্ড রোল উঠতেই নবকুমারও নন্দলাল চায়ের দোকানের দিকে দৃষ্টি ফেরায় একটা পাগল চায়ের দোকানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কা কে যেন গালিগালাজ করেই চলেছে মাঝে মধ্যে মুখ খিঁচিয়ে উঠছে। নবকুমার চেনে এই পাগলকে। লোকটা পাগল ছিলনা পাগল করে দিয়েছে কোন এক সহকর্মী বৌকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে। বিচারের জন্য অনেক বড় বড় অফিসারের কাছে ধর্ণা দিয়ে শুধু পরামর্শ পেয়েছে 'মামলা কর'। গরীব বেচারা প্রভাস, কি করে মামলা করবে। তাই সে অফিসারদের উপর খাপ্‌পা। মামলা করে জিতলেও কি আর তেমন তরতাজা পাবে স্ত্রীকে।

একটা জীপ ধূলো উড়িয়ে ডানপাশের রাস্তা দিয়ে চলে গেল। কোন অফিসার ছিল নিশ্চয়। আর যায় কোথায়! প্রভাস চীৎকার দিয়ে বলছে "বেটা অফিসার হয়েছে! জীপ দৌড়য়! সব শালা"—ভাওতাবাজ—হাইকোর্ট দেখায়।"—শালা অফিসার না অবিচার!"

চায়ের দোকানে কেরানী বাবুরা টিপ্পনি দিয়ে ঠ্যাস্ দিয়ে প্রভাসকে খেপিয়ে দিচ্ছে। তারা মজা দেখতে চায়। মজা পায়।

লক্ষ্য করে নবকুমার বলে, "ওদের মজা ত লাগবেই। অফিসারদের সামনে এলে কাচুমাচু তাই ঐ পাগলকে খেপিয়ে দিয়ে মনের ঝাল মেটাতে চায়। শেষে আরাম পেয়ে নিজ নিজ চেয়ারে বসে কাগজ পত্তর নাড়া চাড়ার তালে তালে অফিসারদের বা প্রশাসনের শ্রাদ্ধ করবে। এটাকেই বলা হয় ওয়ার্ক কালচার।

নন্দলাল ঘড়ি দেখে নেয়। বেলা সাড়ে এগারটা, নবকুমার—"ঘড়ি দেখে কি বলবেন অনুমান করতে পারি। এই ত গেল সকাল বেলার কাজের তোড়-জোর, আবার সাড়ে বারটার পর থেকে শুরু হবে টিফিন আওয়ারের তোড়জোড়।

টিফিন আওয়ার টানতে টানতে প্রায় নিয়ে এসেছে তিনটে পর্যন্ত। যারা বাড়ী যেতে পারে না অনেক দুরে বলে তারা বসে বসে ঝিমোয়। তিনটের পর থেকেই বলতে গেলে ব্যস্ততা সুরু হয়। প্রায় অফিসাররাই লাঞ্চের পরে প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ অফিসে ফেরেন। তখনই যতসব জরুরী কাগজ অফিসারদের টেবিলে টেবিলে এসে যাবে। ওভারটাইম কি করে পেতে হয় কেরাণীকুল জানে। এমন ভাবে বলবে, "কালই যদি উত্তর পাঠাতে হয় তবে ওভারটাইম না খাটালে চলবে না স্যার।"

নন্দলাল—সারাদিন এটা সেটা করে কাটাল, বলতে গেলে ফাঁকিই দিল, আর শেষ বেলায় কিনা ওভারটাইম আদায়ের জন্য ফিকির ফন্দি!

নবকুমার—ওভারটাইম না দিলে কাজ হয় না। কেরাণীরাও জানে কি করে লিভিং ওযেজ আদায় করতে হয়। আর বড় কর্তারাও বলেন, "দিন কাল যা, বেতন যা পায়, তাতে কি অল্পবেতনের এই ক্লার্কদের চলে?" মানে ওরাও সহানুভূতিশীল। তাই ওভারটাইমের এ ব্যবস্থা। ওয়েষ্টেজ আর কাকে বলে। এই ওয়েষ্টেজ বন্ধ করতে গেলেই শুরু হবে চারিদিক থেকে চিল্লাচিল্লি।

নন্দলাল এতক্ষণ নবকুমারের সাথে আলাপ করে তার পরিবেশ দেখে বুঝতে পারে নবকুমার সীনিক হয়ে পড়েছে, তাই সে প্রশ্ন করে, "এমন পরিবেশে আপনি কেমন করে চাকুরি করে যাচ্ছেন? কেন এলেন এমন চাকুরীতে?"

নবকুমার—চাকুরি কেন করতে এলাম এমন প্রশ্ন অনেকেই করে। কিন্তু কি করব বলুন? কি সুযোগ আছে যে নিজে স্বাধীনভাবে কিছু করব। বেকারত্বের বিদগ্ধ জীবনযাত্রার রসকষ তো জানি। অনেক দিন বেকার ছিলাম। চাকুরি পেয়ে আর

যাই হউক মাসকাবারে তো বেতনটা মোটামুটি ঠিক পেয়ে থাকি।

নন্দলাল—কিন্তু আপনি ত এখনও তরুণ, এ বয়স থেকেই যদি নিজের সত্ত্বা, উৎসাহ এভাবে নষ্ট করেন……

নথকুমার বাধা দিয়ে বলে, "রাখুন আপনার ব্যক্তি সত্ত্বা! অনেককাল বেকার ছিলাম, কেউ ফিরেও তাকায় নি। কত দরখাস্ত দিয়েছি, কত জনের কাছে ধর্ণা দিয়েছি শেষে বিরক্ত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে এখানে সেখানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতাম। একটা ছোট খাট দৈনিক কাগজে কর্মকর্ত্তাদের অনেক গাফিলতির বিরুদ্ধে জোড় কলমে লেখালেখি শুরু করে দিলাম। অনেক রাজকর্ম্মচারীর গোপন কীর্তিকলাপও ফলাও করে লিখতাম। এই লিখতাম বলেই কর্ম্মকর্ত্তাদের দৃষ্টি পড়ল। তখনই একমাত্র ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলাম। আমাদের বড় সাহেব ঐ বিশ্বজীৎ রাজগুরু গোপনে ডেকে মিষ্টি মধুর ভাষায় চাকুরির অফার দিলেন। বেকার জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় আমারও ততদিনে বাস্তব বুদ্ধি খুলেছে তাই অফারটা আর রিজেক্ট করিনি। তাই চাকুরি হলো।"

সেই থেকে সরকারী অফিসের এসব নানা গলদ দেখেও দেখি না। সরকারী চাকুরীয়া হিসেবে এসব শুধু টেবিল-টক্ হিসেবে কপচাই। রাজগুরু সাহেব আমাকে সরকারী চাকুরিতে টেনে এনে আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। কলম থামিয়ে দিয়েছেন। ওনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

এখন ভাবতে শুরু করেছি এই এনভায়রণমেন্ট বা সারাউণ্ডিং-এ সাড়ে নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত যে বসে থাকি সেই ধৈর্য্যের বিনিময়েই আমি আমার মাসিক বেতন পাই। এই পরিবেশের আবেষ্টনিকে ঘিরেই আমার জীবন, এই জীবনকে ঘিরেই আমার কেরিয়ার। এই পরিবেশকে ছেড়ে আমি যাবই বা কোথায়? করবই বা কি? ক্ষমতা-ই বা কতটুকু? যতদিন না অন্য কিছু স্বাধীনভাবে করতে পারি এভাবেই জীবন যাত্রা চালিয়ে যেতে হবে।

একদিন নয় দুইদিন নয়। আজ প্রায় পাঁচ বছর এই পরিস্থিতিতে কাজ করে যাচ্ছি। এতদিনে এই চাকুরীর প্রতি একটা মায়াও হয়ে গেছে। বেতন ত ঠিক্ ঠিক্ পাচ্ছি!

এতদিনে বুঝে নিয়েছি এখানে ঠিক সময় হাজিরা না দিলেও যথা নিয়মে কাজ না করলেও আমার চাকুরি সহজে যাবে না। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে এমন ফাঁকি দিচ্ছেন কেন মশায়? উত্তরে ঐ মিঃ দাসের ঢঙেই বলব, "আরে মশায়, সরকারের কাছে— কি বিচার আছে। যোগ্য অযোগ্য এখানে সমান, এখানে যোগ্যতার যেমন পুরস্কার নেই, ফাঁকিরও তেমনি তিরস্কার নেই। সরকার যা বেতন দিচ্ছে— আমার যোগ্যতার তুলনায় কিছুই নয়, অতএব হেলায়-ফেলায় যা করছি তাই যথেষ্ট। গভর্ণমেণ্ট সুড্ বি গ্রেটফুল টু মি।"

নবকুমারের সব কথা শুনে নন্দলালের ধারণা হয় সরকারী অফিসের পরিবেশই কর্ম্মচারীকে দায়িত্ব বহন করতে শেখায় না। শেখায় দায়িত্ব পরিহার করতে। এরফলে একদিকে যেমন জনসাধারণের মনে সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতি বিরূপ ভাব জন্মেছে অপর দিকে সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যেই প্রশাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের দানা বাঁধতে শুরু হয়েছে। এই কর্ম্মচারীদের আশা-আকাঙ্খা ও চিন্তা-ধারার সঙ্গে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বা নেতাদের মানসিক বা হৃদয় গত ঐক্য নেই। এক পক্ষ প্রশাসন যন্ত্রের দুর্বল অংশ, অপর পক্ষ কেতাদুরস্ত। এই যদি চলতে থাকে কোন অবস্থায়-ই প্রশাসন ব্যবস্থাতে জনকল্যাণের আদর্শ প্রতিফলিত হতে পারে না। এর প্রতিকার কি?

নন্দলাল মন্তব্য দেয়, "এই বুঝি আপনাদের পরিবেশ! কাজ না করলেও চাকুরি যাবার ভয় কি নেই?"

নবকুমার চট্‌পট্ বলে, "সরকারী অফিসের পাকা চাকুরি সহজে যায় না। নিতান্ত চুরি ডাকাতি করে জেল না খাটলে সরকারী চাকুরী যায় না, তাই তো দেখছি! যাওয়ার হলে অনেকেরই এতদিনে যেত। এই অফিসে এত জন কেরাণী বা অফিসারের প্রয়োজনই নেই কিন্তু তা বলে চাকুরি তো যাচ্ছে না। বরং যে রিটায়ার করবে তার রি-এম্‌প্লয়মেণ্ট বা একস্‌টেন্‌শন হয়ে যাচ্ছে।"

নন্দলাল হৃদয়ঙ্গম করে এই যায় না বলেই হয়ত সরকারী কর্মচারীদের ভিতরে এই কর্ম বিমুখতা। তারা বুঝে নিয়েছে কাজ না করলেও চাকুরি ঠিকই থাকবে, নিয়মিত ইন্‌ক্রিমেন্ট পাবে, কেউ আটকাবে না। সুতরাং অকারণে খেটে লাভ কি ?

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন ধূতি-পাঞ্জাবী পড়া মাঝারী বয়সের এক কর্মচারী, হাতে কি একটা টেলিগ্রাম।

ভদ্রলোক কিছু বলতে যাবার আগেই নবকুমার জানতে চায় "কি খবর নিয়ে এলেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু ?"

"একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এলাম স্যার," এই বলে সুপারিনটেন্‌ডেন্ট টেলিগ্রামটি নবকুমারকে দেখাল।

টেলিগ্রামটির উপর চোখ বুলিয়েই ছানাবড়া করে বলে, "কি আশ্চর্য্য ! এই সেই দিন সুস্থ সবল মানুষটি গেলেন, আর পৌছেই মারা গেলেন।" বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য্য দেখছি।" বলেই নন্দলালের পানে তাকিয়ে বলে, "আমাদের বস্ মিঃ দাসের কথা যে বলছিলাম, উনি ট্রেনিং সেণ্টারেই হঠাৎ স্ট্রোকে মারা গেছেন। এই তো টেলিগ্রাম।"

কথার মাঝখানে মিঃ সান্যাল ফিরে এলেন, "মারা গেছেন" কথাটা কানে যেতেই "কে, কে মারা গেছেন" বলেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন টেলিগ্রামটির উপর, চোখ বুলিয়ে তারপর বিশ্বাস করলেন।

অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট টেলিগ্রামটি নিয়ে যেতে যেতে বলে গেলেন, "দাস সাহেবের মৃত্যুর দরুণ আজ বেলা একটার পর থেকে অফিস ছুটি স্যার। রাজগুরু সাহেবের পি, এ, টেলিফোন করে জানাল স্যার।"

অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চলে গেলে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ। মিঃ সান্যালই নীরবতা ভঙ্গ করলেন, "দেখবেন মিঃ মুন্সী এবার আমাদের নিয়োগীর কপাল খুলে গেল, সেই এবার টেক্কা মেরে আমাদের উপর বস্ হয়ে বসবে। নিয়োগীকেও শেষে "স্যার" "স্যার" করতে হবে ! একজন মরল। আর একজন ফেঁপে যাবার সুযোগ পেল। সেই কথায় বলে না কারও সর্বনাশ কারও পৌষমাস।"

নবকুমার বলে, "আমার আপনার কি মশায়! আপনি তো হচ্ছেন না, আমার সেই চান্সই নেই। যান নিয়োগীকে খুঁজে আগাম কনগ্রেচুলেশনটা জানিয়ে দিন।"

নন্দলাল মনে মনে আশ্চর্য্য হয়। তার মন্তব্য দিতে ইচ্ছা করল, "আপনারা তো আচ্ছা লোক মশায়! একজন অফিসার মারা গেলেন, তার মৃত্যু সংবাদে কোথায় একটু "আহা" "উহু" করে শোক প্রকাশ করবেন তা নয়, কে তার জায়গা দখল করছে সেই নিয়ে স্পেকুলেশন সুরু করে দিলেন! এ তো এক ধরণের নিম্ন রুচির পরিচায়ক।"

নন্দলালের ভাবান্তর লক্ষ্য করে নবকুমার বলল, "আপনার শুনতে হয়ত একটু বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে, কিন্তু ঘটনা হলো এমন হঠাৎ পাওয়া ছুটির কারণে একটু শহরটা ঘুরলেই দেখতে পাবেন, অফিসের অনেকেই সপরিবারে অথবা একলা সিনেমা বা থিয়েটার দেখতে ছুটেছে, ওখানে টিকিট না পেলে যাত্রা কিংবা অন্য কোন বিনোদন অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছে, একান্ত তেমন সুযোগ যদি কারও ভাগ্যে না জোটে তাহলে নিশ্চিন্তে দিবা নিদ্রা। আরও অবাক হবেন যে সব অফিসে টেলিফোনে খবরটা জানান হলো তারাই শুধু এই হঠাৎ ছুটিটা পেল, আর যেসব অফিস জানতেও পারল না এমন একটা মৃত্যুর সংবাদ সে সব অফিসের কর্মচারীদের বড় অংশের আক্ষেপ বা অভিযোগ, কেন তারা বঞ্চিত হলো এমন একটা হাফ্-ডে ছুটির মজা থেকে"

নন্দলালের উক্তি হলো, "এমন প্রবৃত্তি তো ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়েরই প্রতি-ধ্বনি, এমন হঠাৎ ছুটির উদ্দেশ্য হলো মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা পালন। অথচ শ্রদ্ধাপালন তো দুরের কথা, এক মিনিট নীরবতাও পালিত হলো না, তাহলে অমন ছুটি ঘোষনার অর্থ কি ?"

একটু অন্য রকম শোনাল নবকুমারের বক্তব্য, "অর্থ তো হয়-ই না। এই বিশাল দেশে কত শত সহস্র গণ্য মান্য নেতা আছেন বর্তমান এবং প্রাক্তন, প্রত্যেকের মৃত্যুতে এমন হঠাৎ ছুটি ঘোষণার রেওয়াজ চিরচলমান রীতি, এই রীতি যদি অব্যাহত থাকে তা হলো তো হয়েছে—এমনিতেই অফিসে যথাযথ কাজ হয় না, যতটুকু হতো তাও নষ্ট করে দেওয়া হলো। হঠাৎ অফিস ছুটি দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এই পদ্ধতিটাই সম্পূর্ণ অবাস্তর-ওয়ার্ক-কালচারের পরিপন্থী। ওয়ার্ক কালচার যদি প্রকৃত অর্থে পুনঃজীবিত করার উদ্দেশ্য হয় তাহলে সারা বছরের ঘোষিত ছুটির বেঁধে দেওয়া সংখ্যাতে যাতে হের ফের না হয় সেটাই কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত।"

নবকুমারের কথাগুলো অন্যরকম শোনালেও প্রণিধান যোগ্য। নন্দলাল জানতে চায় "এসব নিয়ে কর্তাদের সঙ্গে আপনাদের আলোচনা হয় না ?"

"হ[illegible] না [illegible] টেবিল টক্ পর্যায়ে। আমি [illegible] উত্থাপন করতে গেছি [illegible], [illegible] না, [illegible]লেও 'নো-কমেণ্ট' ভঙ্গীতে শুনে যান অর্থাৎ এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর [illegible] গেছে। তো [illegible] সেই" বলেই নবকুমার প্রসঙ্গটার ইতি টানতে, "আপনি তো ইনভেস্টিগেটিং জার্নালিষ্ট, আপনিই লিখুন না এই যে আমরা আসি যাই মাইনে পাই, এর উপরে একটা নিবন্ধ, আজকের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে"

বলা শেষ হতেই নবকুমার ঘড়ি দেখল। এখন সময় প্রায় তিনটা, দেখেই নন্দলালকে বলল—"আর খালি অফিসে বসে থেকে কি হবে উঠুন আমরাও এখন চলি।" ☐

নাম সুনাম দুর্নাম

"আমি যে ঘুষ খাই বা খেয়ে যে এত বড়টি হয়েছি এটা সবাই ভাবে এবং বলে।"

"আমি বিশ্বাস করিনা, তোকে তো আগেও জানতাম এখন আরও জেনেছি, অসম্ভব।"

"তুই বিশ্বাস না করতে পারিস, কিন্তু এত যে রটে তার কিছু তো সত্য বটে।" তুই "অসম্ভব" বলতে পারিস কিন্তু আমার আত্মীয় পরিজনরাই "অসম্ভব" ভাবেন না. তারা ভাবেন আমার অনেক টাকা। কোথা থেকে আসে? তাই তো বলছি আমিও ঘুষ-খোর। ছোটবেলায় পড়িস নি "আপনাকে বলে যে বড় সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।" সুতরাং আমি বললে হলো নাকি, লোকে যে এত রটাচ্ছে. সে কি কিছু নয়! তাই তো বলছি আমার কিছু সুনাম সুখ্যাতি থাকলেও দুর্নামও কম নয়। নাম সুনামের সঙ্গে বদনামও অবিচ্ছেদ্য।"

"তোর কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"সেই তো কথা! বুঝতে হবে, জানতে হবে চারিদিক দেখে শুনে চলতে হবে। সত্যি বলতে কি এখন কেউ যদি সন্দেহ করে সরাসরি আমাকে প্রশ্ন করে "আপনার আলগা আয় কত?"—আমি রাগ করিনা, কারণ, আমি দেখেছি, রাগ করে কোন লাভ নেই। আত্মীয় স্বজনদের ধারণা কি. তার একটা নিদর্শন তোমাকে দেখাচ্ছি—বলেই শিরোমণি উঠে গিয়ে ভেতরের ঘরের ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ইনল্যাণ্ড-খামের চিঠি খুলে নন্দলালের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলেন, এইটি পড়, তাহলেই আঁচ করতে পারবে।"

নন্দলাল চিঠিটি পড়ে নেয়, পড়তে পড়তে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। চিঠিটি মুড়ে ফেরত দিতে দিতে বলে, "এই পত্র লেখক তোর কে?"

শিরোমণি জানান, "আমার দেশেরই লোক, একসময় ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন, বর্ত্তমানে অবসর প্রাপ্ত। বড় কষ্টে ছিলেন, ওনার বড় ছেলে অনেক চেষ্টার পর ম্যাট্রিক পাশ করে চাকুরির চেষ্টায় ঘুরছিল ; চাকুরি পায় না, শেষে আমি তদ্বির করে একটা জুটিয়ে দিয়েছিলাম, এটা তারই রিটার্ণ।

নন্দলাল মন্তব্য দেয়, "অকৃতজ্ঞ, উপকার করলে এই বুঝি প্রতিদান! কেমন লিখেছেন আবার দ্বিতীয় ছেলেটি কম্পার্টমেণ্টে ম্যাট্রিক পাশ করেছে, তার একটা উপায় করে দিতে হবে। আমলাদের কিছু টাকা দিতে হলে উনি টাকার ব্যবস্থা করে তোমার কাছে পাঠাবেন। তুমি এই চিঠি এস্‌-পি'র কাছে পাঠিয়ে দাও, লোকটা ভেবেছে কি! দুনিয়ার সব লোকই কি ঘুষখোর! সবাইকে একই মাপকাঠিতে বিচার করেন। চাব্‌কে সমান করে দেওয়া উচিত এ জাতীয় লোকদের।"

শিরোমণি সাহেব উত্তেজিত না হয়ে, হেসে বলেন, "আমি যদি নতুন চাকুরে হতাম, নিশ্চয় এমন কিছু করতাম বা এস্‌-পি'র কাছে পাঠিয়ে দিতাম, কিন্তু আমি এখন সিজনড্‌ অফিসার। আর যাই করিনা কেন, পুলিশের লোকেদের কাছে পাঠাচ্ছি না, ওদের কাছে পাঠালে কেস্‌-টা এমন করে সাজাবে, প্রমাণিত না হলেও তাতে সন্দেহ আরও দৃঢ় হবে। অনেকেই ভাববে এত বছরের চাকুরিজীবনে আমার রিকমেণ্ডেশনে বা তদ্বিরে যত জন চাকুরি পেয়েছে, বা সরকারী কোন না কোন সাহায্য পেয়েছে তাদের কাছ থেকে আমি কিছু খেয়েই তদ্বির বা রিকমেণ্ডেশন করেছি তার চেয়ে এই ভাল" বলেই চিঠিটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিতে দিতে বলেন, "এমন চিঠি তো আমি এই প্রথম পাই নি!"

নন্দলাল হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকে, শিরোমণি নন্দলালের হাব ভাব লক্ষ্য করে বলেন, "তুই ভাবছিস্‌, নিশ্চয় আমার কোন দুর্বলতা আছে, তা না হলে এমন ব্যাপার চেপে যাচ্ছি কেন ?

নন্দলাল বলে, "তুই যে কি বলিস্‌!"

শিরোমণি সাহেব একটা সিগেরেট ধরিয়ে নেন, ততক্ষণে চেহারায় গাম্ভীর্য্য এসে গেছে গম্ভীর ভাবেই বলেন, "এমন ভাবাটাই তো স্বাভাবিক, তোকে বুঝিয়ে বলার সাধ্য আমার নেই, তবু বলতে পারি সেই যুদ্ধের পর থেকেই শুরু। তারপরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই কয় বছরে আরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে, ঠিক আঙ্গুল দিয়ে দেখান যাবেনা, কিন্তু পরিবর্ত্তনের অনুভূতি সারা দেশময় মানুষের আচারে, নিষ্ঠায়, চালচলনে, ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায়, কাজেকর্ম্মে, পোষাকে, পূজো-পার্বনে, সামাজিকতায়, দাবী জানাতে, সরকারের ব্যবস্থাপনায়, রাজকর্ম্মচারীদের কার্য্য পরিচালনায়— অনেক পরিবর্ত্তন এসে গেছে। যারা এই স্রোতে ভেসে চলেছে তারা তো বটেই, বাকীরা দেখে শুনে, জেনে পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাপকাঠি এখন ভিন্নরূপ।"

"ব্যাক্তিগত ভাবে যত সৎ-সত্যবাদীই হও-না কেন, তারা যেমন তোমাকে বিশ্বাস করবে, তেমনি অবিশ্বাস করতে ও ছাড়বে না। তোমার সুখ্যাতিতে যেমন আহ্লাদিত হবে, তেমনি বদনাম শুনলেও ভাববে "হয়ত বা, ক্ষতি কি।" "দিন-কালের যা নিয়ম।" যে পক্ষে বলে তাকেও বিশ্বাস করে, যে বিপক্ষে বলে তাকেও সহ্য করে।"

"তাই তো বলি, চৌদ্দ দেবতার নাম নিয়ে যত চীৎকার দিয়েই বলি না কেন, "আমি ঘুষ খাই না" বিশ্বাস করে না, করতে চায় না, ভাব ভঙ্গিতে এমন প্রকাশ করে আমি কি আর কলিকালের ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির! শুধু শুধু দাদা-বৌদীদের কৌতুহলে আমি মনক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম।"

নন্দলাল জানতে চায় "দাদা-বৌদীদের সাথে আবার কি হয়েছিল ?"

"কিস্সু না। দিন কালের গতিতে অতি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু তখন সাংঘাতিক ভাবেই মনে বেজেছিল। তাই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম, "সিগেরেটে টান দিয়ে শিরোমণি সাহেব বলেন, "চাকুরি পাওয়ার পর থেকে প্রতিমাসে বেতনের অর্দ্ধেক টাকা দাদাদের কাছে পাঠিয়ে দিতাম, আর বাকী অর্দ্ধেক দিয়ে আমি এদিকে চলতাম, সুতরাং হাতে টাকা জমতেই পারতো না। নগদ টাকা থাকতই না।

সে কারণে অনেক বছর পরিবারের সবার সঙ্গে মিলতেও যেতে পারিনি। চিঠিপত্রেই যা সম্পর্ক, অবশ্য মাঝে মধ্যে দাদাদের রেফারেন্স নিয়ে কোন কাজে কেউ আমার কাছে এলে এটা সেটা করেও দিতাম, সেই কাজ।"

"ওরা নিজেদের চেষ্টায় অনেক ঘুরা ঘুরি হয়রাণির পরেও হলো না, আমার কাছে এলে প্রয়োজন মত টেলিফোন করে জীপে করে নিয়ে গিয়ে তাদের কাজ সেরে দিতাম। তারা আমার ক্ষমতা, পজিশন সম্বন্ধে নিশ্চয় সাংঘাতিক কিছু অনুমান করত। কি অনুমান করতো তারাই জানে। কিন্তু দেশে জানাজানি হয়ে গেল আমি একজন প্রকাণ্ড অফিসার। অনেক ক্ষমতা রাখি। তা না হলে যেটা তারা ছয়মাস ঘুরেও কিছু হদিস পেল না, শুধু টেলিফোনে একবার বলতেই যা জীপে করে তাদের নিয়ে যেতেই তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, নিশ্চয় আমি একজন বড় কেউ কেটা।"

"দেশের লোকেরা ফিরে গিয়ে আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করত। দাদাদের চিঠি পত্তর পেয়ে বুঝতাম আমার অনেক কিছু সুনাম সুখ্যাতি শুনে শুনে তারা আহ্লাদিত, গর্বিত,—"আমাদের ভাই যে সে লোক নয়"—নাম যশ ক্ষমতার অধিকারী।"

"আমিও মনে মনে উৎফুল্লিত। তোমাদের ভাই একেবারে ফেলনা নয়।'

প্রায়ই দাদারা লেখেন, "তোকে অনেকদিন দেখিনা তোকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে, একবার ছুটি নিয়ে কিছুদিনের জন্যে ঘুরে যা না।"

বৌদীরা লেখে, "আমাদের কথা কি মনে পড়ে না ঠাকুর পো? তুমি এলে বেশ হৈ চৈ করা যেত, এস না একবার।"

সত্যি দাদাদের সাথে কতদিন দেখা নেই, বৌদীদের সাথে কত ইয়ার্কী যুগ ঠাট্টা করি না। যাদের ছোট দেখে এসেছি, তারা জানি কত বড়টি হয়েছে! মনটা নরম হয়ে গেছে তাই স্থির করলাম পূজোর সময় এফিক্স-প্রিফিক্স করে একবার ঘুরেই আসি।

হাওলাৎ-বরাত করে, বাকী বন্ধুরা কিছু ফেলে কলকাতায় গেলাম, ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম না দিয়েই গেলাম। অনেক দিন পরে পরিবারের সবার সাথে মিলতে যাচ্ছি। হাতে কিছু টাকা থাকা ভাল। গেলে পরে সবাইকে কিছু না কিছু দিতে তো হবে!

পূজোর দিন কয়েক আগেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। মনে খুব ফুর্তি, সবাই আমাকে পেয়ে খুশী, আমি সবার মাঝে গিয়ে খুশী।

খুব কেনা কাটা করলাম। সবাইকে দিতে পেরে, দিয়ে মন খুব প্রফুল্ল। পরিবর্তে আমার আদর যত্নও খুব বেড়ে গেল। ছোটরা নানা জিনিষ পেয়ে খুব লম্ফ ঝম্প করছে। আমাকে 'মিষ্টি' বলে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। বেশ কেটে গেল দিন কয়। যা কিছু টাকা পয়সা নিয়ে গিয়েছিলাম প্রায় শেষ। ভেবে রেখেছি, ফিরবার সময় প্রয়োজন হলে দাদাদের কাছ থেকে চেয়ে নেব। ফিরে গিয়ে ফেরৎ দিলেই হবে।

কলকাতায় গেলে আমি স্থির থাকতে পারি না। যা দেখি তাই কিনতে ইচ্ছা করে। ফুটপাতের উপর কত রকমারি দোকান! কত সস্তা! ইচ্ছে হয় অনেক কিছু কিনে নেই। যে কলম এখানে তিন টাকা চার টাকা কলকাতায় সেগুলো মেট্রোর সম্মুখে টাকায় টাকায় বিক্রী হচ্ছে। সাড়ে ছয় আনায়, সাড়ে ছয় আনায় কত জিনিষ! ত্রিশটি কলমই কিনে ফেললাম নিজে ব্যবহার করব, দুই দশজন বন্ধুবান্ধবকে উপহার দেব। তাতে রিলেশনসীপ ভাল থাকবে।

এমনি করে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় অনেক জিনিষ কিনে ফেললাম। রোজই নিত্য নতুন জিনিষ কিনে বাসায় ফিরতাম। যা নিয়ে বাসা থেকে বেরোতাম রাত্তিরে ফিরে পকেটে হাত দিয়ে দেখতাম মাত্র কয়েকটি খুচরো পয়সা।

সে যা হউক যে কয়দিন আমি ছিলাম বৌদীদের ছোটদের সে কী আনন্দ তাদের সবাইকে নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে, সিনেমা দেখে, পিক্‌নিক্ করে, ট্যাক্সি চড়ে, রেষ্টোরেন্টে খেয়ে বেশ কয়টা দিন কেটে গেল।

বড়দের আদর যত্নের বহরও খুব, বেশ লাগছিল। অফিসের একঘেয়েমি কাজ থেকে অনেকদিন পরে গিয়ে সত্যি মনে হচ্ছিল আমি যেন চেঞ্জে গেছি।

ছুটি সর্ব সাকুল্যে পনর দিন। দিন দশেক যেন হু, হু করে কেটে গেল।

এরই মধ্যে একদিন আমরা সবাই সকালের দিকে চা খাচ্ছি। নানা কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেই চায়ের আসরে। এক আলোচনা থেকে অন্য আলোচনা। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সমষ্টিগত, ব্যাক্তিগত নানা কথা, নানা আলোচনা।

আমরা ভাইরা সবাই ভেরি নাচ্ ফ্রেণ্ডলি। তাই আমাদের আলাপ জমেও বেশ।

এইভাবে আলাপের মোড় ফিরতে ফিরতে হঠাৎ সেজদা জানতে চাইলেন, "কত জমিয়েছিস ?"

উত্তর দেই, "কি করে জমবে ? বেতন যা পাই সব খরচ হয়ে যায়।"

সেজদা পুনঃ প্রশ্ন করেন, "এত টাকা করিস কি ?"

উত্তরে বলি, "এত টাকা কোথায় ! বেতনের অর্দ্ধেক তো তোমাদের পাঠাই বাকী, অর্দ্ধেক দিয়ে আমার ওখানকার খরচ চলে।"

সেজদা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলেন, "কিছু যদি না জমাস্ তবে বিপদে আপদে কি উপায় হবে ? বলা ত যায় না।"

আমি বলি, "বিপদ আবার কি ? তোমরাই তো আছ। তেমন কিছু হলে কি তোমরা আমাকে দেখবে না ?"

তারপর একটু থেমে বলি, "জমানোর কথা যে বললে, তা অবশ্য পারি কিন্তু তা হলে তো তোমাদের বিশেষ কিছু পাঠাতে পারব না।"

সেজদা চট্ করে বলেন, "কেন ? আলগা কিছু পাস্ না ? ঘুষ কিছু খাস্ না ?

অমন কথায় বেশ হক্‌চাকিয়ে গেলাম। এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বলেন কি সেজদা ? আমি না ওনার ছোট ভাই ! আমার স্বভাব চরিত্র সবই তো ওনার জানা। তা সত্ত্বেও উনি এমন অনুমান করতে পারেন ? ছিঃ ছিঃ করে উঠল মনটা।

ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখি সবাই উদ্‌গ্রীব। আমার আল্‌গা আয় কত সবাই যেন জানতে চায়।

বৌদীরা আর একদফা চা তৈরিতে ব্যস্ত। কিন্তু কান তাদের খাড়া।

বড়বৌদীর কোলের ছেলেটি হঠাৎ কেঁদে উঠেছে, তার মুখে হাত চাপা দিয়ে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন আমার উত্তর শুনতে।

বড়দা খুব যেন মন দিয়ে ইলাস্ট্রেটেড্ উইকলিটি দেখছেন। এমন ভাব।

ছোড়দার উপর আমার অনেক বলভরসা। অন্যায় কথা উনি কোন দিনই শুনতে পারেন না, জানতাম। নিশ্চয় উনি আপত্তি করবেন। কিন্তু ছোড়দার হঠাৎ তক্ষণি নখ্ কামড়াবার প্রয়োজন হয়ে গেল। ঠিক তক্ষণি না কাটলেই নয়! ভাবটা শোনাই যাক না মণির আল্‌গা আয় কত। ওনার সেই অদ্ভুত নিষ্ক্রিয় রূপটা কেমন যেন তাৎপর্য পূর্ণ।

বৌদীরা সবাই মুখরোচক উত্তরের আশায় আছে। ঠিক সেই সময় মেজ ভাইপো কাজল এসে আব্দারের সুরে বলল। "মা ক্ষিদে পেয়েছে।"

যেই বলা, অমনি বড় বৌদী মুখ খিঁচিয়ে বলে ওঠেন, "তোদের আর পেট ভরবে না, একটু নিশ্চিন্তে বসে দুটো কথা শুনব। সে উপায়টি নেই। কেবল খাম্ খাম্।"

আমি এক নজরে সব লক্ষ্য করলাম। সবার মুখে চোখে সে কি কৌতুহল! ওরা ধরেই রেখেছে আমি আলগা পাই। কেবল জানতে চায়, "অঙ্কটি কত?"

এমন অবস্থায় যদি উত্তর দেই। আমার আলগা আয় নেই, আমি ঘুষ খাই না। উপরি আয় করি না বুদ্ধি আর বিবেকই আমার সম্বল। ওরা কি বিশ্বাস করবে? আমি নিজেই তো নিজের "স্যালারি" দিয়েছি। বেতন পেয়েই অর্দ্ধেক পাঠিয়ে দেই, সে অঙ্কটি ও তো কম নয়! চাকুরি স্থলে বাকী বকেয়া করে হাওলাৎ করে, ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম ইত্যাদী না দিয়ে এখানে এসে

হাত-উজার করে খুব দিলদরিয়া মেজাজে খরচ করে যাচ্ছি, এসব স্বভাবতই প্রশ্ন এসে যায়, "কত আমি আয় করি?" কত আমার বেতন? কত আমার আলগা।

এর আগে একদিন আমার ভাইঝি ডলিকে নিয়ে দোকানে কেনা কাটা করে, সিনেমায় গেলাম, সিনেমার শেষে ভাল একটা রেঁস্তোরায় এসে দুজনে বসলাম। ক্ষিদে পেয়েছিল চপ কাটলেট, চা খাচ্ছি, হঠাৎ কি ভেবে প্রশ্ন করল ডলি, "আচ্ছা, মিষ্টি, তুমি কত বেতন পাও?"

আমি হেসে পাল্টা বলেছি, "তুই না খুব বড়াই করে বলিস্ তোর কোন মেয়েলি কৌতুহল নেই! এটা কি মেয়েলি কৌতুহল নয়!"

ডলি চুপ হয়ে যায়। আর জানতে চায়নি।

সেদিন ভেবেছিলাম ওটা শুধু মেয়েলি কৌতুহল, এখন বুঝতে পারি বাড়ীর সবার মধ্যে একটা চাপা জল্পনা কল্পনা অনেকদিন থেকেই আছে,—

আমার বেতন কত?

আমার আলগা কত?

ঘুষে পরিমাণ কত?

আমার দাদারা কেউ অশিক্ষিত নন। কেউ এম, এ, কেউ এম, এস্ সি, কেউ ডি, ফিল। আমি যে চাকুরি করি তার স্কেইল কত, গ্রেড্ কি, তাও তাদের জানা। এত দিনে সেই স্কেল অনুসারে আমার বেতন কত হওয়া উচিত, একটু হিসেব করলেই বের করতে পারেন। কিন্তু তারা উপরি আয়ের হিসেব চায়।

আমি এত টাকা পাঠাবার পরেও এত যে চোখের উপর খরচ করে যাচ্ছি, নিশ্চয় উপরি কিছু আয় না করলে সাধারণ ভাবে সম্ভব নয়। সুতরাং তাদের এই কৌতুহল অতি স্বাভাবিক।

সেজদার প্রশ্নের উত্তরে যদি বলি, আমার ওসব ঘুষ-ঘাষ, আলগা-টালগা ধাতে সয়না তবে ওরা হয় হতাশ হবে, না হয় বিশ্বাস করবে না, অথবা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি থাকবে ঃ—

"কি জানি, তোর আয় তুই-ই জানিস্ বেশ না বলতে চাস তো বলিস না। তোর আয় ভাল হলেই হলো। তুই ভাল আছিস্ এটা জানলেই আমাদের যথেষ্ট।"

ছোট বৌদী চা দিতে এসে এমনভাবে চেয়ে গেল যেন বলতে চায়। "ঠাকুর-পোটা যেন কি! কত টাকা পাও এটা বলে দিলে কি হয়! আমরা কি তোমার টাকা কেড়ে নিচ্ছি. না নিতে যাব! যে কাড়াকাড়ি করবে সে ঠিক সময়ই তোমার কপালে এসে জুটবে, আমরা তোমার কে?"

আমি ওদের এই কৌতুহলে ভ্যাবচ্যাকা খেয়ে বসে আছি। ভাবছি কি উত্তর দেব। মনে মনে রেগে গেছি। এতদিন বাদে এলাম। এমনি করে তারা আমাকে আক্রমণ করবে জানলে আসতামই না। এমন হবে কল্পনাই করিনি।

ঠাস্ ঠাস্ কতগুলো কথা বলে দেব নাকি? মনে মনে শানিয়ে নিচ্ছিলাম কি বলব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব কথা নিজের খাপেই পুরে রাখতে হলো। ভাবলাম না ঝগড়া নয়, বিবাদ নয়, মন কষাকষি নয়, চেপে থাকাই ভাল। সবার সাথে ঝগড়া করব নাকি? রাগ করব নাকি সবার উপরে?

সুতরাং মনের আড়ষ্টতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুখে হাসির ভাব এনে সেজদা থেকে শুরু করে সবার পানে চকিতে দৃষ্টি বুলিয়ে স্পষ্ট জবাব দেই ঃ— "তোমরা যেন কি! গোপন আয়ের এমন প্রশ্ন কেউ কি কাউকে করে?"

বাস্। আর কিছুর প্রয়োজন নেই। সেজদা চট্‌পট্ বলেন, না না, আমি বলছিলাম কি, তোদের মত কত অফিসার এদিকটায় কত কি করছে। কেউ বাড়ী করেছে কেউ গাড়ী করেছে, কেউ ছেলে বিদেশে পাঠিয়েছে, আবার কেউ ভাল খরচ করে ভাল ঘরে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে। বাকীরা সবাই ভাল খায়, থাকে, চলা ফেরা করে তুই তো একটা বাড়ী করতে পারিস্।' বিয়ে করে বৌকে রাখবি কোথায়?

মেজ বৌদী সেজদার কথা শুনে সাথে সাথে বলেন, "না, না, ঠাকুরপো বাড়ী নয়। বাড়ী পরে হবে। আগে একটা গাড়ী কেন। বাসে-ট্রামে করে সিনেমা আর দেখতে যেতে ইচ্ছে করে না। গাড়ী হলে একদম রমারম সিনেমা হাউসে। কি বলিস্ সেজ ?"

সেজ বৌদী বলেন, "এমন ঠাকুর-পো থাকতে কেনই বা আমরা ট্রামে বাসে চড়ব ? বাসে ট্রামে ধাক্কা ধাক্কি করে যাব ? এমন চাকুরে ঠাকুর-পো আমাদের লজ্জা করে না ! ঠিকই বলেছিস মেজদি।"

ছোট-বৌদী শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, অনেক উপন্যাস পড়েছে, এখনও পড়ে, বেশীর ভাগই ডিটেক্টিভ। চট্ পট্ বলে। "না, না গাড়ী এখন নয় ঠাকুর পো। এখন গাড়ী কিনলে লোকে নানা কথা বলবে, আগে তো বিয়েটা হয়ে যাক্ ; তারপর গাড়ী কেন। তখন কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তবে নিশ্চিন্তে বলা যাবে, "শ্বশুড়ে দিয়েছে।"

এত কথা শুনে আমি ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে মরছি, কিন্তু প্রকাশ করতে পারছি না। সবার সাথে তো আর ঝগড়া করা যায় না ! পরিবেশটা ও তো অমন নয়। অথচ কথার মোড় ফেরাতেও পারছি না।

ছোড়দা একটু সাহায্য করতে পারতেন, কিন্তু ছোড়দাটা একেবারে চুপ, নখ্ দাঁত দিয়ে কাটতে কাটতে সব কথা বেশ নির্বিকার হয়ে শুনে যাচ্ছে।

ডলিটা কৈ ? সে নিশ্চয় বুদ্ধি খাটিয়ে আলোচনার মোড়টা ফিরিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সঙ্কটকালে সেও কাজলের হাত ধরে টানতে টানতে বলে, "চল, কাজল তোকে খাবার দেই গে, সঙ্কটকালে সেও সরে গেল।

কি আর করি ! বাঁকা হাসি হেঁসে বৌদীদের আশ্বস্ত করে বলি। "তোমরা একটু ধৈর্য্য ধর, অন্তত কয়েকটা বছর, দেখবে, গাড়ী-বাড়ী সবই হবে। ওগুলো হতে ভাগ্য চাই। ভাগ্যে থাকলে নিশ্চয় হবে।"

আমার কথা শেষ হতেই বড় বৌদীর গলা শোনা গেল ছোট বৌদীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "মনি ঠাকুরপোকে আর এক পেয়ালা চা দাও, এ পটের চা খুব ভাল হয়েছে।"

কে আগে চা দেবে ছোট, সেজ-মেজ-বৌদীদের মধ্যে ব্যস্ততা ফুটে উঠল। আমার আদর-আপ্যায়ণ বেড়ে গেল।"

এখন তুমিই বল, সেদিন স্বজনদের মুখের উপর যদি রেগে মেগে সেই শান্ দেওয়া কথা গুলো বলতাম, "তোমরা একেবারে যা তা, আমি তোমাদের ছোট

ভাই, আমাকে পর্যন্ত তোমরা ঘুষ-খোর ভাবতে পার। ছিঃ
ছিঃ, আসব না আর তোমাদের কাছে। এসে ভুলই করেছি।"
সেটা কি খুব ভাল হতো ? না, তারা বিশ্বাস করতেন ?"

তাদের মতে,—"সবাই খেতে পারে খাচ্ছে। তুমি খাও না। এটা ভাবতেও
অবাক লাগে। এমন বোকা তুমি হতে যাবে কেন ? মণি,
তুমি তো চালাক চতুর ছেলে। "সময়ের তাল বুঝে চলতে
নিশ্চয় তুমি জান।"

তাই তো বলি, এখনকার দিনকাল যা হয়েছে, চৌদ্দ দেবতার নাম নিয়ে চীৎকার দিয়ে, 'আমি ঘুষ খাই না : একথা বললেও কেউ বিশ্বাস করে না। করতে চায় না। তারা ধরেই রেখেছে সবই যখন আয়ত্তের মধ্যে, তখন নিশ্চয় "আমি ঘুষ খাই, আলগা কিন্তু পাই।" ইহাই বাস্তব। তাই তো বলি আমার নাম যেমন আছে দুর্নামও কম নয় ☐

'স্কোয়ার পেগ্ ইন্ এ রাউণ্ড হোল"

দুই বন্ধুতে আলোচনা চলছে। শিরোমণি সাহেব সরকারী চাকুরিয়া, নন্দলাল জার্নালিষ্ট।

শিরোমণি সাহেবের চাকুরির ধারা এবং নানা বৃত্তান্ত দেখে শুনে নন্দলালের ধারণা হয়েছে, সরকারী চাকুরিয়াদের দুর্ণাম করে তারাই, যারা এতসব জানেনা বা জানবার সুযোগ নেই।

চাকুরিয়াদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যারা তাদের দায়িত্ব ঠিক মত পালন করে না, ফাঁকি দেয়, তেল, তোঁয়াজ, মোসায়েবিকে চাকুরির প্রধান অঙ্গ হিসেবে ধরে নিজেদের কেরিয়ার তৈরী করে, কেউ হয়ত বা নানা অন্যায় অসাধু অপকর্মে জড়িত, কিন্তু তাদেরকে সমগ্র সরকারী কর্মচারী সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে দেখাটা ঠিক নয়।

আসলে সমাজের প্রত্যেক স্তরেই দুর্নীতি দেখা দিয়েছে অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে। অফিসে দপ্তরে চাকুরিয়াদের মধ্যেও এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সমাজের সর্বস্তরব্যাপী নৈরাশ্যের মধ্যেও শিরোমণিদের মত কিছু সংখ্যক কর্মচারীদের আপেক্ষিকভাবে অধিক দায়িত্বজ্ঞান, ন্যায়নিষ্ঠা, মনুষ্যত্ব, মমতাবোধ, কর্তব্যবোধ আছে বলেই তবুও কাজ চলছে।

শিরোমণির সঙ্গে কয়দিন কাটিয়ে তার কাজকর্ম দেখে তার সঙ্গে নানা অফিসে ঘুরে নানা জনের সাথে আলোচনার ভিতর দিয়ে নন্দলাল বুঝে নিয়েছে, শিরোমণি যত সৎ, সত্যবাদী, একনিষ্ঠ হউক না কেন তার সুনামের চেয়ে দুর্নামই বেশী। সুনাম করে তারাই যারা তার কাজ কর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল,

কম-বেশী ঘনিষ্ঠ বা অন্তরঙ্গ, কিন্তু সে আর কয়জন? দুর্নাম করে তারা যারা স্বার্থান্বেষী এবং শিরোমণির অন্তরঙ্গতার ছোঁয়াচ পায়নি বা সে সুযোগও নেই, তারাই তো বেশী।

লক্ষ্য করেছে নন্দলাল এখন শিরোমণির সুনাম দুর্নামের কোনটার প্রতিই মোহ নেই। কে কি ভাবে, বা না-ভাবে সে সম্পর্কে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। সে তার কাজ নিয়েই ব্যস্ত, যেন চাকুরিটাই তার জীবন।

তবুও নন্দলালের ধারণা হয়, এই চাকুরিটা শিরোমণির ঠিক চাকুরি নয়—নট একর্ডিং টু হিজ এবিলিটি, কোয়ালিটি এণ্ড চয়েস্। তাই মনে প্রশ্ন জাগে, তবে কেন শিরোমণি এমন চাকুরি নিল? অন্য কিছু পছন্দ মত করলেই তো পারত।

এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে নন্দলাল একসময় প্রশ্ন করে, "মরতে এমন চাকুরি নিলে কেন? অন্য কিছু করলেই তো পারতে?"

শিরোমণি যেন এতক্ষণে পয়েন্ট মত কথা বলার সুযোগ পেলেন, সেই ভঙ্গীতে একটা সিগেরেট ধরাতে ধরাতে বলেন, "আরে সেই তো আসল কথা! আজকালকার দিনে চয়েস অব প্রফেশন বলে কিছু আছে না কি যে নিজের ইচ্ছে মত যা চাইব তাই পেয়ে যাব! নিজের বিদ্যাবুদ্ধি বা মন মত কাজ পাবার, করবার সুযোগ কোথায়? দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত? যেমন ভয়াবহ বেকার সমস্যা তেমনি জীবন ধারণের জন্য তীব্র তীক্ষ্ণ-তিক্ত প্রতিযোগিতা, কত এম. এ., বি. এ. চাকুরি পাচ্ছেনা বলে মৃহ্যমান হয়ে নানা ধান্দায় ঘুরছে। এই পরিস্থিতিতে যাদের কেউ নেই তাদের পক্ষে নিজের চেষ্টায়ই মনের মত কাজ পাবার সুযোগ কৈ? সুতরাং কপালে যা জুটে প্রথম সুযোগে তাই আঁকড়ে থাকতে হয়।"

নন্দলাল প্রশ্ন করে, "আচ্ছা এসব ব্যাপারে এম্প্লয়মেণ্ট একচেঞ্জগুলোর তো দায়িত্ব আছে, ওরা কি ঠিক কাজ ঠিক লোককে সংগ্রহ করে দিতে পারে না? এপ্রপ্রিয়েট পারসন্স টু এপ্রপ্রিয়েট সিচুয়েশন!"

শিরোমণি বলেন, "ওদের সাইন বোর্ডে আছে বটে "এ স্কোয়ার পেগ্ ইন্ এ রাউণ্ড হোল ইজ এ মিস্ ফিট্।" বাস্তবে যা দেখা যাচ্ছে, তাতে ওদের দোষ দেওয়াও যায় না। আর কিই বা করবে ওরা ? যে দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশী অথচ উপযুক্ত চাকুরি দেবার সংস্থা কম। ফলে প্রার্থীকেই ঘুরে ঘুরে খবর নিতে হয় কোথায় 'ভ্যাকেন্সি'। প্রায় সব অফিসেই 'নো ভ্যাকেন্সি' সাইন-বোর্ড লটকান অথচ অনেক সংস্থা আছে যেখানে তলে তলে লোকও নেওয়া হয়। সুতরাং কোন্ অফিসে সত্যিকারের ভ্যাকেন্সি আছে এ সত্যি সংবাদটুকু জানতেও তদ্বির করতে হয়। যদি কোন 'মামা বা ক্ষমতাশালী লোক' চাকুরির সংস্থান করে দেন, তবে তার হয়, তা না হলে উপায়হীন। সহজ সরল স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম প্রায় সর্বত্র। তবুও শিক্ষিতরা বেকারত্ব ঘোচাতে এইসব একচেঞ্জ বা ব্যুরোতে যেমন নাম রেজেষ্ট্রি করে তেমনি 'মামা' 'জ্যাঠা, কাকার সন্ধানও করে, তদ্বিরও করে চলে যতদিন না একটা কিছু ভাগ্যে জোটে।"

নন্দলাল প্রশ্ন করে, "তোমার ভাগ্যটা কি করে এমন হলো ? কি করে এই চাকুরীতে তুমি এলে ?"

নন্দলালের কৌতুহলে শিরোমণি একটু ভাবিত বা দ্বিধান্বিত, আবার একটা সিগেরেট তুলে নিতে নিতে মন্তব্য করেন, "একেবারে ব্যক্তিগত প্রশ্ন, তা হলে তো অনেক পুরোণ কথা বলতে হয়।"

"বল না শুনি" বলে নন্দলালও একটা সিগেরেট তুলে নেয়।

লাইটার জেলে নন্দলালের সিগেরেটে আগুন দিয়ে নিজেরটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া টেনে শিরোমণি বলতে শুরু করেন—"সেই যখন ক্লাশ নাইনে পড়তাম তখন ব্রতচারীর মহান উদ্যোক্তা ৺গুরুসদয় দত্ত মহাশয় আমাদের স্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন। ক্লাশে ঢুকে আমাদের অনেককে একটা প্রশ্ন করেছিলেন, 'হোয়াট ইজ ইওর এম্বিশন ?'

উত্তরে কেউ বলেছে, আমি ইঞ্জিনীয়ার হব, কেউ বলছে আমি ডাক্তার হব, কেউ বলেছে উকীল হব, প্রফেসার হব, সাহিত্যিক হব, পলিটিসিয়ান হব, কেউ হবে মিলিটারী জেনারেল, আমি কি হবো তখন কি অত ভেবেছি ? না

ভাববার বয়স ছিল! কিন্তু সম্মুখেই তো প্রশ্নকর্তা একজন আই. সি এস, তৎমূহূর্তে আমার উত্তরও হলো 'আমি আই. সি. এস্. হবো।'

স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত নিজে একজন নামজাদা আই. সি. এস্,। আমার উত্তর শুনে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু বাস্তবে আমি যখন বি.এ, পাশ করে আই, সি, এস্-এর নমিনেশন চাইলাম পেলাম না পেল আমাদের কলেজের প্রিন্সিপালের ছেলে যার মেধা আমার তুলনায় কিছুই নয়। অথচ তদ্বিরেয় ফল সেই পেল।

এরপরে এম, এ, পাশ করবার সঙ্গে সঙ্গে ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরোতে নাম রেজেষ্ট্রি করলাম। ছাত্র হিসেবে তো খারাপ ছিলাম না প্রফেসারদের মোটা-মুটি গুড্ বুকে ছিলাম, ওদেরই ২/৩ জন ব্যুরোর তৎকালীন সেক্রেটারী ডাঃ হাজরাকে বলেও দিয়েছিলেন, যেন দেখে শুনে আমার একটা ভাল চাকুরীর সংস্থান করে দেন। আমিও সেই ভরসায় ছিলাম। একদিন ডাক এলো সেই ব্যুরো থেকে। সেক্রেটারী ডাঃ হাজরার সম্মুখে হাজির হতেই উনি প্রশ্ন করলেন, "চাকুরী করবে ?"

উত্তর দিলাম 'না করে উপায় কি স্যার "

ডাঃ হাজরা, "কি চাকুরী চাও ? হোয়াট ইজ ইওর একস্পেক্টেশন ?

আমি—জাষ্ট এ লিভিং ওয়েজ অ্যাকর্ডিং টু মাই কোয়ালিফিকেশান অ্যাণ্ড মেরিট।

ডাঃ হাজরা "হোয়াট ডু ইউ মীন্ বাই লিভিং ওয়েজ ? হান্ড্রেড্ ? ফাইভ হান্ড্রেড ? হোয়াট ইজ ইওর এস্টিমেট ?"

তখন তো যুদ্ধের সময়—১৯৪৪ সন অন্ততঃ শোয়াশ দেড়শ টাকার নীচে হোটেল বোর্ডিংয়েও থাকা চলে না। সেই ভেবে আমি বললাম, "এষ্টিমেট কি করব ? আপনি তো আমার স্কুল কলেজের কেরিয়ার জানেন, আজকালকার এই দুর্মূল্যের দিনে যাতে চলতে পারি এমন কোন চাকুরী হলেই ... ..."

আমার কথা সমাপ্ত হবার আগেই ডাঃ হাজরা চাপা বিরক্তি মাখা স্বরে

মন্তব্য করেন, 'ঐ তোমাদের এক কথা। তোমাদের কেরিয়ার যাই হউক এম, এ পাশ করলেই তো আর আই.সি এস্ হওয়া যায়না। লুক্ হিয়ার ইজ এ্যান অফার—একটা মার্কেণ্টাইল ফার্মে সর্বসাকুল্যে ৮৫ (পঁচাশি) টাকা পাবে—এ্যাট দ্য মোমেণ্ট, ইফ্ ইউ ক্যান প্রভু ইওর, ওয়ার্থ ইউ মে মেক্ ইউর ফরচুন দেয়ার। জাষ্ট থিঙ্ক ওভার ইট এণ্ড টেল মী হোয়েদার ইউ আর রেডি টু একসেপ্ট্ অর নট্।"

শিরোমণি "সেই দিন ঐ ডাঃ হাজরার চেম্বার থেকে বেরিয়ে খুব ভেবেছিলাম।"

এক সময় আমার আকাঙ্খা ছিল, আমি আই, সি, এস, হবো, সেটা থেকে সরে গিয়ে পরে আশা করেছিলাম অন্ততঃ আমার বিদ্যাবুদ্ধির অনুপাতে আমি যোগ্য স্থান পাব। বাস্তবের মুখোমুখী হয়ে বুঝে নিলাম পেছনে কেউ না থাক্লে উপযুক্ত চাকুরী পাওয়া অত সহজ নয়, কোয়ালিফিকেশন টোয়ালিফিকেশন কিসছু না—রেফারেন্স চাই, তদ্বির চাই। বাবা, কাকা, মামা, জ্যাঠা চাই অগত্যা শ্বশুর বা জামাইবাবু চাই। আমার তো কেউ নেই, ঐ ডাঃ হাজরা যদি আমার কেউ হতো তবে নিশ্চয় আমারও ভাল কিছু করে দিতেন—ঐ ৮০/৮৫ টাকার চাকুরী না।

সুতরাং চাকুরীতে মুরুব্বীই হলো আসল, মুরুব্বী চাই, তোমার নেই? তাহলে প্রাইভেট টিউশ্যানি কর অথবা নিয়তির উপর নির্ভর কর। কম কষ্ট করিনি, সস্তার মেসে থেকে ছাড়পোকার কামড় খেয়ে অনেক বিনিদ্র রাত কাটিয়েছি। অনেক তীব্র লজ্জাকর অভিজ্ঞতাও লাভ করেছি চাকুরির ধাঁধাঁয় ঘুরে ঘুরে, তবু ঐ ডাক্তার হাজরাদের মত লোকেদের তোষামোদ করতে মন সায় দেয়নি। এবং যা কিছু করি না কেন নিজের চেষ্টাই করব, কোন তদ্বির বা মুরুব্বী পাকড়ে নয়—এমন একটা জেদও আমার ছিল।"

এতক্ষণ এক নাগাড়ে কথা বলে শিরোমণি একটু থামলেন। এই ফাঁকে নন্দলাল জানতে চায়, "শেষে তুমি এই চাকুরি পেলে কি করে?"

শিরোমণি বলেন, সে এক কাণ্ড—ইতিহাস। অনেকদিন কিছুই করতে পারলাম না, অথচ সহপাঠীদের অনেকে ভাল চাকুরি পেয়ে গেল, আমার চাইতে অনেকের মেধা বলতে গেলে লাস্ট বেঞ্চার, তবু ওরা ভাল চাকুরি জুটিয়ে নিল, কেন আমার হয় না? আশ্চর্যই ঠেকত, রহস্য মনে হতো।

অবশ্য সুযোগ যে একদম আসেনি তা নয়, দুই চারজন অতি মহামানব আমায় লোভ দেখিয়েছিলেন—তাদের মেয়ে বা নাতনীকে উদ্ধার করলে ওরা আমাকে গেজেটেড পোস্ট পাইয়ে দেবেন। এমন সব ইঙ্গিত নিয়ে বেশ দু'চারজন আমার পিছুও নিয়েছিল, আমি ওসব প্রলোভন এড়িয়ে গেছি। অবশ্য আমার জানা মত বেশ কয়েকজন সহপাঠী অমন প্রস্তাবে রাজী হয়ে আজ তারা ভাল পজিসনেই আছে। দু'একজন শুধু আশ্বাস দিয়েই বেকারত্ব ঘোচাল কিন্তু প্রস্তাব মত পাত্রী উদ্ধার করল না। ফলে যেখানে তাদের সম্পর্ক হতো শ্বশুড়-জামাত্র এখন তারা একে অপরের নাম শুনলেই ক্ষণে ক্ষণে শালা বলে।

যাক সে সব কথা আমি অমন প্রলোভনে মজলাম না, শিক্ষার সংস্কারে বাঁধত। অমনভাবে লাইন অব রেফারেন্স এর জোরে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়াটা আত্মসম্মানের পরিপন্থী। তাই আমি চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে বেশীর ভাগ বেকাররা যা করে তাই করলাম, অর্থাৎ হেডিং ছাড়া অনেকগুলো দরখাস্ত টাইপ করে খবরের কাগজে এ্যাডভারটাইজমেণ্ট দেখে দেখে নানা অফিসের দপ্তরে দরখাস্ত পাঠাতে লাগলাম। মাঝে মাঝে এই-সেই অফিস থেকে ডাকও আসত, ইণ্টারভিউ ভালই দিতাম। এই সেই বন্ধুবান্ধবদের পোষাক হাওলাত করে তাদের পোষাক পরে উপস্থিত হতাম ইণ্টারভিউ বোর্ডে। কিন্তু ফল হতো না। এমনি ফল পেয়ে পেয়ে আমার চেহারা দেখতে দাঁড়াল ডিস্পেপটিক। আর তখনি ডাক এলো কমিশন থেকে।

কমিশনের সম্মুখে হ্যাজির হতেই চেয়ারম্যান আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন এমন ভঙ্গীতে মনে হলো উনি মনে মনে ভাবছেন, "হাউ হি ডেয়ারস্ টু এ্যাপিয়ার বিফোর দা কমিশন উইথ্ সাচ্ ফিজিক?"

কিন্তু হাজির যখন হয়েছিই প্রশ্ন না করেও উপায় নেই, সব প্রশ্নের উত্তরও সঠিকভাবেই দিলাম তবু যেন মন ভজতে চায় না, শেষে সপ্রশ্নে মন্তব্য করলেন, "ইউ লুক ভেরি সিকলি যার অর্থ আমার মনে ফুটল, "এ চেহারা স্বাস্থ্য নিয়ে স্টাফ কণ্ট্রোল করতে পারবে ত ?"

এতক্ষণ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরে মনের ভেতরে একটা সন্তুষ্টির ভাব ছিল, চেয়ারম্যানের ঐ মন্তব্যে আমি বুঝলাম, আমাকে নাকচ করবার জন্যেই ঐ মন্তব্য।

আমি তো ধরপাকড় করিনি, তদ্বির করিনি, কারও সার্টিফিকেট, ব্যক্তিগত চিঠি বা অন্য কোন রেফারেন্স নিয়ে আসিনি। তাই বোধ হয় নাকচ করবার মতলবে অমন মন্তব্য—'ইউ লুক ভেরি সিকলি।'

আমার রগ চুটে গেল। আমি কি জানিনা কত লিকলিকে, টিংটিঙে, কুশ্রী, কুৎসিৎ ব্যক্তি দায়িত্বপূর্ণ পদ দিয়ে সগৌরবে চাকুরী করে যাচ্ছে ! তাদের অনেকের তুলনায় আমি তো বিশ্বশ্রী। একটু দুধ, একটু মাছ, একটু মাংস, অর্থাৎ একটু ভালভাবে খেতে, পড়তে পারলেই আমার আসল স্বাস্থ্য ফুটে উঠবে। চেহারার জৌলুস ফিরে পাব।

বিদ্যাবুদ্ধি, দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যবোধ, সাহস, ব্যক্তিত্ব সবই আছে অথচ বাস্তবে কিছুই করতে পারছি না। এত হয়রানিতে ভুগতে হবে জানলে লেখাপড়ার ইতি টেনে ফেলতাম অনেক আগেই। তখন বেকার থাকলেও মনকে প্রবোধ দিতে পারতাম এই বলে, 'বিদ্যা নেই বুদ্ধি নেই, ভাল চাকুরী পাব কি করে ?

অবস্থা যখন তা নয়, আমার মানসিক অবস্থা তখন ভিন্নরূপ, চাকুরীর জন্য ঘুরে ঘুরে কিছু না পেয়ে একটা চ্যালেঞ্জিং এটিচুড্ অব লাইফ স্বভাবে দানা বেঁধে গেল, সেই স্বভাবেই আমিও চেয়ারম্যানের অমন উক্তির প্রত্যুত্তরে চটপট বলে ফেললাম, ইট ইজ দ্য ব্রেন দ্যাট উইল এক্ট-নট দ্য ফিজিক্স।" "দেহের গড়ন গঠনই যদি এই চাকুরীর প্রধান গুণ বলে বিচার্য হয়, তবে এ্যাডভারটাইজমেন্টে উল্লেখ থাকলেই হতো ? তা হলে দরখাস্তই করতাম না।"

বলতে চেয়েছিলাম, "তা হলে দারা সিং বা কিং কং এর মত বপু বিশিষ্ট এমন কাউকে সিলেক্ট করলেই তো হয়, অমন বপু দেখলে স্টাফ্‌রা কণ্টোলে থাকবেই।"

অর্থাৎ হলে হবে না হলে নাই, কথা বলতে ছাড়ব না, কথা বলে যাব।

নন্দলাল বড় বড় চোখে প্রশ্ন করল,"তোমার অমন ধারা উক্তি শুনে বোর্ড কি বলল ?"

শিরোমণি বলেন, "আমার বলার ভঙ্গিতে শ্লেষ সমালোচনা ও ফ্রাস্ট্রেশন প্রচ্ছন্নভাবে ফুটে উঠেছিল। চেয়ারম্যান ডান হাতে নিজের চশমাটা নিয়ে লেন্সটি রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে এমনভাবে তাকালেন যেন স্বগতোক্তি করলেন, 'আই সি !'

তির্যক দৃষ্টি মেলে আমার আপাদমস্তক আবার নিরক্ষণ করলেন, চশমাটা চোখে লাগিয়ে ত্বরিতে দৃষ্টি বিনিময় করলেন, অন্য মেম্বরদের সাথে, ওদের কৌতুহলও কম নয়।

ফলে প্রশ্ন বৃদ্ধি পেল, আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, স্কুল কলেজের কেরিয়ার কী, এতদিন কি করেছি, এণ্ড হোয়াট ইজ মাই এম্বিশন ইন্‌ লাইফ ?

সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শেষে বললাম, "অ্যাম্বিশনের সঙ্গে স্বপ্ন কল্পনা জড়িয়ে যাবে, ছোট বেলায় স্বপ্ন দেখতাম যদি আমি শ্রীকৃষ্ণের চক্রটা হাতে পেতাম তাহলে ··· । তা হলেটা থাক, মোট কথা কল্পনায় অনেক কিছু হতে চেয়েছি, এখন বেকারত্ব ঘোচাতে পারলেই মর্তে যাব। ভবিষ্যতে কি হবো না হবো ভাবি না, শুধু বুঝি অ্যাম্বিশন থাকলেই হয় না নির্ভর করে সুযোগ সুবিধের উপর। এই চাকুরী যদি হয়, ইউ উইল ফাইণ্ড ইন্‌ মী এ ক্যাপেবেল অফিসার। আর যদি এমনভাবে আরও কিছুকাল কাটাতে হয় তবে এ্যাট ওয়ান টাইম ইউ মে সি মী ইন্‌ দ্য ফোরফ্রণ্ট অব আন্‌এমপ্লয়েড ডিমনস্ট্রেটরস্‌ অ্যান এডুকেটেড এজিটেটর সুতরাং এক কালে কি আমি হতে চেয়েছিলাম, সে প্রশ্ন—অবান্তর।"

আমার কথাবার্ত্তায় যে ফ্রাস্ট্রেশন এর দাম্ভিকতা প্রাধান্য লাভ করেছে সেটা চেয়ারম্যান ভাল করেই লক্ষ্য করলেন। এবং এটাও বুঝে নিলেন আমার ফ্রাস্ট্রে-

শনের কারণ কি। কিন্তু চেয়ারম্যান সত্যিকারের একজন ভাল লোক ছিলেন বলিই উনি আর কথা না বাড়িয়ে অপরাপর মেম্বারদের চোখে দৃষ্টি বর্ষণ করে আমার ইন্টারভিউর ইতি টানলেন। 'থ্যাঙ্কু ভেরি মাচ ফর ইওর স্ট্রেট এক্সপ্রেশন, আপনি এখন আসুন।' এমনভাবে বলল যেন যার ভিতরে ফুটে উঠল, "অল-রাইট ইয়ংম্যান, আই স্যাল সি হোয়াট আই ক্যান ডু ফর ইউ।

নন্দলাল আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে জানতে চান, 'তোমার চাকুরি হলো ?'

শিরোমণি সিগারেটের শেষ অংশটি মাঠের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, কিছু দিন পরে আমার বেকারত্ব ঘুচল, চাকুরি হলো, তবে এখন বুঝি হওয়া উচিত ছিল না। নেহাৎ চেয়ারম্যান ভাল মানুষ ছিলেন বলেই হলো, কিন্তু অমন ধারায় কথা আমার কাছে ইন্টারভিউ দিতে এসে যদি কেউ বলত তবে তার নিশ্চয় চাকুরী হতো না।'

নন্দলাল, 'কেন ? কারণ কি ?'

শিরোমণি, 'কারণ আর কিছু নয়, তোষামোদ প্রিয়তা মানুষের মজ্জাগত, একটু তোষামোদ একটু খোষামোদ, একটু আনুগত্য, এমন ভাব না থাকলে কেউ কারও প্রতি আকৃষ্ট হয় না, হতে চায় না। এটা তুমি আমি সবার ভেতরে অল্প বিস্তর আছে। এড়াবার উপায় নেই, আগে বুঝতাম না, এখন বুঝি, ঐ চেয়ার-ম্যানের মত দশের বাইরে একাদশ কজন ? এমনভাবে সেদিন কথা না বললে ঐ কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ হতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু সেই চেয়ারম্যান তো আমার গুণ বিচার করে আমাকে সিলেক্ট করেন নি। উনি ভেবেছিলেন আমি ফ্রাস্ট্রেটড হয়ে পড়েছি, সত্বর কিছু একটা না পেলে এন্টিসোস্যাসিয়েল এলিমেন্ট হয়ে যাব।''

নন্দলাল শেষ বারের মত প্রশ্ন করে, "তা এত কাণ্ডের পর এই যে চাকুরী পেলে; তখন কি এমন বুঝেছিলে এই তোমার ঠিক লাইন ?"

শিরোমণিও এ প্রসঙ্গের ইতি টানতে বলেন, 'আরে সে বিবেচনা করার সুবিধে কোথায় ? চাকুরী চাই। বেকার থাকা চলে না। তাই বেকারত্ব ঘোচাতে চারিদিকে দরখাস্ত পাঠিয়েছি—বোম্বেতে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হবার

জন্যে, কলকাতায় পুলিশে, এয়ার কোম্পানীতে ষ্টুয়ার্ড হতে, কটকে ডায়েরী ফার্মে, রাঁচি রিচার্স ইনষ্টিটিউটে, ইছাপুর গান ফ্যাক্টরীতে, কোন্নগর ডিষ্টিলারিতে, আসামের তেল কোম্পানীতে, ডুয়ার্সের চা বাগানে, কেলনার-সুরারজীতে, রেল কোম্পানীতে, ফিল্ম কোম্পানীতে, আরও কত জায়গায় যে দরখাস্ত দিয়েছি বলতে গেলে অগুন্তি, ব্যক্তিগতভাবে এপ্রোচও করেছি নানা দপ্তরে, অফিসে।

"যেখানে সুযোগ পেতাম সেখানেই ঢুকে পড়তাম। এখানে সুযোগ আগে এলো একসেপ্টও করলাম, সুতরাং মনমত কাজ বেছে নেবার সুযোগ কোথায়? মনমত একটা কিছু পাব এ আশায় বসে থাকলে আর ডাক নাও আসতে পারত। সুতরাং ঠিক পছন্দমত লাইন পেয়েছি কিনা আমি নিজেও বলতে পারব না, তবে এটা বুঝি, পছন্দমত কাজ পাওয়া যায় না। বেকার ছিলাম, লেখাপড়া শিখে বেকার থাকা চলে না, তাই চাকুরি চেয়েছি, চাকুরি পেয়েছি, এতদিনকার চাকুরি জীবনে যে সুনাম দুর্নাম কিনেছি, তেল কোম্পানী, রেল কোম্পানী, তামাক কোম্পানীতে অতদিন চাকুরি করলে হয়ত বা এর চেয়ে আয়াসে জীবনটা কাটত। নাম যশ, খ্যাতি, বেশী হতো। সুতরাং আমি কি "স্কোয়ার পেগ ইন্ এ রাউণ্ড হোল" সে সমীক্ষা করে লাভ নেই। ম্যান ক্যানট চুজ হিজ রেসপনসিবিলিটিজ, ইট ইজ এ চান্স। এটাই স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং কি আমার হওয়া উচিত ছিল, আর কি আমি হয়েছি বা পেয়েছি এসব ভেবে কি আর হবে? বাকী জীবনটা এভাবে গেলেই হলো।"

বলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শিরোমণি উঠে দাঁড়ালেন এমন ভঙ্গীতে যার ভেতরে ফুটে উঠল এ প্রসঙ্গে আর আলোচনা বৃথা।

নন্দলালেরও আর প্রশ্ন নেই, তবে সে চুপ চাপ ভাবতে থাকলো শিরোমণি যা বলল একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার নয়, দেশের কর্ণধারদের ভাবা উচিত ☐

সফর

আষাঢ় মাস বর্ষাকাল। সেই কবে থেকে যে বৃষ্টি এক নাগাড়ে শুরু হয়েছে, কবে যে থামবে ঠিক নেই।

আজ অবশ্য তেমন বৃষ্টি না হলেও রোদ নেই, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

শিবাশিষের মনের অবস্থাও তথৈবচ। সেদিন ফুল্লরার কথায় অত অল্পেতে রেগে যাওয়াটা উচিত হয়নি। অমন হওয়ার কথা ছিল না, তবু হলো, হয়ে গেল। কেন হলো?

অত অল্পেতে ইদানিং কালে কেন যে হঠাৎ হঠাৎ শিবাশিষ রেগে যায় ফুল্লরার উপরে সে ভেবে পায় না, অথচ প্রথম পরিচয়ে শিবাশিষের মনে হয়েছিল ফুল্লরাতেই সে পাবে তার "ইউরেকা।"

কিন্তু ফুল্লরাকে সে ভাল করে বুঝতেই পারছে না। এ যেন অসম্ভবের সঙ্গে প্রতিযোগীতা, যখনই শিবাশিষ তাদের একাত্ব হবার কথা তোলে, মৃদু হেসে ফুল্লরা বলে, "ডোন্ট বী হেস্টি, বুঝলে বুড়ো খোকা" চোখের কোণে ঝটকা।

এক কথায় ফুল্লরা মোটেও সিরিয়াস নয়। সম্পর্কটা না-গ্রহণ না-বর্জনের মতন, মুখে সে অনেক কথাই বলে, কিন্তু বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়াটাই তার স্বভাব, শেষে না সে ফ্লার্ট করে।

তার অনেক ভোটারি কোটারি পরিচিতের গণ্ডিও ব্যাপক। তবে সে ব্যাপিকা কিনা শিবাশিষ বুঝতে পারছে না। অথচ এর ওর তার সঙ্গে হাম্ তুম্ খেলতে সে দ্বিধাহীন।

অথচ যেই না শিবাশিষের একাত্ম হবার বাসনা জাগে তখনি ফুল্লরা ছলকায়, "খাতির জমা রাখো জী, ইন্তাজার কর, ইন্তাজার কা ফল মিঠা হোতা হ্যায় জী।"

এ কেমনতর মেয়ে। শিবাশিষের রাগ হয়ে গেল। সে রাগে কথা বন্ধ তো হলই, যা চলছিল তারও ইতি টানা হয়ে গেল।

কিন্তু এখন যে শিবাশিষ বড় একা। ফুল্লারাকে টেলিফোনে 'ফরগেট অ্যাণ্ড ফরগিভ্' বলে ডাকলে হয় না ?

কিন্তু না, আত্মসম্মানে বাঁধে, যতদিন না ফুল্লরা তার কাছে আসছে কিংবা তাকে ডাকছে শিবাশিষ আর তার চিন্তা করবে না।

ফুল্লরাকে তার যে খুব পছন্দ এনন নয় আবার কাছে এলে খারাপও লাগেনা। তবে ফুল্লরা এমন কিছু সুন্দরী নয় তেমনি খুব হাই ফ্যামিলির মেয়েও না যে তাকে পাবার জন্য শিবাশিষকে ছোট হতে হবে। ফুল্লরার সাত জন্মের সাধনা যে শিবাশিষের মত পুরুষ তাকে শয্যাসঙ্গিনী করতে চেয়েছে। ফুল্লরা যদি ইতস্ততঃ করে তাহলে শিবাশিষের কাছে তার না আসাই শ্রেয়। তবে সে যদি নিজে থেকে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয় তখন তার কথা ভাববে। তেমন কিছুর আগে ফুল্লরাকে নিয়ে শিবাশিষ ভাববে কেন ?

কিন্তু সময় কাটাবে কি করে শিবাশিষ ? সতীর্থ তার অনেক থাকলেও প্রাণের বন্ধু কেউ নেই। আর তার স্বভাবটা হলো দো ফণ্ড্ অব্ ম্যানি অ্যাকোয়েণ্ট্যান্সেস্ হি ডেজায়ার্স অন্‌লি উইথ এ ফিউ, তাছাড়া স্বলিঙ্গের সখ্যতা কত আর ভাল লাগে !

বিপরীত লিঙ্গের ফুল্লরার সাথে সম্পর্ক ছেদ হওয়াতে সে যে বড়ই বিমর্ষ, কোথায়ও গিয়ে একটু ঘুরে এলে মন্দ হয়না। গণ্ডিবদ্ধ জীবনটা ভালও লাগছে না, বড়ই গতানুগতিক।

কিন্তু এখন কতৃপক্ষ ছুটি দিতে নারাজ। ত্রিপুরায় বিধানসভার ইলেকশন হয়ে গেছে। এখন মন্ত্রীসভা হবে হচ্ছে, প্রশাসনে নানা পরিবর্তন সন্মুখে, তাই ছুটিও পাওয়া যাবেনা।

ফেব্রুয়ারী মাসে শিবাশিষ ছুটী চেয়েছিল. বস্ শুনেই হতাশার ভঙ্গীতে বলেছেন, "ওরে বাবা! এখন কি ছুটি নেওয়ার সময়! ১লা জুলাই থেকে কত কি রদবদল হচ্ছে। এখন ছুটি টুটির কথা ভুলে যান। গভর্নমেণ্টের কড়া নির্দেশ কাউকে ছুটি না দেবার।"

শিবাশিষও অবুঝ নয়। সে নিজেও বোঝে এ সময়ে কোথাও যাওয়া তার নিজের পক্ষেও সুবিধানজক নয়। ছুটি নিলে ফিরে এসে দেখবে তার চেয়ার অন্যের দখলে, আর তাকে ঠেলে দিয়েছে কোন এক অজ মহকুমায়।

রাজধানী আগরতলা শহরেই তার ভাল লাগছে না, আবার মহকুমা শহর! দরকার নেই বাবা ছুটির।

কিন্তু এভাবে জীবনটা যে জেরবার! সে বড় লোন্‌লি।

যাক্ শেষ পর্যন্ত ভিন্ন ভাবে একটা উপায় এল সন্মুখে, একটা তদন্তের ভার পড়ল তার উপর তদ্দরুণ তাকে দুই মহকুমা শহরে যেতে হবে।

ভালই হল ছুটি চেয়েছিল একঘেঁয়েমি কাটাতে। তদন্তের কারণে ঘুরা ঘুরিতে লোন্‌লিনেসের একঘেয়েমিটা যাবে।

প্রথমে যেতে হবে অমরপুর, সেখান থেকে কাজ সেরে সাব্রুম। এই যাতায়াতের পথে পড়বে উদয়পুর। বলতে গেলে তিন মহকুমার কভারেজ। তবে সরকারী গাড়ী-পাওয়া যাবেনা, তার জিপ এখনও ইলেকশন ডিউটি সেরে ফেরেনি। সুতরাং তাকে বাসেই যেতে হবে।

আকাশের অবস্থা মোটামুটি পরিস্কার। মনে হচ্ছে বৃষ্টি নাও হতে পারে। অমরপুরে সরাসরি আগরতলা থেকে কোন গাড়ী যায় না। উদয়পুর থেকে প্যাসেঞ্জার হলে দিনে ২টি জিপ যায়। রাস্তা মাত্র তৈরী হচ্ছে। এতদিন উদয়পুর থেকে যাত্রীরা হাটা পথে যাতায়াত করত, সে এক চড়াই-উৎরাই রাস্তা। বড়ই বিপদসঙ্কুল দেবতামুড়া।

অবশ্য নদীপথে নৌকায় উদয়পুর থেকে অমরপুর যাওয়া চলে। হাটা পথে উদয়পুর থেকে অমরপুর ১৬/১৭ মাইল। নদী পথে ২৫, বর্ষাকালে

নদী পথে যাওয়াও বিপজ্জনক। গোমতী নদী বড় সাঙ্ঘাতিক খরস্রোতো নদী। কিছুদিন আগে একটা নৌকাডুবি হতে হতে বেঁচে গেছে। তাই বর্ষাকালে নৌকোও বড় যায় না। যাওয়া উচিতও না।

সেদিন সোমবার। উদয়পুর পর্যন্ত একবার যাওয়া তো যাক্, সেখানে গিয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

একটা ছোট চামড়ার হ্যাণ্ড ব্যাগে, জামা কাপড়, আর একটা পোর্টফলিও নিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে এসে পৌছতেই অপ্রত্যাশিত ভাবে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল, বাতাসও তীব্র হয়ে গেল। উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে যত রাজ্যের শুকনো পাতা, খড় কুটো, ধূলো। আকাশে মেঘ গর্জনের সাথে বিদ্যুতের ঝিলিক। বৃষ্টি হবার আভাস স্পষ্ট।

তবে শিবাশিষ একবার যখন বেড়িয়েছেই আর ফিরে যাচ্ছে না, রিক্সো থেকে চামড়ার ব্যাগটা বাসের ভিতরে তুলে দেওয়া হয়ে গেছে, বাস ছাড়তে ৫/১০ মিনিট দেরী হতে পারে, তবে ওদের বিশ্বাস নেই, হঠাৎ ছেড়েও দিতে পারে।

শিবাশিষের সিগেরেট নেওয়া হয়নি, খেয়াল হতেই একটা টঙ ঘরের দিকে যেতেই বৃষ্টি এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে ছাতাটা মেলে পান সিগেরেটের ঘরের সামনেই সিগেরেট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, চোখ বাসের দিকে।

ওখান থেকে দৃষ্টি হল একটি মেয়ে পরনে লাল জমিন শাড়ি, গায়ের রঙ শ্যামলাই বলা চলে, তবে বেশ পরিচ্ছন্ন পোষাকে, দেখতে মন্দ নয়, বয়স অনুমান ২৩/২৪। মুখের গড়ন গোল, বয়স অনুপাতে দেহ জুড়ে পরিপূর্ণতা, সব মিলিয়ে রূপসী না হলেও কুরূপা নয়, স্বাস্থ্য ভালই, গালটা ভরা ভরা। ভাল লাগার দৃষ্টি নিয়ে দেখলে একে ভালবাসা যায় গাল টিপে।

সিগেরেট নিয়ে ফিরতেই সে লক্ষ্য করল পাত্রীটি বাসের ফ্রন্ট সীটের দরজার দিকটাই দখল করে নিয়েছে, অগত্যা শিবাশিষ ড্রাইভারের দিক দিয়ে উঠে স্টীয়ারিং ধরে বসল। ড্রাইভার এলে পরে সে সরে বসবে। মনে হলো ফ্রন্ট সীটেরই যাত্রী এই যুবতী।

বৃষ্টির দরুণ মনটা নিরুৎসাহ হয়ে গিয়েছিল, এখন এই পাত্রীটির পাশাপাশি বসে যেতে পারবে ভেবে শিবাশিষের মনে আর সেই ভাব নেই ।

মেয়েটিকে তুলে দিতে এসেছে একটি ২০/২২ বছরের এক ছোকড়া, কথা বার্তায় মনে হল ওরা সম্পর্কে ভাই-বোন। যদিও চেহারা রঙে মিল নেই, ছোঁকড়াটি ছাতা মাথায় বাসের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, পাত্রীটির কোলে একটি 'জলসা'। গায়ের গন্ধটা বড় মিষ্টি লাগছিল।

শিবাশিষের ইচ্ছা হচ্ছিল জলসাটি টেনে নেয়, নিজেকে সে সংযত করল।

সময়মতই ড্রাইভার এল, শিবাশিষ স্টীয়ারিং ছেড়ে ডানে সরে গিয়ে সুন্দরীর গা ঘেঁসে বসল। যে পরিমাণ স্থান গায়ে গা লাগেই, যত সংকুচিত হয়েই বসুক না, উপায় নেই।

বাসটি ভীষণ শব্দ করে স্টার্ট নিল, পুরণো গাড়ী, দেখলেই মনে হয় *salvage dump* থেকে নীলামে কেনা, *weapon carrier* কে বাস করা হয়েছে, গদি নেই. প্রথম যখন রাস্তায় নামান হয় তখন হয়ত গদি ছিল। তারই চিহ্ন ব্লু রঙের জিন্ কাপড়ে মোড়া লম্বা চ্যাপ্টা একটা স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে রয়েছেও, তবে কোন অর্থ হয় না, তবু আছে।

বাস চলতে শুরু করেছে, ছেলেটি পেছনে পড়ে গেল। জানালা দিয়ে পেছনের দিকে দেখবার চেষ্টা করতে গিয়ে মেয়েটির বাঁ হাত শিবাশিষের গালে লেগে গেল, একটু জোরেই লেগেছে কিন্তু শিবাশিষের ভ্রুক্ষেপ নেই এমন ভাব করে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পাশাপাশি বসলে ঠোকাঠোকি হয়ই, তেমন আর কি !

কোন বেটাছেলে অমন অবস্থায় গালে টোকা দিলে কেমন ব্যবহার করত শিবাশিষ মনে মনে তাই ভাবছে, 'সরি' বললেও হয়ত পাল্টা বলত, 'দেখে শুনে নড়া চড়া করতে পারেন না ?'

এখন কিন্তু মনে হয় এই সুন্দরী চিমটি কাটলেও মিষ্টিই লাগবে, অনুমানেই বোধহয় সুন্দরীও 'সরি' বলল না।

শিবাশিষ কিছুটা আশান্বিত, ঠিক হয়ে বসতে হয়ত আবার সুন্দরীর বা হাত তার গালে লাগবে, কিন্তু দুর্ভাগ্য সহযাত্রিনী ঠিক হয়ে বসতে সতর্কতার দরুণ

এবার কিছুই স্পর্শ করল না। কিন্তু শিবাশিষের মনে কিঞ্চিৎ হতাশা স্পর্শ করল।

লোহার পুলে এসে বাসকে থামতে হলো, ট্র্যাফিক পুলিশ এসে দেখে নিল অতিরিক্ত যাত্রী আছে কিনা। চারজন অতিরিক্ত যাত্রীকে যেতে নির্দেশ দিয়ে পুলিশ ড্রাইভারের লাইসেন্স বই চাইল।

ড্রাইভার কণ্ডাক্টারকে 'শালা' বলে গালি দিয়ে বলল, "তোর জন্যই আবার মামলায় পড়লাম।"

গালির নমুনায় মনে হল ড্রাইভার ওভারলোড নেওয়ার পক্ষপাতি নয়, অযথা পুলিশের সাথে খ্যাঁচাখ্যাঁচি বা বখরায় তার না-পছন্দ।

পুলিশ কিসব টুকে ড্রাইভারকে লাইসেন্স বই দিয়ে ছাড় দিল।

পুল পেরিয়ে বাস আবার রাস্তার একপাশে, থামিয়ে ড্রাইভার শিবাশিষের পানে তাকিয়ে "স্যার, পাঁচটা টাকা দিন তো। শিবাশিষের কাছ থেকে পাঁচটা টাকা নিয়ে ড্রাইভার এপারের পুলিশের কাছে গিয়ে হাতে পাঁচ টাকার নোটটা গুঁজে দিতে দিতে কি সব বলে ফিরে এসে গাড়ীতে স্টার্ট দিতে দিতে কণ্ডাক্টারের উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে জানতে চাইল, "কি রে সব ঠিক ?"

কণ্ডাক্টর দড়িতে টান দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে জানান দিল "সব ঠিক।"

এই "সব ঠিক" এর অর্থ হল যে চারজন অতিরিক্ত যাত্রীকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওপারে তারা পুলটা হেটে পেরিয়ে আবার উঠেছে বাসে।

বোঝা গেল ড্রাইভারটির বয়স কম হলেও বেশ ঘাগু।

গাড়ী মোটামুটি স্পীডে চলছে, বৃষ্টির ঝাপ্টা লাগছে সুন্দরীর গায়ে। দরজাতে জানালার মত যে পাল্লাটি আছে সেটি তুলে না দিলে সুন্দরী ভিজে একাকার হবে। কণ্ডাক্টার পাল্লাটি তুলে দিতেই সুন্দরীর কিছুটা স্বস্তি।

সুন্দরী কিছুক্ষণ জলসাটি নাড়াচাড়া করে রেখে দিল। শিবাশিষের মনে হল একটা "হেড্‌লি চেজ" এর বই নিয়ে এলে মন্দ হতো না।

বৃষ্টির দরুণ সামনের গ্লাস ঝাপসা, উইপার ব্রাস অকেজো, কি করে ড্রাইভার গাড়ী চালাচ্ছে সেই জানে। অভ্যস্ততা না থাকলে সম্ভবপর নয়।

চুপচাপ বসে থাকা বিরক্তিকর, ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল শিবাশিস, "অমরপুরে জীপ যায় কিনা ?"

ড্রাইভার, "যাত্রী হলে যায়, তবে বেশি বৃষ্টি হলে নাও যেতে পারে। আজ যাবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

কি আর করা যাবে, জলসাটি সুন্দরীর কাছ থেকে চেয়ে নিলে মন্দ হয় না, কিন্তু সহযাত্রিনী যে বড় চুপচাপ, এত চুপচাপ থাকলে কি জলসা চাওয়া যায় !

গাড়ীর ঝাঁকানিতে জানালার পাল্লাটা পড়ে গেল। হঠাৎ জলের ঝাপ্টা থেকে নিজেকে বাঁচাতে আরও একটু বাঁয়ে সরে এল সুন্দরী। তার মানে শিবাশিষের গায়ে গায়ে। সুন্দরী চেষ্টা করল পাল্লাটা তুলতে না পেরে সে শিবাশিষের পানে তাকাল, একটু যেন বিভ্রান্তের চোখাচোখি। যেন শিবাশিষকে বলতে চায়, "তুলে দিন না পাল্লাটা।"

শিবাশিষ যেই মাত্র তুলেছে, ড্রাইভার বলল, "ধরে রাখুন স্যার, তা না হলে আবার পড়ে যাবে।"

আঁকাবাঁকা রাস্তায় গাড়ী চলছে উদ্দাম গতিতে। পীচের রাস্তা। উদয়পুর পর্যন্ত রাস্তা ভালই, তবে আঁকা বাঁকা বলে ঘন ঘন গীয়ার পাল্টাতে হয়। কত যে 'U' আর 'N' কার্ভ ! গাড়ী হেলে দুলে চলছে আর শিবাশিষ ডান হাত দিয়ে পাল্লা ধরে রাখার কারণে সুন্দরীর আবৃত বক্ষদেশে তার হাতের কনুই লেগে যাচ্ছে। এই যে লেগে যাচ্ছে শিবাশিসের কোন মতলবের কারণে নয়, তার মধ্যে কোন চাতুরীও নেই, তবে সে একটা জিনিষ ভাবছে বাহ্যিক ভাবে সুন্দরী যতটা উদাস উদাস, এই স্পর্শটা একটু আড়ালে হলে এই উদাস উদাস ভাবটা বন্ধক রেখে মুহূর্তেই সে শিবাশিষের বাহুমূলে আলিঙ্গিত হয়ে যেতো। আদিরসাত্মক অঙ্গ ভঙ্গী সহযোগে যদি তেমন ইচ্ছা শিবাশিষ দেখায়।

নারী পুরুষের ব্যক্তিক নৈর্ব্যক্তিক আচরণ বিধি ভিন্নতর, এবং যে কোন মেয়ের দুটি সত্ত্বা থাকে, একটা বাইরের অপরটা অন্তরের। স্থান কাল পাত্র ভেদে

ধারণার প্রভেদ হতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞতার দৌলতে শিবাশিসের বিশ্বাস, কোন মেয়ের কী মনোভাব, কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কাটালেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর একটা রাত্রি যদি কোনভাবে এক সঙ্গে কাটান যায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। আবেগ ঘন অনায়াস ডুয়েল উত্তাল মনমজানো ব্যাপার।

চাকরি পাবার আগে জীবনটা যখন তরলভাবে দেখত শিবাশিস তখন চেনা-অচেনা-হাফ্ চেনা যখন যাকে কাছে পেয়েছে বা ভাল লেগেছে মুখশুদ্ধি চেয়েছে তো আশ্চর্য, একটি পাত্রীও অসন্তোষ প্রকাশ করেনি, বরং মিষ্টি হেসে আনুগত্যের ভাব দেখিয়ে তার ব্যবহার মেনে নিয়ে প্রমাণ স্বরূপ হাসি খুশিমনে হয়ে মুখশুদ্ধিটা ভাগাভাগিই করেছে নিজ আগ্রহে সঙ্গে কিছু উৎসং।

এগুলো এক ধরণের অ্যাড্‌ভেঞ্চার-গেইম্ অব্ লাইফ অ্যাণ্ড লাফ্‌টার, যেহেতু প্রেম ছিল না বড় বেশি ভাবান্তরও হয়নি।

তখন শিবাশিস তরল খেয়ালী ছিল, এখন সে সেইসব খামখেয়ালী-পনা থেকে মুক্ত। চাকুরির পজিশনে কর্তব্যজ্ঞানের দৌলতে স্বভাবে গাম্ভীর্য এসে গেছে, অনেক ইচ্ছাকেই গোপন রাখতে হয়। তা না হলে কৃতি অফিসার হওয়া যায় না। সাধারণ লোকের মত চালচলন হলে কর্মচারীরা মানবে কেন? কিন্তু শত হলেও সে তো একবারে সন্ন্যাসী নয়, এতক্ষণ একটি পরিপূর্ণ যৌবনবতী তার গা ঘেঁষে বসে রয়েছে, গাড়ীর ঝাঁকানিতে তার দেহের কিছু স্পর্শও লাগছে জানালার পাল্লাটা ধরে রাখার দরুণ, তাই তার এই ভূমিকা নিয়ে বড় অস্বস্তি হচ্ছিল এবং মহা অস্বস্তি। কারণ সে জানে এই বাসে এমন সব যাত্রী আছে যারা ডেইলী প্যাসেঞ্জার সরকারী চাকুরীয়া কেউ মাস্টার কেউ কেরাণী। তাদের কেউ ভাবতে পারে "আমাদের স্যার অচ্ছা শিকারী তো।" তো পাশে পেয়েছেন, আচ্ছা শিকার!

আরও অভদ্র উক্তিও তারা চালু করে দিতে পারে, অমন ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা থেকে সে হাতটা সরিয়ে নিয়ে এল এমনভাবে অ্যাজ্ ইফ্ তার হাতটা টন্‌টন করছে।

বাস বিশ্রামগঞ্জে এসে থামল, যতটা সময় লাগা উচিত ছিল তার চেয়ে বেশিই লাগল। এখানে বাস কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে, ড্রাইভার কণ্ডাক্টার ও কিছু যাত্রীও চা খাবে, এখানকার রসগোল্লা বেশ বড় সাইজের।

শিবাশিসের ইচ্ছা করছিল সেও নেমে চা মিষ্টি খেয়ে নেয়। কিন্তু বৃষ্টির দরুণ তার নামতে ইচ্ছা করল না। তবু তাকে নামতেই হল, একটু ইজি হওয়া দরকার।

ইজি হওয়ার পরেই তার মনে হল অনেকক্ষণ সিগেরেট খায়নি, সঙ্গে সহ-যাত্রিনী ছিল বলেই সে সিগেরেট খায়নি, মেয়েরা সিগেরেটের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। শিবাশিসের ব্র্যাণ্ড হল চারমিনার—গাঁজার গন্ধ বললেই চলে। সে তো বলতে গেলে চেইন স্মোকার কিন্তু আশ্চর্য কি কারণে সে এতক্ষণ সিগেরেট খেল না? এতদিনকার নেশা যদি এক ঘণ্টার উপর দমন করতে পারল তবে কেন হাতের কনুই-এর নিস্‌পিসানি ক্ষণিকের নেশা সে দমন করতে পারল না? এমনি ভাবতে ভাবতে বিশ্রামগঞ্জের চায়ের দোকানে বসে একটা সিগেরেট সে শেষ করে গাড়ীতে এসে বসতে গিয়েই দেখল সহযাত্রিনী-নেই, বোধ হয় সেও চা এর জন্য কোন দোকানে গেছে, তবে 'জলসা'টি রেখে গেছে।

জলসাটির পাতা ওল্টাতেই জানা হয়ে গেছে মেয়েটির পরিচয়—নাম মলিনা চক্রবর্তী, অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার, উদয়পুর স্কুলের নামও উল্লেখ আছে।

ড্রাইভার-কণ্ডাক্টর আসতেই আবার গাড়ী চলতে থাকল।

এখন বৃষ্টি হচ্ছে না। তবে রাস্তা বড় পিচ্ছিল। এখন মলিনার চোখে ঘুমের আমেজ, গাড়ীর ঝাঁকানিতে তার মাথা হঠাৎ হঠাৎ ঠেকাতে লাগল শিবা-শিসের কাঁধে আবার তৎক্ষণাৎ চমকে উঠে সচেতন হতে চেষ্টা করে। কিন্তু আবার ঢুলুনিতে পর পর কয়েকবার।

শিবাশিসের দৃষ্টি জলসাতে নিবদ্ধ যেন নিশ্চিন্তে গল্প পড়ছে কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার অস্বস্তিই লাগছে।

হঠাৎ ব্রেক্ দেওয়ার ফলে গাড়ীটা থেমে গেল।

ব্যাপার কি? ব্যাপার আর কিছু নয় একটা বেড়াল আচমকা বাঁ দিক থেকে লাফ্ দিয়ে ডান দিকে চলে গেল।

এটা নাকি কোন অশুভ বা দুর্ঘটনার ইঙ্গিত। বেড়াল বা সাপ এমনি করে রাস্তা ক্রস্ করলে সব ড্রাইভারই গাড়ী থামিয়ে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট স্টার্ট বন্ধ করে স্টীয়ারিং ধরে বসে থাকে।

এই সংস্কার প্রায় সব ড্রাইভার মহলে, ভীতিও।

এর পর গাড়ী ঠিক ঠাক মত চললেও স্পীড তত নয়। এভাবে গাড়ী চলতে থাকলে এগারটার আগে গাড়ী কিছুতেই উদয়পুর পৌঁছোবে না। শিবাশিস্ ড্রাইভারকে বলল, "তুমি যখন ঘাবড়েই গেছ, তুমি বরং এখানে বস, স্টীয়ারিং আমাকে দাও"।

ড্রাইভার, "স্যার, আপনি গাড়ী চালাতে জানেন"?

শিবাশিস — "দেখ না কেমন চালাই"

শিবাশিসের দৃঢ়তাসূচক উক্তিতে ড্রাইভার সীট বদল। বদলী করতে দ্বিধা করল না। এবং শিবাশিষ কিছু দ্রুত গতিতে চালিয়েই গোমতী নদীর পারে এসে থামল বেলা সাড়ে দশটায়। ওপারে উদয়পুর।

সাধারণ নিয়মে বাস মারবোটেই এপার ওপার করা হয়। আজ করা হবে কিনা সন্দেহ। নদী কানায় কানায় ভর্তি, এখন বৃষ্টি না হলেও পাহাড়ের জলের তোড়ে নদীতে বন্যা। ড্রাইভার খবর নিতে গেছে। মারবোটে গাড়ী পারাপার হবে কিনা।

মলিনার অতক্ষণ অপেক্ষা করার সময় নেই, ধৈর্য্যও নেই, তাড়াতাড়ি স্কুলে পৌঁছতে না পারলে ক্লাশ নিতে পারবে না। তবে গাড়ী থেকে নামবার আগে সে শিবাশিসকে ধন্যবাদ দিল, "আপনি স্টীয়ারিং না ধরলে আজ আর স্কুলে হাজিরা হতো না, আমি নৌকোতে ওপারে যাচ্ছি।"

কিছু বলতে হয় বলেই শিবাশিসের উক্তি হল, "আজ *Rainy day*'র ছুটি এমনিতেই পাবেন।"

গাড়ীতে বসে থেকেই শিবাশিস মলিনার চলে যাওয়ার ভঙ্গীটা লক্ষ্য করল। পরিস্কার শাড়ী-ব্লাউজ পরে বাসে উঠেছিল, এখন ভিজে একাকার। শিবাশিসও ভিজেছে কিন্তু কষ্ট হচ্ছে মলিনার জন্য, ক্ষণকাল এই সুন্দরী তো তাকে বিস্মৃতিলোকে টেনে নিয়ে একটা ঘোর সৃষ্টি করেছিল। পকেট থেকে সিগেরেট বের করে একটা ধরিয়ে টানতে টানতে শিবাশিস ভাবতে থাকল মলিনা মেয়েটির সৌন্দর্য কি ফুল্লরার চাইতে কম? ওপর ওপর ভিন্নতর

হলেও ভেতরে তো একই উপকরণ ! তবে কেন সে ফুল্লরার কথা এত ভাবে ? প্রেমটা আসলে *First Come First Serve* এর মত। তবে ছন্দে মিললেও বিবাহ হয় না, প্রেম বা বিবাহ *by chance not by choice.*

ড্রাইভার ফিরে এসে জানাল বাস ওপারে যাবে না। অর্থাৎ শিবাশিসকেও নৌকোয় করেই ওপারে যেতে হবে।

গোমতী নদীর অবস্থা বর্ণনাতীত। এত স্রোতেও নৌকো চলাচল করছে। দড়ি বেঁধে যাত্রী সহ নৌকোকে বিপরীত দিকে নিয়ে তারপর নৌকোকে ছেড়ে দেওয়া হয়। নদীর ঢেউ-এর সাথে ক্ষিপ্রগতিতে মাঝিরা আপ্রাণ শক্তিতে দাঁড় টেনে ঐ পারে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যায়। যায় মানে একটু এদিক সেদিক হলে বিপর্যয় ঘটতে পারে, উল্টে যেতে পারে, তার মানে সর্বনাশ। ঘুর্ণি ঢেউতে পড়লে আর যাত্রীদের বাঁচতে হবে না।

এত বিপজ্জনক সত্ত্বে হাতে প্রাণ নিয়ে যাত্রীরা পারাপার হচ্ছে। মলিনার মত মেয়ে যদি সাহস পায় তবে শিবাশিসও পারবে। গাড়ী থেকে নেমে একজন কুলিকে পেয়ে শিবাশিস তার জিম্মায় হ্যাণ্ড ব্যাগ আর পোর্টফলিও দিয়ে সে নদীর পারে এসে দাঁড়াল। এখন এপারে কোন নৌকো নেই ওপার থেকে এলে তারপর শিবাশিসের যাওয়া হবে। অপেক্ষমান আরও কিছু যাত্রী।

নদীর অবস্থা ভীষণ। হঠাৎ হঠাৎ ঘুর্ণি এসে এসে পারের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে পারের মাটিও ধ্বসে পড়ছে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে ঢেউ এর সাথে বড় সড় একটা গাছ গুঁড়ি সমেত উল্টে পাল্টে মাঝনদী বরাবর যাচ্ছে। ঘুর্ণি তরঙ্গে একবার অতলে তলিয়ে অনেক দূরে গিয়ে ভেসে উঠছে। একবার হয়ত দেখা গেল গাছের অগ্রভাগ আবার ডুবে গিয়েই ফার্লং খানেক দূরে ভেসে উঠল গুঁড়ি। ঐ দেখে অনুমিত হয় কত বৃহৎ গাছ ভেসে যাচ্ছে। ভাল জাতের গাছ হলে নদীর পাশের বাসিন্দাদের পোয়া বারো। ওরা ঐ গাছকে ধরে আটকে ফেলে। অনেক সময় নদীর চরেই বিরাট বিরাট গাছ আটকে যায়। লোকেরা ঐ গাছ নানা কাজে লাগায়। লাকড়ির কাজে লাগে ডালপালা। গুঁড়ি দিয়ে তৈরী করে নানা জাতের আসবাব পত্তর।

ফরেষ্টের রয়েল্‌টি লাগাবার কথা নয়, কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির কিছু ফরেষ্টগার্ড নাজেহাল করতে চেষ্টা করে, এ গাছ পেলে কোথায় ? প্রমাণ কি নদীতে ভেসে যাওয়া গাছ ধরেছ ? এ ঢেঁকী কোথা থেকে আসল ?

বাসিন্দারাও জানে কি করে ওদের তুষ্টি সাধন করতে হয় ।

একটা ছেলেকে শিবাশিস দেখল এক বোঝা মুলি বাঁশের বোঝার উপর উপুড় হয়ে জড়িয়ে ধরে চলেছে নদীর তরঙ্গের সঙ্গে । নিমেষে চোখের সামনে থেকে কতদূরে চলে গেল ! এরা বিপদকে বিপদ ভাবে না । বরং এই বন্যাকে মনে করে আশীর্বাদ । পাহাড় থেকে বাঁশ কেটে জঙ্গল পথে আনতে অনেক পরিশ্রম তো বটেই সময় সাপেক্ষও । কাঁধে করে কত আর বোঝা বহন সম্ভব ?

গোছা করে বেঁধে ভেলার মত নদীতে ছেড়ে দিলেই স্বল্প সময়ে স্বস্থানে । পরিশ্রমও কম শুধু একটু বিপদের ঝুঁকি নেওয়া । নদীই পৌঁছে দেয় ঠিক মত । বিপদেরও সীমা নেই । এমন বিপদজ্জনক জীবন যাত্রায় ওরা অভ্যস্ত । পাকে চক্রে মরলেও অ্যাক্সিডেন্ট না মরলেও অ্যাক্সিডেন্ট, নিয়তি নির্ভর জীবন এদের ।

ওপার থেকে নৌকো এসে ভিড়ল । যাত্রীরা সবাই উঠেছে অতি তৎপরতার সঙ্গে শিবাশিসও কুলীর পিছু পিছু উঠল । অল্প বয়সী একটা বৌ কোলে বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে, শিবাশিস ভাবল বাচ্চাটাকে ধরবে নাকি, কিন্তু কিছু করতে যাবার আগেই পরক্ষণেই বাচ্চাসহ বৌটি এক লাফে নৌকোয় উঠতে এল । অহেতুক শিবাশিস দুশ্চিন্তা করছিল ।

হঠাৎ শিবাশিস দেখল মলিনা এই নৌকোয়, তবে অনেক দূরে নৌকোর ঐ পাশে সে । এগিয়ে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াবার উপায় নেই । মলিনা কেন অমনভাবে আগে চলে এল ? একটু কি অপেক্ষা করতে পারত না ? এক সাথে এলে কি এমন হতো ! আগে এসেই বা কি এমন লাভ হয়েছে ! সেই এক নৌকোতেই তো যাচ্ছে । একটু কাছাকাছি, পাশাপাশি অল্প স্বল্প বাক্য বিনিময় করলে কী এমন ক্ষতি হতো ! এড়িয়ে চলে এল কেন ? তবে কি শিবাশিস মলিনাকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি ?

এখন বৃষ্টি নেই। কিন্তু গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছে। ছাতা থাকলেও এতো লোকের মাঝে খুলতে পারেনি। তাই শাড়ীর আঁচল মাথায় দিয়েছে। মাথায় আঁচল দেওয়াতে ভালই লাগছে দেখতে।

শিবাশিস দেখেই যাচ্ছে, মেপে ঝুপে ক্রিটিক্যাল অ্যাঃ— মহিলা স্বাস্থ্যবতী, লম্বায় টেনে টুনে কত? পাঁচ ফুটের নীচে, ফাইন চুল, শ্যামলারঙ সব মিলিয়ে এ গার্ল অব সাবস্ট্যান্স, তার শারিরীক সৌন্দর্য সম্বন্ধে একটা বিশেষণই প্রযোজ্য চলেবেল্। জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোট মেলালেই ফুসফুস তার শরীরে আরামেরই ব্যায়ামই হবে। কিউপিড্ ভর করলে তো ভজখট্ট ব্যাপারও ঘটে যেতে পারে অনায়াসে।

হঠাৎ শিবাশিস সিরিয়াস হয়ে গেল। মলিনা থেকে দৃষ্টি ঘুরে গেল রাদার আগ্রহ হারাল। তার ফুল্লরা রয়েছে। সে যদি ধোঁকা দেয় তখন অন্য পাত্রীর কথা ভাববে। তখন নায়িকা বদল করলে দোষের হবে না।

ইতিমধ্যে নৌকো এসে ভিড়েছে উদয়পুরের ঘাটে। যাত্রীরা যে যার গাট্টি বোচ্কা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে পারে নামতে। আর যে তর সয় না, যাত্রীদের অমন হুড় মুড় ব্যস্ততায় নৌকোও দুলছে।

এমনি করেই অ্যাক্সিডেণ্ট হয়। হয়েছেও অনেক। কিন্তু কে কার কথা শোনে। অ্যাক্সিডেণ্ট হউক আর না হউক একটু ধীর স্থির ভাবে নামার কারোই ধৈর্য নেই।

তা যা হউক যাত্রীরা প্রায় সবাই নৌকো থেকে নেমে রাস্তায় গিয়ে উঠেছে। এতক্ষণে মলিনাও বোধ হয় রিক্সায় গিয়ে উঠেছে। শিবাশিস কুলীর পিছু পিছু রিক্সা স্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছেছে, কুলিকে তার প্রাপ্য মজুরি দিয়ে একটা রিক্সা ঠিক করে বসতে গিয়েই মনে হল আরও কয়েক প্যাকেট সিগেরেট কেনা দরকার। সিগেরেট কেনা হলেও ভাঙতি পয়সা পেতে দেরী হল।

রিক্সা চলতে সুরু করেছে। বাস ষ্ট্যাণ্ডে যাবে কি যাবে না করে শেষে ঠিক করল এখানকার অফিসেই যাবে একবার কিছু খোজ খবর নিতে।

বেলা প্রায় পৌনে বারটা। স্কুলের নানা বয়সের ছেলে মেয়েরা বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। বুঝতে কষ্ট হল না বৃষ্টির দরুণ স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। যাক্ মলিনাকে ভিজে কাপড় নিয়ে স্কুল করতে হলো না।

শিবাশিসের রিক্সো জগন্নাথ দিঘীর উত্তর পশ্চিম কোণে আসতেই গার্ল স্কুলের হেড্‌মিস্ট্রেস রীতাদির কোয়ার্টার রাস্তার পাশেই। রীতাদি শিবাশিসকে দেখে ফেলেছেন। না থেমে উপায় নেই। একটু বসে যেতে হবেই, উনি ছাড়বেনও না। তাছাড়া রীতাদির সঙ্গে তারও কিছু প্রয়োজন আছে, রীতাদির মারফতেই তো ফুল্লরার সঙ্গে শিবাশিসের যোগসাজস, ফুল্লরার শেষ কথাও ওনার মারফতেই জানতে হবে। সুতরাং রিক্সোওয়ালাকে থামতে এবং অপেক্ষা করতে বলে শিবাশিস নেমে পড়ল।

রীতাদি প্রশ্ন করলেন, "এমন বাদলার দিনে কোথায় চল্লেন ?

শিবাশিস জানাল, "অমরপুর যাব তদন্তের কারণে।"

রীতাদির মন্তব্য হলো, "আর দিন পেলেন না। ইস্ একেবারে ভিজে গেছেন, খাওয়া দাওয়া করেছেন ?"

শিবাশিস, "খেয়ে দেয়েই বেরিয়েছিলাম তবে গাড়ীর ঝাঁকুনিতে কি ওগুলু আর পেটে আছে ?"

রীতাদি ফ্যানটা ফুল স্পীডে দিয়ে, "একটু বসুন, ফ্যানের হাওয়ায় জামা কাপড় শুকিয়ে নিন। বেশিক্ষণ লাগবে না চা খাবার তৈরী করতে"

বলেই উনি ভিতরে গেলেন ব্যস্ততার ভঙ্গীতে।

চা খাবার নিয়ে যে পাত্রীটি এল শিবাশিস যেমন বিস্মিত হল তেমনি উল্লসিত হল। আরে এ যে সেই মলিনা, হাসিটা অর্থবহ কিছু না হলেও অনেক কিছু বলে দেওয়ার হাসি। স্বতঃ উৎসারিত প্রীতির দৃষ্টি।

জার্নির দরুণ ভিজে কাপড়ে যেমন দেখাচ্ছিল মলিনাকে এখন সে ভিন্ন রকম, নতুন পোষাকে তাকে নতুনই লাগছে, বসনের তলে ভরাট বুক চোখ টানে। অর্থাৎ মলিনাকে পছন্দের তালিকায় রাখা চলে। নট্ ব্যাড্।

শিবাশিস নিজের মতো করেই তাকে দেখল। প্রথমে হাল্কা শিহরণ সঙ্গে সঙ্গে রীতাদির কথা ভাবতেই স্পন্দন পাল্টে গেল। রীতাদি যদি একবার টের পান তবে আর উপায় থাকবে না, যা মুখরা রীতাদি! হয়ত বলেই বসবেন, "একটাতে স্টিক থাকতে পারেন না? আবার ওর দিকে দৃষ্টি কেন? এমন যদি স্বভাব হয় তাহলে ফুল্লরাকেও হারাবেন।"

ফুল্লরাকে না পেলে শিবাশিসের অবস্থা যে কি হবে কল্পনাই করতে পারে না সে। অনেকদিন অবিবাহীত থেকে থেকে এখন তার যাকে দেখে তাকেই ভাল লাগে। শরীরে তীক্ষ্ণ বন্যতা থাকলেই হলো। পজিশনের কারণে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে অস্থির চঞ্চল। নিজেই বুঝতে পারে চরিত্রটা তার স্বাভাবিক নয়। এই অস্থির চঞ্চলতা দূর হবে যদি ফুল্লরাকে সে পায়। কিন্তু ফুল্লরা এমনই এক পাত্রী বড় গড়িমবী করছে। মুখে বলে "এত তাড়াহুড়োর কি আছে?" হবে হবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে"—রকম বেরকমের হরেক রকমের আশ্বাস। আশ্বাসে বিশ্বাস নেই, হতাশ্বাসই সার।

সেই কারণেই তো শিবাশিসের বড় সন্দেহ ফুল্লরার তনু মনে স্বামীর জায়গাটা শিবাশিসের কপালে জুটবে কি জুটবে না। অনেক যদি কিন্তুতে ভরা।শেষ পর্যন্ত হয়ত ফুল্লরাকে ছেটেই ফেলতে হবে।

রীতাদি এই সময় আরও কিছু খাবার নিয়ে এলেন। মাছ ভাজাআর পুডিং। রীতাদির আতিথেয়তা বরাবরই বড় মাপের। খেতে খেতে শিবাশিস চোখ বুলিয়ে নিল মলিনা কাছাকাছি আছে কিনা, যখন বুঝল নেই তখন সে বলল, "আপনারা স্বামী স্ত্রী পীড়াপীড়ি করলেন আমিও রাজি হয়ে গেলাম ফুল্লরাকে বিয়ে করতে। কিন্তু ফুল্লরার হাল চাল আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। সে আপনাকে কিছু বলেছে?"

রীতাদি ঃ—"এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ফুল্লরার মায়ের সঙ্গে আলাপ করেছি, বড় ছেলে এলে তার সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে জানাবেন বলেছেন। এসবে একটু সময় লাগেই। আর সব তো আমার হাতেও নয়। একটু ধৈর্য ধরুণ।"

শিবাশিস ঃ—"ধৈর্য তো ধরেই আছি, তবে ফুল্লরাকে বলে দেবেন সে যদি নির্বিকার থাকে, হয়ত এর পরে আমার সম্পর্কে অন্য খবর শুনবেন। বিয়ে করব যখন স্থিরই করেছি আমি যত তাড়াতাড়ি পারি তা সেরে ফেলতে চাই। ফুল্লরা যদি দ্বিমত করে এবং স্পষ্টমত ব্যক্ত না করে আমিও আর অপেক্ষা করব না। তার পিছু ধাওয়াও করব না।"

শিবাশিসের বক্তব্যে রীতাদির দৃষ্টি স্নিগ্ধ। ব্যক্তিগতভাবে উনি প্রেম করে বিয়ে করেছেন। সেই ছবি হয়ত উনার মনে ভেসে উঠেছে, তাই বোধ হয় মায়া হল শিবাশিসের ব্যাকুলতায়। তাই তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, "আচ্ছা ঠিক আছে, এবার আগরতলায় গিয়ে ফুল্লরার সাথে শেষ বোঝা পড়া করে আমি আপনাকে জানাব।"

রীতাদির কথায় আশ্বস্ত হয়ে, বিদায় নিয়ে শিবাশিস আবার রিক্সায় উঠল। প্রথমে তাকে যেতে হবে উদয়পুর অফিসে। বৃষ্টি আবার পড়তে শুরু করেছে। শিবাশিস অনুমান করতে পারে এই আবহাওয়ায় আজ আর কোন জীপ অমরপুর যাবে না। তাকে আজ উদয়পুরেই রাত কাটাতে হবে।

কোথায় উঠবে? আগে তো একবার উদয়পুর অফিসে যাওয়া যাক তার পর ভাবা যাবে, না হয় ডাক বাংলোয় গিয়ে উঠবে।

অফিসে পৌঁছতেই শিবাশিসকে দেখা মাত্রই একজন কেরাণীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের চেম্বারে ঢুকে খবর দিতেই সীতাকান্ত দাস বেরিয়ে এসে 'নমস্কার স্যার' করে স্বাগত জানাল। শিবাশিস রিক্সাওয়ালাকে বিদায় করে এক হাতে ছাতা অন্য হাতে ফোলিও ব্যাগ নিয়ে চেম্বারে ঢুকে একটা চেয়ারে বসতে যেতেই মি: দাস তার নিজস্ব চেয়ারটা দেখিয়ে, "এই চেয়ারে বসুন স্যার।" শিবাশিস বলল, "ঠিক আছে, আপনার চেয়ারে আপনিই বসুন, "দ্যাট ইজ মেণ্ট্ ফর ইউ।"

ছোট চামড়ার হ্যাণ্ড ব্যাগটার কথা শিবাশিস ভুলে গিয়েছিল কিন্তু রিক্সাওয়ালা ওটা একজন পিয়নকে দিয়ে গেছে। সেই পিয়ন ব্যাগটা ভিতরে রেখে গেল শিবাশিসের পায়ের কাছে।

মিঃ সীতাকান্ত দাস হবেন একজন *Non gazetted officer*. সাধারণ নিয়মে উদয়পুর অফিসের চার্জ থাকে একজন *gazetted* অফিসারের উপর। আজ অনেক মাস হল এখানে কোন অফিসার নেই, মিঃ দাসই চার্জে আছেন। তাই ভাবতে শুরু করেছেন উনিই হয়ত শেষ পর্যন্ত প্রমোশন পেয়ে এই অফিসের পুরো চার্জ ম্যান্ হবেন। একটা *claim* তো হয়েছে! তাই চালচলনে কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

চাকরির প্রথম দিকে এই দাস কিছুদিন শিবাশিসের অধীনে কাজ করেছে। প্রায় বছর তিনেক ডাইরেক্ট টাচে নেই।

কথা বলতে বলতে শিবাশিস সিগেরেটের প্যাকেট পকেট থেকে বের করতেই সীতাকান্ত তার টেবিলে রাখা সিগেরেট প্যাকেট ও ম্যাচ-বাক্স এগিয়ে দিতে দিতে বলল, "এটা থেকে খান্ স্যার।"

শিবাশিস তাই করল। সীতাকান্তকে সিগেরেট ও ম্যাচ বাক্স ফেরত দিতেই সে ওগুলু হাতে নিয়ে নাড়া চাড়া করছে এমন ভাবে-"স্যার যদি কিছু মনে না করেন আমিও একটা টানি"-এমনই ইতস্ততা।

শত হলেও শিবাশিস হেড্ অফিসের একজন অফিসার। সম পর্যায়ের অফিসার না হলেও নিজস্ব চেম্বারে বসে সিগেরেট না খেতে পারলে কী চার্জ অফিসার!

শিবাশিস সীতাকান্তর হাব ভাব বুঝতে পারে তাই সে অনুমতির ঢঙেই বলে, "নিন্ না একটা, খাবার জিনিষ খাবেন অত ইতস্তত কেন?"

শিবাশিস ভাবল বেয়াদপি বা *insulordination* এর ভাব দেখিয়ে ধোঁয়া টানার চাইতে *permission* দিয়ে দেওয়াই ভাল। এতে পদমর্যাদার দুরত্ব কমে যায় না।

সীতাকান্ত *permission* পেয়ে কৃতজ্ঞ চিত্তে একটা সিগেরেট ধরাল। তারপর বলল, "আজ তো স্যার আপনার অমরপুর যাওয়া হবে না। এই অসময়ে কোন গাড়ীও যাবে না। গেলেও মহারাণী পর্যন্ত, সেখানে রাত কাটাবার জায়গাও নেই…

সীতাকান্তর বলা শেষ হওয়া আগেই তাহলে ডাক-বাংলোয় টেলিফোন করে দিন আমার থাকার জন্য

সীতাকান্ত ঃ "না স্যার, ডাকবাংলোয় থাকতে হবে না, আমাদের একটা কোয়াটার খালি আছে. আপনার ব্যবস্থা সেখানেই করে দিচ্ছি। আপনার কোন অসুবিধে হবে না, একজন পিয়ন আপনাকে *attend* করবে রাত্রিরে কিন্তু স্যার আমার বাসায় ডাল ভাত খাবেন।"

শিবাশিসঃ "সে দেখা যাবে, তবে খবর নিন কাল অমরপুরে গাড়ী যাবে তো ?"

ইতিমধ্যে আবার চা মিষ্টি এসে গেল। রীতাদির ওখানে বেশ ভারী টিফিন খেয়ে এসেছে, আর খেতে ইচ্ছা করছিল না। তাই শিবাশিস বলল, রাতে যখন আপনার সঙ্গে খাব এখন আর এসব খাব না শুধু চা নিচ্ছি।

অফিসেরই একজন পিয়ন রথীন এই সময় ঘরে ঢুকতেই সীতাকান্ত তাকে নির্দেশ দিল নির্দ্দিষ্ট আস্তানায় শিবাশিসের জিনিষ গুলু গিয়ে ওনার থাকার সুব্যবস্থা করতে।

শিবাশিস ও ভাবল অমরপুর যাওয়া যখন আজ হচ্ছেই না, নির্দিষ্ট আস্তানায় গিয়ে জামা কাপড় পাল্টে একটু ফ্রেস্ হওয়াই ভাল, একটু ঘুমিয়ে নিলে ক্লান্তি ও দুর হবে.

দুই রুমে দুটো খাট্, একটাতে বিছানা পাতাই আছে। আর একটাতে রথীন বিছানা পেতে দিল।

উদয়পুরেরই একটা স্কুলের হেডমাস্টার অন্য ঘরে আপাতত আছেন। নাম সুদর্শন গোস্বামী বয়স উনষাট রিটায়ার করার পর এক্সটেনশন আছেন। শিবাশিসের চেনা। শিক্ষিত সংলোক।

সুদর্শনবাবুও এসে গেছেন। নমস্কার বিনিময়ের পর কিছুক্ষণ কথা বার্তা হল। কিন্তু সুদর্শন বাবুর অন্যত্র কোথায় যাওয়ার তাড়া ছিল তাই শিবাশিস একটা বই নিয়ে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন জাগল চোখ মেলেই দেখে সীতাকান্ত একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছে. শিবাশিস ঘড়ি দেখল সময় রাত সাড়ে আট।

মহকুমা শহর তার উপর বাদলার দিন। চারিদিকে অন্ধকার।

সীতাকান্তর বাড়ীতে আয়োজন যথাযথের চেয়ে বেশি। পরিমাণ ও বেশি প্রকাণ্ড মাছের পেটি। তেল কই এর ঝাল বড় সড় বাটীতে মাংস-ফাইন চাল।

সবই খেয়েছে শিবাশিস। এর পরেও আবার আম, তৎসঙ্গে ক্ষীর। লোভে পরে তাও খেল শিবাশিস. তারপর বসা থেকে উঠতে উঠতে সীতাকান্তর স্ত্রীর পানে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা মিসেস দাস অতিরিক্ত ভোজনে কারও পেট ফেটেছে এমন শুনেছেন কখনও? কাল শুনবেন ঘুমের মধ্যে আমার পেট ফেটে চৌচির।"

মিসেস্ দাস শিবাশিসের কথায় তার সম্মুখে হাসতে না পেরে মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চেপে সরে যেতেই সীতাকান্ত বলল, "স্যার যে কি বলেন!"

আস্তানায় যখন শিবাশিস ফিরল রাত তখন দশটা। সুদর্শনবাবু তখনও শুয়ে পরেননি। বৃষ্টি এখন নেই, তবে আকাশে একটিও তারা নেই, রাত্রিরে বৃষ্টি হতে পারে।

সুদর্শনবাবুর সঙ্গে মামুলী কিছু কথার পরে শিবাশিস শুয়ে পড়ল, শুতে না শুতেই রাতটা পার হয়ে গেল। মাঝরাতে একবার ঘুমের ঘোরে মনে হয়েছিল জোড় বৃষ্টি হচ্ছে। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে আরও কি যেন শব্দ। তখন রাত প্রায় শেষ সাড়ে চারটা-শব্দটা সুদর্শন বাবুর নাক থেকে বেরোচ্ছে। কী সাঙ্ঘাতিক শব্দই না সুদর্শন বাবুর নাকের! কী করে ঘুমোল শিবাশিস? এই মনে হচ্ছে জীপ প্রথম গীয়ারে, পর মূহুর্তে যেন রান ওয়েতে এরোপ্লেন টেক্ অফ্ নেওয়ার আগ মূহুর্তের প্রস্তুতি নিয়ে বিকট শব্দে স্পীড্ তুলছে। আবার কিছুক্ষণ টেক্-আউট-অর্থাৎ ভেতর থেকে প্রশ্বাস অপসৃত হওয়ার শব্দ, মাঝে মাঝে ঘড় ঘড় শব্দ।

এ অবস্থায় ঘুমের আমেজ নিয়ে শুয়ে থাকা শিবাশিসের পক্ষে অসম্ভব। শিবাশিসের ইচ্ছা করে সুদর্শন বাবুকে ডেকে জাগায়। তা থাক্ উনি ঘুমোন।

এদিকে বৃষ্টি পুরোদমে। এমন চলতে থাকলে আজও বোধহয় শিবাশিসের অমরপুর যাওয়া হবে না।

কিছুক্ষণ বাদে সুদর্শন বাবুও উঠে গেলেন, শিবাশিস গুড্‌মর্নিং করে জিজ্ঞেস করল, "আপনার কিন্তু খুব গভীর ঘুম, তবে নাক ডাকেন। আচ্ছা আমিও কি নাক ডাকছিলাম ?"

সুদর্শন বাবু জানালেন, "আমার মত না ডাকলেও আপনিও নাকে ডাকেন স্যার।"

মনটা শিবাশিসের খারাপ হয়ে গেল। ফল্গুরা জানতে পারলে কি ভাববে কে জানে। বিয়ের পর পাশাপাশি শুলে এমন আবৃত্তি কি সে পছন্দ করবে ? কি করলে নাক ডাকা বন্ধ করা যায় ? ফল্গুরা যে ধাঁচের মেয়ে নাকের ডাক শুনলে হয়ত ঘুমের মধ্যেই জোর চিমটি কেটে তাকে জাগিয়ে দেবে। মুখে ধমকও দেবে, "এমন নাক ডাকলে এক বিছানায় নয়. এক ঘরেও না, সর সর সর বলছি ওঘরে গিয়ে শো-ও গে।"

মনের কল্পিত ভাবনা নিয়ে বিছানাতেই সে সোজা হয়ে বসল, আগরতলায় ফিরে গিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। চেষ্টা করলে কি নাক ডাকা বন্ধ করা সম্ভব নয় ?

সুদর্শন বাবু জানতে চাইলেন, "স্যারের কি বেড্ টির অভ্যেস আছে ?"

শিবাশিস জানাল, "আছে তবে কি ভাবে ব্যবস্থা করবেন ?"

"সে ব্যবস্থা আমার ঘরেই করে থাকি-স্টোভে জল গরম হচ্ছে।" বলেই সুদর্শনবাবু ভিতরে গেলেন এবং খানিক বাদে দুহাতে দু কাপ চা নিয়ে একটা শিবাশিসের হাতে দিয়ে অপরটা নিয়ে চেয়ারে বসলেন।

চায়ে চুমুক দিয়ে শিবাশিস জানতে চাইল, "আর কতদিন আপনার এক্সটেনশনের মেয়াদ ? ছেলে মেয়ে কয়টি ? তারা কে কি করছে বা পড়ছে ?"

সুদর্শন বাবু জানালেন, "আর মাত্র মাস চারেক নতুন ব্যবস্থায় আর, এক্সটেনশন বা রিএম্প্লয়মেন্ট পাবেন কি না সন্দেহ, তাই বড় চিন্তিত। ছেলে তিন, মেয়ে চার। মেয়েরা চারজনই বিবাহ যোগ্যা, ছেলেরা এখনও কেউ

কাড়ীয়াননি মেয়েদের বিবাহের ব্যাপারে বড় উদ্বীগ্ন, পাত্র নির্বাচনেও সমস্যা। অর্থাভাব অবসরান্তে কিভাবে সংসার চালাবেন ভেবে কূল পাচ্ছেন না। নিজের একটু বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা, কিন্তু সংসারের নানা ঝামেলায় ও আর হয়ে উঠবে বলে মনে হয় না। পাশের টেবিলে শিবাশিস একটা গ্রন্থও দেখল কানু প্রিয় গোস্বামীর "চৈতন্য চরণামৃত।" শিবাশিস ঐটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে যেতেই সুদর্শন বাবুর মন্তব্য হল, "আপনার এখনও এসব নিয়ে পড়াশোনার সময় হয়নি।"

সত্যি তাই, নাড়া চাড়া করতে গিয়ে উপক্রমণিকায় চোখ বুলিয়েই শিবাশিস রেখে দিল। রেখে দিল বটে তবে তাকে অন্য ভাবনায় পেয়ে বসল। সুদর্শনবাবুও তো এক কালে যুবক ছিলেন। বিয়ের পরে এত সন্তানের বাপ হয়ে এখন যে টেনশনে ভুগছেন তার উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। তখন যদি একটু ভাবতেন বেশি সন্তানের বাপ হলে মুস্কিল আছে। ভাবেননি তাই এখন পস্তাচ্ছেন।

অমন ভাবনার সঙ্গে শিবাশিসও মনে মনে ঠিক করল সে বিবাহ করলেও যাতে তাকে অত সন্তানের দায় বহন করতে না হয় তেমন সতর্কতাই নিতে হবে।

সুদর্শনবাবু প্রাতঃকৃত্যাদি সারতে গেছেন। তাকেও সারতে হবে। কিন্তু সুদর্শনবাবু বাথরুম থেকে না বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। এই ফাঁকে শিবাশিস তার ব্যাগ থেকে রীতাদির কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া উল্টোরথটা উল্টোতে থাকল। রীতাদিকে বলে এসেছে ফেরার পথে দিয়ে যাবে। বোর্ডিং এর মেয়ে শিক্ষিকাদের এই উল্টোরথটি। মলিনার গন্ধ হয়ত পাওয়া যাবে এই বইটিতে, তাই নিয়ে এসেছে। কিন্তু এতে মলিনার নাম গন্ধও নেই।

রথীন সকাল সাতটার আগেই আসবে অমরপুরে গাড়ী যাবে কিনা খবর নিয়ে। তার আগেই শিবাশিসকে তৈরী হয়ে থাকতে হবে।

সুদর্শনবাবু বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে চর্চা করতে চাইলেও বড় কৌতুহল ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য ঘোষিত হওয়ার ফলে কি কি পরিবর্তন হতে পারে বা হবে তা নিয়ে আলাপ করতে চান শিবাশিসের সঙ্গে।

ত্রিপুরায় মন্ত্রী-সভা হয়েছে এটা যেন কল্পনাতীত সুদর্শনবাবুর কাছে। তাই উনি শিবাশিসের কাছে জানতে চান, "এই পরিবর্তনটা কি ভাল হল স্যার।"

উত্তরে শিবাশিস শুধুমাত্র বলল, "দুই শাসন ব্যবস্থা থেকে তো রক্ষা পেয়ে গেছি! একদিকে অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন অপরদিকে টেরিটোরিয়্যাল কাউন্সিল--দুই তরফের টানাপোড়েন ঠেলাঠেলি তো গেল, এখন আমরা সবাই এক শাসনতন্ত্রের জুরিস্‌ডিকশনে—এটাই আসল পরিবর্তন, বাকীটা ভবিষ্যৎ প্রমাণ দেবে।"

এই সময় পিয়ন রথীন এসে খবর দিল, অমরপুরে একটা জিপ যাবে। ওদের প্যাসেঞ্জার হয়ে গেলেই ওটা ছেড়ে দেবে।

খবর দিয়েই রথীন বলল, "আপনি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন স্যার, আমি বরং গিয়ে আপনার জন্য সামনের সীটটা দখল নেই গে।"

শিবাশিস —"তাই যাও তবে এই হ্যাণ্ড ব্যাগটা নিয়ে যাও আমিও এলাম বলে।"

রথীন চলে যেতেই সুদর্শনবাবুর সঙ্গে আর কোন কথা নয়। তাড়াতাড়ি স্নানাদি সেরে পোষাক পড়ে শিবাশিসও তড়িঘড়ি একটা রিক্সোয় চেপে মোটর স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে গেল।

জীপ ছাড়বে ছাড়বে, কেবল শিবাশিসের জন্য অপেক্ষা করছে। এখন বৃষ্টি নেই তবে আকাশের অবস্থা দেখে মনে হল বৃষ্টি হতেও পারে।

কিন্তু জীপে জায়গা কৈ! ছেলে, বুড়ো, জোয়ান, মেয়ে মানুষ নিয়ে পনর থেকে বিশ জন যাত্রী। জীপের সামনের সীটেই দুই ভদ্রলোক সব জায়গা দখল করে বসে আছেন। দু'জনারই দেহ স্থূলত্বের দিকে—মেদবহুল স্বাস্থ্য। দেখতে দুজনই সুপুরুষ। অন্যত্র দেখলে এদের দুজনকেই শিবাশিসের ভাল লাগত। কিন্তু এই স্বল্প পরিসর জায়গায় ওদের দেখে শিবাশিসের মন খারাপ হয়ে গেল। তার নিজের স্বাস্থ্যও ভগবানের দয়ায় মেদহীন হলেও বপুষ্মান্‌। শিবাশিস ভাবছে রথীন কি জায়গা করল? ড্রাইভার শুধু বলল, "কষ্ট করে উঠে বসুন স্যার," বলেই ঐ দুই ভদ্রলোকদের পানে চেয়ে, "একটু সরে আসুন স্যার।"

শিবাশিস বুঝে ফেলল ওরা দুইজনও সরকারী কর্মচারী। না হলে ফ্রণ্ট সীটে কেন? অনিচ্ছা সত্ত্বেই যেন ওরা সরে গিয়ে একটু জায়গা করে দিল। শিবাশিস

ডান পা পাদানিতে রেখে বাঁ পা ভিতরে ঢুকিয়ে কোন মতে বাটক্‌স্‌-এর ওয়ান থার্ড সীটে রাখল। ছাতাটা নিয়েই যত অসুবিধে, বনেটের উপর তুলে ধরে থাকল, বুঝে ফেলল বৃষ্টি হলে তাকে ভিজতে হবেই।

পাশের ভদ্রলোকের রং তামাটে আর ওনার পাশের জন ফর্সা। সহযাত্রী হিসেবে এদের গ্রহণ করতে শিবাশিসের আপত্তি নেই।

গাড়ী চলতেই পেছন থেকে এক ছোকড়া বলে উঠল, "যাত্রী বেশী হলে গাড়ী চলে ভাল ঝাকানি টের পাওয়া যায় না।"

তামাটে ভদ্রলোক শিবাশিসকে প্রশ্ন করে জানতে চাইল, "আপনি অমরপুরে গিয়ে মজুমদারের আস্তানায় উঠবেন তো?"

প্রশ্ন শুনে শিবাশিসের মনে হল তামাটে ভদ্রলোক শিবাশিসের পরিচয় জানেন, উত্তরে সে জানাল, "গুপ্ত যদি স্টেশনে থাকে তবে তার সেখানেই উঠব।" তারপর সে প্রশ্ন করল, "আপনি অমরপুরেই থাকেন বুঝি?" উত্তরে জানাল "আজ্ঞে হ্যা আমি অ্যাগ্রিকালচারে আছি।" এবার ফর্সা ভদ্রলোকর পানে তাকিয়ে শিবাশিস বলে, "আপনাকে যেন আগেও কোথায় যেন দেখেছি কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না। কোথায় দেখেছি।"

ফর্সা উত্তর দেন, "আমি পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করি এস্ আই, এই প্রথম অমরপুরে যাচ্ছি বদলী হয়ে।"

এবার শিবাশিস হেসে বলল, "যাক্ বাঁচালেন, ওভার লোডের কারণে গাড়ী আর কেউ আঁটকাবে না, আপনি আছেন।"

ফর্সা মুচকী হেসে জবাব দেন, "ওভারলোডের কথা তো নয় আপনি যে ভাবে বসেছেন যেতে পারবেন? বড় বিপদজনক রাস্তা।"

শিবাশিস পাল্টা বলে, "সে জন্যে ভাববেন না, গাড়ী ২/১ বার একাৎ-ওকাৎ হলেই দেখবেন আমার ডান পা ও ভিতরে ঢুকে যাবে আপনারা টেরও পাবেন না, এমন যাত্রা আমি অনেক করেছি, এ তো ভাল, পাটের বোঝাই টাকে আমি আসাম

আগরতলা রোডে কৈলাসহর গেছি। ইদানীং না হয় বাস সার্ভিস হয়েছে, কয়েক বছর আগে মালবোঝাই ট্রাকই ছিল সম্বল অনেক সময় পাট বোঝাই ট্রাক চলছে তো চলছে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, কিন্তু পড়ে যাইনি। অমন ভাবে আমাকে চাকুরির প্রথম দিকে জার্নি করতে হয়েছে, ঢের বছর হয়েও গেল, চাককরি কি মরসে চলবে? আমাকে কষ্ট করেই বেঁচে থাকতে হবে।

জীপ খানিক চলেই এসে থামল বি, ও, সি, পাম্পিং স্টেশনে। ১০ লিটার পেট্রোলের হুকুম দিয়ে ড্রাইভার সীটেই বসে থাকল।

ছোকড়া হ্যাণ্ডিম্যান বয়স খুব জোড় ১২/১৪, এই বয়সেই গাড়ীর কাজে ঢুকেছে। সে একটা *container* এ পেট্রল এনে ট্যাঙ্কে পেট্রল ভর্তি করল। তারপর ছোট একটা বালতি এনে ডান পাশে রাখা অর্দ্ধেক সাইজের একটা ড্রাম থেকে জল নিতে গেছে তো তড়িৎ গতিতে একটা সরু লিক্‌লিকে জিংলা বোড়া সাপ রাস্তার বাঁ পাশে চলে গেল। ছোকড়া সাপ সাপ বলে চিৎকার দিতেই গাড়ীতে বসে থেকে শিবাশিসরা সবাই দেখল সাপটি অদৃশ্য হল ডান পাশের নর্দমায়।

ঐ দেখে পুলিশ ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, "যাক্ লক্ষণ ভাল যাত্রার প্রাক্কালে ডান দিকে সর্পদর্শন শুভ। আমরা নিরাপদেই পৌঁছে যাব গন্তব্য স্থলে।"

ছোকড়ার রেডিয়েটরে জল দেওয়া হয়ে যেতেই জীপ পুনরায় চলতে সুরু করল।

ইতিমধ্যে তামাটে ও ফর্সা ভদ্রলোকদের সঙ্গে শিবাশিসের কথা বার্তায় স্বাচ্ছন্দ্য এসে গেছে। তাই সে পুলিশ ভদ্রলোকের মন্তব্যের উত্তরে স্বভাব সুলভ স্বরে বলল, "দেখুন শুভাশুভের প্রবাদ বাক্যও আজকাল বড় মেলে না তারও প্রমাণ পেয়েছি :—গাড়ীতে উঠতে যাব তৎমুহূর্তে কে যেন পেছন থেকে হেঁচে দিল, আবার কোন দিন যাত্রা মুহূর্তে যেই ঘর

থেকে বের হবো হচ্ছি, সামনে গাছের ডালে একটা কাক কা কা করতে থাকল এক নাগাড়ে। বাড়ির লোকেরা বলল একটু থেমে দাঁড়িয়ে যাও, আমি মানলাম না। বাড়ীর লোকেদের মন খারাপ হয়ে গেল আমার অমন অমান্যতা সূচক আচরণে তাদের বড় ভয় পথে যদি কোন বিপদ হয়? আশ্চর্য, কোন বিপদ তো হয়-ই-নি। সুস্থ শরীরেই ফিরে এসেছি। ঘোর মঘাতেও বাড়ী থেকে বেরিয়ে অনেক বিপদ সঙ্কুল অঞ্চলে কাজ সেরে ফিরে এসেছি নিরাপদে।

উল্টোটাও শুনুন ঃ বেলপাতা শুঁকে, গুরুজনদের ভক্তি করে দেব-দেবীর সব ছবি ছুঁয়ে প্রণাম করে দুর্গা দুর্গা করে বেরিয়েও সারা পথে নানা দুর্ভোগে ভুগেছি। কোন যাত্রায় এমনও হয়েছে ঘর থেকে বেরিয়েই হৃদয় ছোঁয়া, মধুর হাসিনি সুন্দরীকে দেখে মনের ফুর্তিতে যাত্রা করেছি, কিন্তু পথে যে গাড়ীতে উঠেছি সেই গাড়ীই বিগড়ে যেতে থাকল, কোনটার টাই রড খারাপ হল, কোনটার অ্যাক্সল্ ভেঙ্গে গেল, আর একটার টায়ার ফেটে গেল, শীতের মধ্যে মাঝ রাস্তার হেস্ত নেস্ত-সেই হৃদয় ছোঁয়া গন্ধর্বাণ দর্শনের বিচিত্র ফল অনেক দিন মনে থাকার মতই ঘটনা, আসলে যা হবার হয়…

জীপ টাল খেতে খেতে চলেছে। এর মধ্যে শিবাশিসের ডান পা পাদানি থেকে ভেতরে ঢুকে গেছে। পুলিশের ভদ্রলোক লক্ষ্য করেছেন হেসে বললেন, "ম্যানেজ হয়ে গেল"।

শিবাশিসও হাসল, "আগেই তো বলেছিলাম ম্যানেজ হয় যাবে"।

জীপ আঁকা বাঁকা রাস্তায় বার বার গীয়ার চেঞ্জ করছে। রাস্তার বাঁক ঘুরতে একবার ডান দিকে কাৎ পরমূহূর্তে বাঁদিকে কাৎ। যাত্রীরাও সন্ত্রস্ত-সতর্ক হয়ে নিজেদের সামালাচ্ছে—যে যার ভাবে।

জীপ একবার সোজা নেমে যাচ্ছে আবার গীয়ার চেঞ্জ করে বিকট শব্দে উপরে উঠছে। রাস্তার পাশে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খাবে খাবে, এই বোধ হয় খেল—দক্ষ ড্রাইভার ক্ষিপ্রগতিতে স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে সামলে নিল।

পেছনের একটা ছেলে বলে উঠল, "এতক্ষণে চার টাকা উঁসুল হলো"।

উদয়পুর থেকে অমরপুর গাড়ীর ভাড়া চার টাকা। ছেলেটি মাত্র দু'মাইল চড়েই বলছে চার টাকা উ'সুল' বাকী পথ কি তবে ফাউ ?

রাস্তায় কাজ হচ্ছে, নতুন ডিপুটী-মিনিষ্টার পরিদর্শনে অমরপুর যাবেন বলে কথা শোনা যাচ্ছে, তাই অ্যাম্‌ব্যাস্যাডর গাড়ী চলার মত রাস্তাও সাজাতে হবে যাতে মিনিষ্টারের গাড়ী না আঁটকায়।

জীপ এবার সমতলে পড়েছে। সমতলটা পেরোলেই আবার বাঁক, বাঁকের আগেই দেখা গেল রোগাটে কালো রংএর এক যুবক, হাত দেখাতেই জীপ থামল। শিবাশিসের মনে হলো একেও ড্রাইভার গাড়ীতে তুলে নেবে। কিন্তু জায়গা কোথায় ?

জীপটা লেপ্ট-হ্যাণ্ড ড্রাইভ। ড্রাইভারের ধারে আরও একজন দেহের অর্দ্ধেকটা ঝুলিয়ে কোনরকমে যাচ্ছে। আশ্চর্য জীপ থামতেই ঐ যুবক শিবাশিসের সম্মুখে বনেটের উপর অক্লেশে উঠে বসল। বাংলা শুনে মনে হল মদ্রদেশীয়। পুলিশের ভদ্রলোক ড্রাইভারকে প্রশ্ন করে জেনে নিল যুবকটির পরিচয়। ওভার-সীয়ার কেরালার বাসিন্দা। বাঙ্গালী কুলীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাংলা শিখে গেছে, তবে স্থানীয় বাংলা।

জীপ প্রথম গীয়ারে উপরে উঠছে, বাঁকের কাছে এসেই জীপ আবার থামল। ডান পাশে পাহাড়, বাঁয়ে খাদ। বৃষ্টির দরুণ পাহাড়ের স্লিপ পড়াতে রাস্তা বন্‌ধ। কুলীরা স্লিপের ঘাটী সরাচ্ছে। ওভারসীয়ার যুবকও তাড়া দিচ্ছে। তাড়ায় অল্পক্ষণেই জীপ চলার মত প্যাসেজ হয়ে গেল, তবে ফোরহুইল লাগবে। ছোকড়া হ্যাণ্ডিম্যান লাফিয়ে নেমে পড়েছে। বেশ চটপটে ছোকড়া।

এতক্ষণে শিবাশিস পুলিশের এবং অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টে দুজনারই নাম জেনে ফেলেছে ওদের কথা বার্তায় পুলিশের ভদ্রলোকের নাম শান্তি শেখর ভট্টাচার্য, আর অ্যাগ্রিরজনার নাম বিমান বিহারী চৌধুরী।

শিবাশিস ওদের নাম শুনেই সংক্ষেপে নামাকরণ করল একজন *S S. B* অপরজন *B B*, *C* তার পর শান্তিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমিও কিন্তু *S S.B* কারণ আমার পুরোনাম হলো শিবাশিস বসু" ।

ড্রাইভার জানাল, "ফোর হুইল এ চলবে না স্যার আপনাদের সবাইকে নামতে হবে. এবং একটু ধাক্কাও দিতে হবে। নরম কাঁদা মাটীতে আটকে গেলে মুস্কীল ।"

শান্তিবাবু বললেন, 'দেখনা বাপু ফোর হুইল দিয়ে ।'

কিন্তু ফোর হুইলে কাজ হলো না. গাড়ীর ইঞ্জিন গরম হয়ে গেছে, ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে

সবাইকে নামতে হইল, এই নামতে গিয়ে শিবাশিস তার ডান পা যেই না মাটীতে ছোঁয়াল জুতো সমেত নরম মাটীতে আঁটকে গেল—আঠাল মাটী পেন্টেও কাঁদা লেগে গেল। কী আর করা যাবে জুতো খুলে সে জীপের মধ্যে রেখে দিল। রাস্তার ধারে ইটের খোয়ার উপর দাঁড়িয়ে প্যান্টও গুটিয়ে নিল হাফ প্যান্টের মত। যাত্রীরা সবাই নেমে গেছে, কেবল মাত্র দুইজন স্ত্রীলোক কোলে বাচ্চা নিয়ে জীপেই বসে রয়েছে ওদের নামতে হবে না।

এই সময় ওভারসীয়ার যুবক থাকাতে সুবিধেই হল, যাত্রীদের কাউকে কাঁদার মধ্যে জীপ ঠেলাঠেলিতে না লাগিয়ে সে রাস্তার কুলীদের ডাকল।

ছোকড়া হ্যাণ্ডিম্যান ছেলেটি ফোর হুইল পরীক্ষা করে নিল। একবার রেডিয়েটরে জল আছে কিনা দেখে নিল তারপর সাইলেন্সার বক্স চেক-আপ করল। এই বয়সেই বালক গাড়ীর মেকানিজম্ শিখে ফেলেছে কোন স্কুলে না পড়েই হাতে কলমে শিখেছে, ড্রাইভার এই ছেলের উপর বেশ নির্ভর করে বোঝা যায়।

শিবাশিস ইটের ঝামার উপর দাঁড়িয়ে সিগেরেট টানতে টানতে দেখছে কুলীরা কিভাবে গাড়ী ঠেলার উদ্যোগ নিচ্ছে শান্তিবাবু ওপাশে এসে দাঁড়ালেন। "দিন স্যার একটা সিগেরেট দিন" বলে।

শিবাশিস সিগেরেট প্যাকেট আর ম্যাচ দিতে দিতে জানতে চাইল— ।
"আপনি যে অমরপুরে পোস্টিং পেয়ে জয়েন করতে যাচ্ছে ? আপনার ফ্যামিলি কোথায় ?"

শান্তিবাবু ঃ আর ফ্যামিলি ! ওসব বললে অনেক কথা…" আপনি বিবাহ করেছেন স্যার ?

শিবাশিস করেনি জানাতেই, আর শান্তিবাবু শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রয়াস নিলেন না, "যতদিন বিবাহ না করে থাকতে পারবেন, ততদিনই ভাল থাকবেন। প্রেম টেম করেছেন স্যার ? না না আপনাকে বলতে হবে না। তবে জেনে রাখুন প্রেম একটা ফ্যান্সি সেন্টিমেন্ট, শুধু মজা করার জন্যেই মজায় যতদিন মজে থাকবেন ততদিনই শরীর মন ভাল থাকবে—প্যাস্‌টাইম হিসাবে উপযুক্ততম। বিবাহ করেছেন তো হয়ে গেল…

শান্তিবাবুর কথায় শিবাশিস কৌতূহলী হয়ে গেল, "তাহলে আপনি বিবাহ করলেন কেন ?"

শান্তিবাবু ঃ "দেখুন স্যার বুদ্ধি দিয়ে পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ করতে পারব না তবে বাসনার আগুন বড় বিচিত্র বস্তু বিশেষ একটা বয়সে, একটি বিদ্যুৎলতার যৌন আকর্ষনী ক্ষমতা দেখে সে আমার স্বপ্ন হয়ে গেল। চঞ্চল হলো মন, চক্ষু লজ্জা করে দিন কয়েক গেলেও হঠাৎ একদিন চাঞ্চল্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটল। মনে হলো সে কিছু জাদু জানত, সেই জাদুতে সে আমাকে পরিপূর্ণ ভাবে ওভার ওভার দিয়ে দিল। আমি তো তখন যুবক, ক্ষিদেও প্রচণ্ড পরিণতি হলো পরিণয়ন। তার পরই অনুভূত হলো ব্যাচেলার জীবন আর বিবাহীত জীবন সম্পূর্ণ এক বিপরীত বৃত্ত—মোটেও সুখবর নয়।"

শিবাশিস ঃ তার মানে প্রেম করে বিয়ে করেও আপনারা সুখী দম্পতী নন ?

শান্তিবাবু ঃ "দেখুন স্যার, নারী-পুরুষের পারস্পারিক নির্ভরতা, নীরব বোঝাবুঝির নামই হলো দাম্পত্য জীবন। প্রথম দিকে আমি সুখী কি অসুখী ভাবার মত সুযোগ পাইনি, চাকুরি আর সংসারের সার্বিক দায়িত্ব পালনে এত ব্যস্ত ছিলাম যে কী করে এতগুলু বছর কেটে গেল ভাবলে অবাক লাগে। মনে হয় এই তো সেই দিন আমাদের প্রেম হলো, বিবাহ হলো এর মধ্যে কত কি ঘটে গেল। এবং ঘটতে ঘটতে বর্তমানে আমাদের প্রেম নেই, নেই ভালবাসা, আছে শুধু ইগোর সঙ্গে ইগোর যুদ্ধ। বিস্তর মেজাজের বিস্ফোরণ। সে চেঁচিয়ে কথা বলে না। নীচু স্কেলে বাঁধা তার স্বর কিন্তু বাক্যে তূর্য। তার যাদুর শেঠে অংশের পরিণতি যে এমন হবে জানতাম না—রীয়েলী আই হেট্ দ্যাট। আমারও কিছু লাইক্স্ অ্যাণ্ড ডিস্লাইক্স্ আছে যা তার সঙ্গে মেলে না। কিন্তু আমি সেগুলু ওভারকাম করতেই চেষ্টা করি। কিন্তু তার অভিযোগ আমি তাকে অন্তর্বত্নী করতে পারিনি, আমারও দুর্ভাগ্য সে আমাকে সন্তান দিতে পারল না। ফলে তাল কেটে গেল।"

শান্তিবাবুর মন খারাপ দেখে শিবাশিসেরও মন খারাপ হয়ে গেল। সে যে ফুল্লরাকে বিয়ে করতে এত উতলা হয়েছে, এ বিয়ের পরে এমন তাল যদি কেটে যায়? আবার ভাবে সব ক্ষেত্রে একরকম হয়না। আবার সব কিছু এক রকম থাকেও না, শান্তিবাবুর যা বয়স এখনও সময় ফুরিয়ে যায় নি। তাই শিবাশিসের মন্তব্য হয়, "তাল কেটে যাবার জন্য নিজের ভাগ্যকে দোষ দিয়ে কি হবে? ভবিষ্যৎ তো রয়ে গেছে, বার বছর বাদেও তো স্ত্রী সন্তান ধারণ করে এমনও দেখা গেছে—সন্তান হয়নি বলে আফ্‌শোষ নিয়ে চলা সুস্থ থাকার কোন প্রেসক্রিপ্‌শন্ হতে পারে না। দেখবেন সেতু বন্ধন হবে।"

শান্তিবাবু, "তার আর সম্ভাবনা নেই। সে আমার কে। সে থেকেও না
থাকার মত। আমিও আর সেই আমি নেই। আমাদের
পারস্পরিক মমতার টান আকর্ষণ একেবারে তলানিতে
ঠেকেছে। আমরা কেউ কারও না-এর পর্যায়ে। তবে
আমরা একে অপরকে ডাইভোর্স করব এমন ধমক কেউ
কাউকে এখনও দিইনি। তাকে ছেড়ে দিলে তার কি
গতি হবে সেটা এখনও ভাবি। তবে সে যদি ছেড়ে দেয়
আই ডোণ্ট মাইণ্ড।"

এই সময় বিমানবাবু দুই *S. S. B* র নাম ধরে ডাক দিল, "আপনারা আসুন।"

শান্তিবাবু আগে তার পেছন পেছন শিবাশিস খোয়া টপ্‌কে জীপের কাছে এল। আগে লক্ষ্য করেনি এখন গাড়ীর ভিতরে চোখ যেতেই দেখল দুই জন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকদের একজনার বয়স অনুমান ৩৫ থেকে ৪০ এর মধ্যে। স্বাস্থ্যের দীপ্তি নেই। মুখটা ভাঙ্গা চোরা। গায়ের রং কাল না হলেও ফর্সা নয়। কিন্তু দাঁত গুলু পরিস্কার। একদা স্বাস্থ্যবতী ছিলেন অনুমান করা যায়। এখনও একেবারে স্বাস্থ্যহীনা নন।

পাশের বৌটির বয়স খুব জোড় পঁচিশ। মুখের গড়ন পানপাতার মত। পাতলা ঠোঁট। গায়ের রং টকটকে ফর্সা। সরু নাক, উজ্জল দৃষ্টি। মাঝারি দোহারা গড়ন। দাঁত গুলি গুটি গুটি। শরীরময় ছন্দ সুদেহী।

পরনে নীল শাড়ী, গায়ে হলুদ রঙের সিল্কের ব্লাউজ অন্তর্বাস নেই। সমস্ত দেহের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়েই যেন শাড়ী-ব্লাউজ. জানির ধকলে চুল গুলু উস্‌কো খুসকো হলেও খোপায় আবদ্ধ। ভুরু আর চোখে মনোহারীত্ব লুকোনো। তবে নিজের রূপ সম্বন্ধে খুব সচেতন বলে মনে হয় না। কোলে একটি বাচ্চা। ছেলে না মেয়ে বোধগম্য না। বাচ্চাটিকে এপাশ থেকে ওপাশ করতে শিবাশিসের নজরে পড়ল ব্লাউজের একটি টিপ বোতাম খুলে গেছে।

চোরা প্রবৃত্তি মানুষের কন্দরে লুকিয়ে থাকে, সময় মতই অতর্কিতে জেগে ওঠে। আহা আর একটা বোতাম যদি খুলে যেতো!

খুলে গেলেই বা কি হতো ! নিজস্ব অনুভূতিকে অন্যান্য যাত্রীদের সমক্ষে আনার উপর অলিখিত নিষেধাজ্ঞা। নিজের চোখের উপর নিয়ন্ত্রণ না রাখতে পারলে মর্যাদার দফারফা। শিবাশিস সচেতন হয়ে গেল।

গাড়ী ঠেলার কাজে যাত্রীদের কয়জন সমর্থ ব্যক্তি হাত লাগিয়ে ছিল ওরা নীচের লোজায় হাত পা ধুয়ে পরিষ্কার করে ফিরে এসে গাড়ীতে উঠতেই গাড়ী আবার চলতে সুরু করল। ড্রাইভারের বাঁ পাশের এক জন নেমে পড়েছে, এখানেই কাছে পিঠে তার বাড়ী, ওভারসীয়ার এখন ড্রাইভারের বাঁ পাশে।

শিবাশিসের মনে শান্তিবাবুর জীবনের তাল কাটা কথা গুলু খুব ভাবাচ্ছে। বড়ই দুর্ভাগা মা'র।

পেছনের সেই ছেলে এবার বলল, "আরও চার টাকা উসুল হলো।"

শান্তিবাবু উক্তি ছুড়লেন, "মহারাণী পর্যন্ত যেতে এই রেট্ এ আরও টাকা উসুল করতে পারবি রে ছোকড়া।"

এবার শিবাশিসের তার এক সহকর্মী মিত্র সাহেবের বলা অস্ট্রেলিয়ান বৌসিক গ্র্যাফ্‌ট এর কথা মনে পড়ে গেল, "শুনুন শান্তিবাবু, সাপ আর বেজিতে লড়াই, সাপ বেজার লেজ ধরে গিলছে, বেজিও সাপের লেজ গিলছে, যত গিলে ততই ছোট হতে হতে একটা বৃত্তাকার ধারণ করল। বৃত্ত ছোট থেকে ছোটতর হয়ে গেল শেষে একে অপরকে গিলে ফেলাতে সাপও নেই, বেজীও নেই অর্থাৎ *raw materials* যেমন নেই, *finished product*ও নেই। ঐ ছোকড়া যে হারে উসুল করছে শেষে দিয়ে থুয়ে আসল না উধাও হয়।"

শান্তিবাবু হেসে উঠলেন বিমান বাবুও হাসলেন।

গাড়ী চলছে, একাৎ ওকাৎ টাল খেতে খেতে, জীপের শব্দ শুনলে মনে হয় একটা দুরন্ত গোয়ার ছুটছে অথচ গাড়ীর গতিবেগ দশ মাইলেরও কম, ইঞ্জিন তেতে উঠেছে তাই মনে হয় হাঁফাতে হাঁফাতে এগুচ্ছে, আর কতদুর মহারাণী ?

এতক্ষণ বৃষ্টি হয়নি, কিন্তু আকাশের অবস্থা ঘোলাটে কালো মেঘ জড়ো হয়েছে, আষাঢ় মাসটা এমনই। ত্রিপুরায় বৃষ্টিও হয় বেশি। একবার শুরু হলে বিরামহীন। এই সময় গাড়ীর চাকার গতির সঙ্গে জল কাদা ছিটকে শিবাশিসের প্যান্টে ঝাপ্টা লাগল সার্টের ডান হাতেও কিছু কাদা জল লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ঝির ঝির করে বৃষ্টিও পড়তে শুরু করেছে। এতক্ষণ বৃষ্টি না হওয়ার দরুন কি এবার শোধ নেবে?

উচু পাহাড় ডিঙিয়ে এতক্ষণে জীপ পড়ল সমতলে। এখান থেকে মহারানী আর মাত্র দেড় মাইল। দুধারে ধান ক্ষেত মাঝখান দিয়ে রাস্তা, মাটী কালো আঠালো। ভীষণ পিচ্ছিল এ রাস্তা, কাদাও তেমনি। গাড়ী চাকার লাইনে লাইনে চললেও হঠাৎ হঠাৎ পিছলে গাড়ী যেন ধান ক্ষেতে গিয়ে পড়তে চায়। শিউরে ওঠারই ব্যাপার আবার মনে হয় গাড়ী যেন বসে যাবে কাদায়।

হঠাৎ একটা সাপ বাঁ পাশ থেকে ডান পাশে যেতেই বিমানবাবু বলে উঠলেন, "এই খেয়েছে। বাঁ পাশে সাপ কি জানি কি হয়! উল্টে গেলে গেছি।"

শিবাশিস প্রশ্ন করল "বিষাক্ত নাকি?

ওভারসীয়ার বলল, "মনে হয় নির্বিষ"।

শিবাশিসের উত্তর চটপট, "তা হলে ঘাবড়াবার কিছু নেই নিউট্রেলাইজ হয়ে গেল, উল্টে ডিগবাজী খাব খাচ্ছি করে করেই ঠিক পৌঁছে যাব, তারই ইঙ্গিত দিয়ে গেল বাঁ পাশে দেখা নির্বিষ এই সাপ।"

শান্তিবাবুর মন্তব্য হল, "আপনার কথাই যেন ঠিক হয় স্যার,"

পর পর দুটি মাঝারি কাঠের পুল আছে, প্রথম পুলটি পেরিয়ে জীপ যেন আর চলতে চাইছে না। ফোর হুইলেও না।

আবার কি যাত্রীদের নামতে হবে?

জীপ ফোর হুইল গীয়ারে ফেলেও ড্রাইভার নানা ভাবে চেষ্টা করেও গর্ত থেকে এক ইঞ্চিও ওঠাতে পারছে না, পিছ্‌লে পিছ্‌লে গর্তেই চাকা বসে যাচ্ছে, বিকট শব্দ হচ্ছে, বীয়ারিং বোধহয় পুড়ে যাওয়াটাই বাকী।

ধান ক্ষেতের কৃষকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জীপের দুরন্তপনা দেখে মজা পাচ্ছে। শান্তিবাবু ড্রাইভারকে নামতে বলে নিজেও নামলেন, ঐ কৃষকদের অনুরোধ করলে তারা যদি জীপ ঠেলাতে একটু হাত লাগায়। পুলিশের পোষাক না থাকাতে শান্তিবাবুকে কেউ কেয়ারই করল না।

আর গাড়ীতে বসে থাকলে চলবে না শিবাশিসও নামল। কাঁদাকে এখন ঘৃণা করার সময় নয়, সে নেমেই ঐ ক্ষেত মজুরদের দিকে তাকিয়ে বলল—"তোমরা চা খাবার পাবে একটু হাত লাগাও বাপু এসো।"

ওতেই কাজ হল, ৪ জন বলিষ্ঠ চেহারার যুবক এগিয়ে এল, যাত্রীদেরও আবার নামতে হল, ঐ স্ত্রীলোক আর বাচ্চারা নিষ্কৃতি পেল।

ঐ চার যুবকের দেখাদেখি আরও তিনজন মজুর স্বেচ্ছায় এসে গাড়ী ধাক্কায় জুড়ে গেল। এবং সমবেত ধাক্কার জীপ গর্ত থেকে মুহূর্তে উঠে গেল। এখন মনে হয় ওরা বিনা স্টার্টেই জীপকে মহারাণী পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

কিন্তু হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল, ঐ যুবকদের একজন গাড়ী ধাক্কা দিতে গিয়ে হঠাৎ পিছলে বিচিত্র ভঙ্গীতে উপুড় হয়ে কাঁদা মাটীতে ধপাস। ঐ ধপাসের শব্দে মিষ্টি মুখের অধিকারিণী বৌটি মুখ বাড়িয়ে এক নজর দেখেই মুখে কাপড় চাপা দিয়ে চোখ সরিয়ে নিল।

বলিষ্ঠ চেহারার একটা লোক জানোয়ারের মত উপুড় হয়ে পড়ে গেল সহানুভূতির চেয়ে কৌতুকই বেশি ঐ মিষ্টি মুখের চোখে। অমন চিক চিক করা চোখ দুটো শিবাশিসকে আকৃষ্ট করল।

হুমড়ি খেয়ে পড়া যুবকটি আর কোন দিকে না তাকিয়ে উঠেই রাস্তার পাশের খালে গিয়ে ঝুপ্‌ করে পড়ল গায়ের কাঁদা সব পরিষ্কার করতে।

যুবকটি যখন পরিষ্কার হয়ে উঠে এল শিবাশিস তার হাতে দশটাকার একটা নোট দিয়ে বলল, "তোমরা সবাই কিছু খেয়ো,"

যুবকদের চোখে বিস্ময়, এতটা পারিশ্রমিক পাবে তারা ভাবতে পারেনি।

জীপ মহারাণী পৌঁছে গেল সময় প্রায় পৌনে দশ। চায়ের দোকানগুলি চোখে পড়তেই শিবাশিসের চায়ের তেষ্টা পেয়ে গেল। জীপ চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়ালেও স্টার্ট অফ্ করল না ড্রাইভার। সে বলল "ওপারে গাড়ী যাবে না স্যার মহারাণী ছড়ায় প্লাবন।"

সবাই গাড়ী থেকে নামল। শিবাশিস বুঝে ফেলল আজ অমরপুরে যেতে হলে কপালে অনেক দুর্ভোগ।

তা, যা হবার হবে আগে তো চা-এর সঙ্গে কিছুটা খাওয়া যাক।

চা-এর দোকানে অনেক লোক, সবাই বলাবলি করছে মহারাণী ছড়ার জল বেড়ে চলেছে। ভীষণ কারেণ্ট। ওপারে কোন গাড়ীও নেই। ওপার থেকে যারা ছড়া পার হয়ে এসেছে তাদের কথায় জানা গেল একটা জীপ অমরপুর থেকে যাত্রী নিয়ে আসছিল কিন্তু মাঝ পথে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বিকল হয়ে পরে আছে। ওপার থেকে যারা মহারাণী ছড়া পার হয়ে এসেছে তাদের প্রত্যে-কের কাপড় বা শাড়ী হাঁটুর উপরেও ভিজে একাকার। একটা বৈষ্ণবীকে দেখা গেল প্রায় বুক অবধি ভেজা তার কাপড় সেমিজ।

মহারাণী থেকে অমরপুর প্রায় এগার মাইল। রাস্তায় রাস্তায় গেলে আরও বেশি। দেবতামুড়া মানে সাবেক পথে গেলে দূরত্ব একটু কম। কিন্তু দূরত্ব কম হলেও যেমন চড়াই তেমনি উত্তরাই।

পুরুষরা পারলেও স্ত্রীলোকদের পক্ষে দুসাধ্য না হলেও কষ্ট সাধ্য এবং বৃষ্টির দরুণ পথ নিশ্চয় পিচ্ছিল হয়েছে।

অত ভেবে কি হবে, বিমানবাবু তো অনেক দিন থেকেই অমরপুরে পোস্টেড্, মাঝে মধ্যে আসা যাওয়াও করেন। দেখা যাক উনি কোন পথ ধরেন। তাকেই শিবাশিস অনুসরণ করবে।

এখন সময় সোয়াদশ, শিবাশিসের খিদেও পেয়েছে কিন্তু এখানে চা বিস্কুটের দোকান চাড়া ভাতের হোটেল নেই। অথচ পেট চো চো।

এতক্ষণে শিবাশিসের মনে হচ্ছে ঐ বাঁ দিকে সাপ দেখার ফল ফলতে শুরু করেছে। আর কিছু না হউক অন্তত কিছু কলা হলেও চলত। কলার খোঁজে

একটু এদিক সেদিক তাকাতেই চায়ের দোকানে বসে থাকা এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে চীৎকার দিয়ে বলছে, "আপনি কি কানে কম শোনেন ?"

যাকে উদ্দেশ্য করে চীৎকার সেই ব্যক্তি মাথা নেড়ে জানায় সত্যি সে কানে কম শোনে।

বসে থাকা ব্যক্তি আরও জোরে চেঁচিয়ে বলে, "অমরপুরে হেঁটে যেতে হবে গাড়ী যাবে না বুঝলেন ?"

এতক্ষণে মালুম হল শিবাশিসের এই শ্রবণশক্তিহীন ব্যক্তিটি জীপে আসা স্ত্রীলোক দুটির দলভুক্ত। স্ত্রীলোক দুটিও বাচ্চা সহ ওর পেছনে দাঁড়িয়ে।

হ্যাণ্ডিম্যান ছোকড়াটির তদারকিতে জীপ থেকে সব মালপত্তর চায়ের দোকানের সামনে একটা টেবিলের উপর রাখা হয়েছে ছোকড়ার হাতে শিবাশিসের জুতো।

এতদুরেও অবাঙ্গালী কুলী এসে গেছে, স্থানীয় লোকেদের সাথে যখন কথা বলে তখন এরা বাংলাতেই কথা বলে আর নিজেদের মধ্যে যখন কথা হয় তখন নিজেদের ভাষা, এখন যদিও বৃষ্টি হচ্ছে না কিন্তু আবহাওয়া খারাপ বলে কাজও তেমন নেই, তাই তারা দোকানের চৌকিটা দখল করে তাস খেলছে। দুটি মেয়ে ছেলে তাদের বাচ্চা সহ দোকানে দাঁড়িয়ে আছে তবু যেন ওরা ওদের বসতে দিচ্ছে না, বড়ই দৃষ্টিকটুভাবে অভদ্রোচিত।

ভদ্রতাবোধ বা মনুষ্যত্বের সহজ বিকাশ যতটা বাঙ্গালীদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় অন্য কোন প্রদেশবাসীদের মধ্যে অতটা যেন নেই। লেখা পড়ার হাতে খড়িও হয় নি এমন বাঙ্গালীদের ভদ্রতা ভব্যতা বোধ হিন্দীভাষীদের চেয়ে অনেক বেশি। অবাঙ্গালী কুলী না হয়ে এরা যদি বাঙ্গালী কুলি হতো তাহলে ওরা কেমন ব্যবহার করত তাই ভাবছিল শিবাশিস। তর্ক করলেই সামাজিক শ্রেষ্ঠতা হয় না। বহুকালের সামাজিক অনুশাসনের ফলে রীতি নীতি ভদ্রতা ভব্যতা এবং ঐতিহ্য স্থাপিত হয় মজ্জাগত হয়। তখনই তুলনা করলে বোধগম্য হয় কে শ্রেষ্ঠ। ওটাই হল অন্তর্নিহিত সংস্কৃতি। তারই বাস্তব প্রকাশ পেল যখন একজন সাধারণ স্থানীয় মজুর তাস খেলায় মশগুল বিহারীদের উদ্দেশ করে বলল, "তোমরা কেমনতর মানুষ,

দেখছ না মেয়ে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ? ওঠ ওঠ খেলা বন্ধ করে ওদের বসতে দাও।"

শিবাশিস অন্য মনস্কের মত দেখে এই তারতম্যটা। আর তখনি চোখাচোখি হয়ে গেল নীল শাড়ী হলুদ ব্লাউজ পরা বৌটির সঙ্গে। মাথায় অল্প ঘোমটা, বয়স্কা মহিলাটির সঙ্গে কথা বলার সময় চিকচিক করছিল দাঁতগুলি ওষ্ঠাধর যেন পটে আঁকা, শাড়ীর আচলটি বুকে টানতেই ঢেউ খেলে গেল। তার কোলের দুই বছরের বাচ্চাটি ঐ ঢেউ নিয়ে নাড়া চাড়া করতে চাইছে, যেন তার ক্ষিদে পেয়েছে।

ফাঁকা চোখে কিছুক্ষণ ঐ বাচ্চার দিকে চেয়ে থেকে শিবাশিস চোখ ফিরিয়ে নিল বটে কিন্তু অদ্ভুত একটা ভাবনা তাকে পেয়ে বসল। আচ্ছা, মেয়েদের বুকে যে দুধ জমে তা গর্ভোৎপত্তির কয়মাসের মধ্যে জমতে থাকে ? সন্তান প্রসবের পর কয় বছর ঐ দুধ বুকে থাকে ? ঐ বাচ্চা যে এত ছট ফট করছে সে কিছু খাদ্য পাবে কি ?

এসব কোন ধারণাই শিবাশিসের নেই। জীবনে সব কিছুরই জ্ঞান থাকা দরকার।

বিমানবাবু এই সময় শিবাশিসের সম্মুখে এসে দাড়ালেন উনিই জানালেন শান্তিবাবু কুলিদের খোঁজ করছেন। সবকুলী মহারাণী ছড়া পেরিয়ে অমরপুর যেতে রাজী নয়। আসুক শান্তিবাবু দেখা যাক কি করেন।

শিবাশিসের সঙ্গে বিমানবাবু বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলছেন, "আজ গিয়ে পৌঁছতে না পারলে কাল বেতন ড্র করতে পারব না মুস্কিলই হবে।"

শিবাশিস : আপনার গিন্নী কি অমরপুরেই আছেন ?

বিমানবাবু : না, আমার দুই এস্ট্যাব্লিশমেন্ট, একাই থাকি কর্মস্থলে, স্ত্রী থাকেন পুত্র কন্যাদের নিয়ে আগরতলায়।"

শিবাশিস : কেন এক এস্ট্যাব্লিশমেন্টে থাকতে পারেন না ?

বিমানবাবু : "না স্যার সেটা সম্ভব নয়।"

শিবাশিস : "কেন কারণ কি ? আপনাদের সম্পর্ক কেমন ?" আপনাদের ছেলে মেয়ে কয়টি ?"

বিমান ঃ "সম্পর্ক আমাদের ভালই, তবে বাকী কথা বলার আগেই শিবাশিসের কৌতুহল বেড়ে গেল তবে কি ? বিমান এবার খোলাখুলিই জানাল, "বাপ মায়ের পীড়াপীড়িতে সময় মতই তাদের নির্বাচিত পাত্রীকেই বিবাহ করলাম, পাত্রীও রত্ন বিশেষ, তার উদ্ধত সৌন্দর্য ঘিরে এমন মজে গেলাম তিন মাস যেতে না যেতেই সে গর্ভবতী হল এবং বিবাহ বাৎসরিকের আগেই সি ডেলিভারড্ এ টুয়িন এক ছেলে এক মেয়ে অর্থাৎ ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর সেই শ্লোগান হাম্ দো হামারা দো পূর্ণ মর্যাদা পেল বড় তড়ি ঘড়ি। এর পর থেকে আমরা পতি-পত্নী বড় সতর্ক হয়ে গেলাম, সুরক্ষার কারণেই এখন আমাদের কনডম্ ব্যবহার করতে হয়। ফলং বিলাসরত হলেও মোগলাই আরাম হয় না, সলিড্ ফুয়েল যাতে পুনরায় প্রবেশ না করে সেটাই ম্যাটার অব্ ভাইট্যাল ইম্পট্যান্স। অনাবিল চিত্ত বিনোদনটাই গেছে। আমি ভাবছি স্ত্রীকে বন্ধ্যা করণ শিবিরে নিয়ে যাব। স্ত্রী বলে নিজেকে স্টেরিলাইজ করিয়ে নাও।" ফলে আমাদের স্বচ্ছন্দ বিশ্রাম্ভালাপই যেতে বসেছে, যখনি ওর পাশে গিয়ে শুতে চাই তার উক্তি হয় "তুমি কিন্তু আমায় একদম্ বিরক্ত করতে পারবে না। বলে দিচ্ছি।" আবার কোন দিন কটুক্তি ছোড়ে, আচ্ছা নাছোড় বান্দা তো !" গায়ে জ্বালা ধরান নানা সব আচরণ হজম করা কঠিন, আমার প্রতি তার যাবতীয় আকর্ষণ সরে গিয়ে যমজ ছেলে মেয়েকে ঘিরে, অবস্থাটা বর্তমানে এই রকম।

ছেলে মেয়ের আকর্ষণে মাঝে মধ্যে আগরতলায় যাই বটে কিন্তু ওদের মা নিরাপদ দুরত্বেই থাকে, এক কথায় নৈকট্য গেছে অথচ আমার প্রতিটি স্নায়ু তার স্পর্শ চায় তা বলে কি স্ত্রীর কাছেও আমাকে হ্যাংলামি করতে হবে নিজেকে হালকা করতে ? আপনিই বলুন ?

বিমানবাবুর কথাগুলু শুনতে শুনতে শিবাশিস শান্ত নিস্পৃহ। একটা মাত্র প্রশ্নই মুখ ফস্কে বেরিয়ে পড়ল, "তবে যে শুনি সন্তানই দাম্পত্য জীবনের গতি প্রকৃতি নির্দ্ধারক ?"

বিমানবাবু: "তা অনস্বীকার্য হলেও পুরুষের জীবনে বৌ একটা গুরুত্ব পূর্ণ ফ্যাক্টর বৌ হলো পুরুষের নৈতিক চরিত্রের পাহারাদার কারণ সে ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা মেটায়। কিন্তু সেটা যদি না মেটে তার পরেও কি আপনি বলবেন অপত্য স্নেহ আমাদের বন্ধন বজায় রাখবে ? আমার স্বাস্থ্যটা তো দেখছেন, এখনও গুণ্ডার মতো, খেলা ধূলোয় পারদর্শীতার সুবাদে চাকরি পেয়েছি, শরীর এখনও আমার শক্ত পোক্ত তপ্ত, অথচ স্ত্রী আমার চাহিদা মেটায় না। এর পরেও কি তার আঁচল ধরে থাকার কোন কারণ আছে ? বলুন স্যার। আপনিই বলুন ? স্ত্রীর কাছে কল্কে না পেলে আমার কি করা উচিত ?"

বিমানবাবুর এত সব কথা শুনে শিবাশিস ধন্ধে পড়ে গেল। সে শুধু ভাবতে থাকল দাম্পত্য জীবন বড় রহস্যময়, বড় জটিল, মানুষের মন আরও গূঢ়, ভাবতে ভাবতে সে তল খুজে পাচ্ছে না কি বলবে। এর উত্তর তার জানা নেই। শুধু চেয়ে থাকল বিমানবাবুর হতাশা মিশ্রিত মুখের পানে—ভাবটা "আপনিই বলুন।"

শিবাশিসকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে বিমানবাবুই নিজেকে খোলসা করে ফেললেন, "পটভূমি সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও সে যেমন আছে, আমিও আছি, তবে আমি আর আমার মতো থাকলাম না, বৌ এর অগোচরে বিচ্ছেদের ঝুঁকি নিয়েও হাফ্-গৃহস্থ এক নার্সের বাড়ীতে এই অমরপুরেই পেয়িং গেস্ট হিসাবে গৃহচ্যুত হয়ে থাকি, বাকীটা আপনি অনুমান করে নিন।

অনুমান করবে কি শিবাশিস, বিষ্ময় জমাট বেঁধে গেল তার চোখের মণিতে। তার ভিতরে বহু চিন্তার সমাহার। বিবাহীত জীবন সম্বন্ধে যাবতীয়

অনুমানই ওলট পালট। সে ভাবতে থাকে বিবাহ করা মানে নানা ফ্যাচাং। এক কথায় বিবাহের আগের জীবন আর পরের জীবন এক থাকে না। কার যে কি ভাবে কি পরিনতি হয় অনুমান করা কঠিন। এক এক জনার এক এক রকম।

সে সুরঞ্জনবাবুর কথা শুনে এসেছে। ওনার অনেক সমস্যা, ছেলে মেয়েদের নিয়ে, ওনার সম্মুখে বহু কর্মের বহু দায়। মস্তিষ্কের স্থিরতা নেই।

প্রেম করে বিয়ে করেও নিঃসন্তান বলে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটাই পাল্টে হয়ে গেছে নীরস বড় প্যাথেটিক শান্তিবাবুর দাম্পত্য জীবন। বিমানবাবুর দাম্পত্য সম্পর্কও কম প্যাথেটিক নয়।

বিমানবাবুর কথা সব শুনতে শুনতে শিবাশিসের চোখে মুখে একটা হতাশার ভাব অন্তরের অন্তস্থলে চালু হল। তবে কেন সে ফুল্লরাকে বিয়ে করার জন্যে কল্পলোকে বিচরণ করছে? এখনও যখন চুড়ান্ত কিছু হয়নি ভাবতে হবে অন্য ছকে।

ধরা যাক্, সে ফুল্লরাকেই বিবাহ করল কিন্তু সে যদি বাঁজা হয়, কিংবা অতি উর্বর অথবা একটা সন্তান জন্ম দিয়েই ফ্রিজিড্ হয়ে গেল, এর পর সে কার সঙ্গে মনসিজ্ ক্রিয়া কর্মাদি সারবে? আর ওটাই যদি না হল তাহলে তো বিবাহটাই হয়ে যাবে নিরামিষ একটা ঘটনা। চুরমার হয়ে যাবে লাভ-মিথ্ "সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে"-এটা একটা নিছক গাল ভরা অলীক কথা। এ জাতীয় কথার আধারে স্বপ্ন ভরা রঙ্গিন বেলুন মাত্র। বাস্তবে কার কপালে কি হবে বলা কঠিন। বড়ই অনিশ্চিত।

শান্তিবাবু বিমানবাবুর দাম্পত্য জীবনের পরিণতি শুনে শিবাশিসের একটা বড় লাভই হল তার অভিজ্ঞতায় সঞ্চয় বাড়ল। বিবাহ না করে যেমন করে দিন কাটাচ্ছে সে তার জন্য আফশোষ আছে কিন্তু বিয়ের পরে যদি আফশোষ বাড়ে? তার চেয়ে যেমন আছে তেমন থাকলেই তো হয়। এতই যখন অনিশ্চিত বিয়ে না করলে কি হয়!

শিবাশিস যে এত সব কথা মনে ভাবছে মুখে কিন্তু একটি শব্দও প্রকাশ পেলনা।

শান্তিবাবু মাত্র তিন জন কুলী পেয়েছে। তিনজনেই হয়ে যাবে। মাল পত্তর কারোও এমন বেশি কিছু নয়। তবে শান্তিবাবু তো প্রথম পোস্টিং এ যাচ্ছেন তাই ওনার সঙ্গে ট্রাঙ্ক আছে হোল্ড অল আছে তদ্দরুণ ওনারই দুজন প্রয়োজন।

কুলীরা যখন দরকষাকষি করছে, এই সময় ৩৫/৪০ বছর বয়সের মহিলা এগিয়ে এসে বলল, "বাবু গো, আমাদের একটা উপায় করে দিন।"

এই মহিলার দলে সর্বমোট ছয়জন, বেটা ছেলেদের মধ্যে যিনি আছেন তার বয়স পঞ্চাশার্ধে বধির তবে কর্মক্ষম। এই মহিলারই মরদ। পূর্ব পাকিস্থানের সম্পত্তি বদবদল করে অমরপুর যাচ্ছে।

পূর্ব পাকিস্থানের অনেক সাহা পরিবার গত কয় মাসে সম্পত্তি একচেঞ্জ করে অমরপুরে আস্তানা নিয়েছে। এখনও অনেকে বদবদলের চেষ্টায় আছে। কয়েক ঘর সাহা পরিবার একযোগে অমরপুরের গৃহস্থ মুসলমানদের বাড়ী ঘর জমি বদলা বদলী করছে, পাকিস্থানে দখল দিয়ে এখন এরা এই অমরপুরেই বসতি স্থাপন করতে চলেছে।

বর্ডারের চোরাপথে ওদের অনেক হেনস্থা গেছে। ঘুষ-ঘাষ দিয়েই ওপার থেকে এপারে এসেছে—পাকিস্থানে থাকা যাবে না। এখানে এই মহারাণী পর্যন্ত এসে শুধুমাত্র কুলী পাওয়া যাচ্ছে না এ কারনে অমরপুর যেতে পারবে না তাই মহিলা ভীষন ভাবে চিন্তিত। তাই মহিলা শিবাশিসের পানে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে বলে, "বাবু গো, আমাদের ফেলে যাবেন না। আপনারা যদি আমাদের নিয়ে না যান আমরা এই দুর্যোগে কোথায় থাকব? এখানে তো আমাদের কেউ নেই।"

শিবাশিসের মায়া হলো, সে শান্তিবাবু ও বিমানবাবুর পানে তাকিয়ে আশ্বাসের সুরে বলে, "ভাববেন না। আমরা যেতে পারলে আপনাদেরও উপায় হবে।"

ঐ তিন জন কুলীর সাথে শান্তিবাবু রফা করেছেন ত্রিশ টাকায়। এদের যা মালামাল আরও অন্তত তিনজন কুলী দরকার। শান্তিবাবুর ঐ

কুলীদের নির্দেশ দিল আরও তিনজন দেখতে। হিন্দুস্থানী-রা টাকা ছাড়া কিছুই চেনে না কুলীদেরই একজন গেল আরও তিনজনকে আনতে।

এই উদ্যোগে মহিলা ও ওর স্বামীর মুখে চোখে পরিবর্তন হল। কোণের ঐ মিষ্টি বৌটির চোখে মুখে কৃতজ্ঞতার আভাস স্পষ্ট।

গাড়ীতে যে ছেলেটি 'চার টাকা উসুল হলো' দফে দফে বলছিল ও কিন্তু এই মহিলারই ছেলে। তার পানে তাকিয়ে শিবাশিস বলল— 'গাড়ীতে যা উসুল করেছ এবার কিন্তু সব দিয়ে যেতে হবে ঐ কুলীদের।"

কুলী মাত্র পাঁচজন মিলল। শান্তিবাবুরই দুইজন লাগার কথা। সাহা পরিবারে যা লটবহর বাকী তিনজন সব কিছু নিলেও কিছু থেকে যাচ্ছে। স্বাভাবিক দিন হলে ঐ তিনজনই সব নিতে পারত। কিন্তু দিনটা যে দুর্যোগ পূর্ণ তা ছাড়া ছড়া পারাপার আছে, রাস্তাও ভাল নয়।

শান্তিবাবু তাড়া দিতে বললেন, "আর যখন কুলি পাওয়া যাচ্ছে না যে যা পারে হাতে হাতে তুলে নিক। আগে তো একবার ঐ পারে যাওয়া যাক, ছড়ার জল ফেঁপে উঠলে আর ওপারে যাওয়াও মুস্কিল হবে।"

শিবাশিসের হঠাৎ খেয়াল হল চা বিস্কুটের দাম তো দেওয়া হয়নি, দোকানীর পানে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—কত হয়েছে?

দোকানী 'যার যার তার তার' অমন হিসাবই করছিল। শিবাশিসের অত ধৈর্য নেই— 'সর্ব মোট বল।'

সর্বমোট দশ টাকারও কম। একটা দশ টাকার নোট বের করে শিবাশিস দিয়ে দিল দোকানীকে।

শান্তিবাবু বিমানবাবু আর ঐ মহিলার ইচ্ছা ছিল 'যার যার তার তার' হিসাবে দেওয়ার, তা না দিতে পেরে সবার দৃষ্টি প্রশ্নসূচক, "আপনিই সব দিয়ে দিলেন, আমরাও তো দিতে পারতাম।"

শিবাশিসের মন্তব্য হল, "এর পরে যখন পথে দোকান পড়বে আপনারাই না-হয় দেবেন।"

বিমানবাবুর উক্তি হল, "এর পরে আর কোন দোকানই পথে পড়বে না। অমরপুর পৌঁছলে পাবেন।"

সবাই এখন প্রস্তুত। শিবাশিসের মুস্কিল হয়েছে জুতো জোড়া নিয়ে। এক হাতে ছাতা অন্য হাতে ফোলিও ব্যাগ হ্যাণ্ড ব্যাগটাও রয়েছে। এমন সময় উদ্ধার কর্তা হিসেবে এগিয়ে এল যে তার বয়স অনুমান চল্লিশ—দরিদ্র শ্রেণীর, হাতের ছোট বাক্সটি দেখলেই বোধগম্য হয় পেশায় সে ক্ষৌরকার। জিজ্ঞাসাবাদেই জানা গেলে সে অমরপুরেই কাছারির আঙ্গিনায় নিজ পেশায় যৎসামান্য রোজগার করে। এখানেই মোটামুটি একটা ছোট খাট বাড়ী করেছে। সোমবারে যায় শনিবারে ফেরে। হ্যাণ্ড ব্যাগ নিয়ে শিবাশিসের ইতস্ততা লক্ষ্য করে সেই সাগ্রহে বলল, "ওটা আমাকে দিন" বলেই সে টেনে নিল শিবাশিসের হ্যাণ্ড ব্যাগ। জুতোতে যেই না হাত দিয়েছে অমনি সেই 'উসুল করা' ছোকড়াটি 'বাবুর জুতো আমিই নেব", বলেই সে তুলে নিল।

এখন সবাই ছড়ার পারে। ছড়ায় ভীষণ স্রোত। এই স্রোতেই অনুমান পঞ্চাশ গজ পার হতে হবে অতি সতর্কের সঙ্গে। মাঝ পথে দাঁড়ালেই বালিতে পা আঁটকে যাবে। শান্তিবাবু বিমানবাবুরা আগে ভাগেই নেমে পড়েছেন ছড়ার জলে, সবার হাতে জুতো।

শিবাশিস মনে মনে স্থির করল ওরা যেই লাইনে লাইনে যাচ্ছে সেই লাইনেই তাকে অনুসরণ করতে হবে। ক্ষৌরকার ও আর এক যুবক দুটি বাচ্চা নিয়ে ওপারে গিয়ে উঠেছে। বিমানবাবু পারে উঠতে গিয়ে পিছলে পরে যাচ্ছিলেন। শান্তিবাবু টেনে তুলেছেন। তবু প্যাণ্ট ভিজে যেমন গেছে কাঁদাও লেগেছে ওতে।

এপার থেকে শিবাশিস সবই দেখল। সে তার প্যাণ্ট গুটিয়ে নিয়ে জলে পা দিয়েছে তো হঠাৎ পেছন থেকে ডাক 'বাবু'।

সে থমকে দাঁড়িয়ে তাকাতেই সাহা পরিবারের ঐ বয়স্কা মহিলা, কোলে তরুণী বধূটিরই বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে শিবাশিসকে উদ্দেশ্য করে কাতর প্রার্থনার সুরে বলল, "বাবু, আপনি একটু সাহায্য না করলে এই বাচ্চার মা তাপী কি করে যাবে ওপারে ?"

ব্যাকুলতা ও ভয় মিশ্রিত আবেদন মহিলার চোখে।

শিবাশিসের এক হাতে ছাতা অপর হাতে ফোলিও ব্যাগ। এই মূহুর্তে বেশি ভাবনা চিন্তার অবকাশ নেই, মনুষ্যত্বের সহজাত ভঙ্গীতেই ছাতা আর ব্যাগ এক হাতে নিয়ে আর এক হাত বাড়িয়ে দিল তাপীর দিকে, "ধর শক্ত করে"।

নরম হাত কত আর শক্ত করে ধরতে পারে ! বরং শক্ত হাতেই নরম হাতকে ধরা বাঞ্ছনীয়। শিবাশিস তাই করল। এবং ধীরে আস্তে তাপীকে নিয়ে কোণাকোনি এগোতে থাকল। ওপার থেকে ২/৪ জন আসছে সুতরাং লাইন বুঝতে অসুবিধে নেই। কিন্তু স্রোতের টানে পা যেন ঠিকমত চলতে চায় না। তাপী সুন্দরী হলে কি হবে ওজনে হাল্কা। হাত ফস্কে গেলেই স্রোতের টানে মূহুর্তে ছিট্‌কে গেলেই সর্বনাশ। এখন তাপীর লজ্জার চাইতে আতঙ্ক বেশি। তাই যত এগিয়ে যাচ্ছে শক্ত হাতের অধিকারীকে সে প্রায় দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। শিবাশিসেরও মনে হচ্ছে এ বড় ভীষণ দায় মুখে বলল, "ভয় পেয়োনা, এই তো এসে গেলাম।"

এখন তারা প্রায় ছড়ার মাঝামাঝি, জলও হাটুর উপর স্রোতের টানও বেশি। তাপী থর থর করে কাঁপছে। তার এক হাত শিবাশিসের কব্জিতে অন্য হাত শিবাশিসের কোমরে প্যান্টের অংশ শক্ত করে ধরা, শরীরের ঢেউ দুটির মৃদু স্পর্শও শিবাশিস টের পাচ্ছে। ভয়জনিত গরম নিশ্বাসও পড়ছে তার কাঁধের কাছে। লজ্জার চেয়ে তাপীর এখন ভয়ই বেশী পারলে সে এখন শিবাশিসকে জড়িয়েই ধরে। সে এক নাট্য মূহুর্ত।

এসব অনুভূতির সময় এখন নয়, শিবাশিসের একমাত্র প্রচেষ্টা ওপারে নির্বিঘ্নে পৌঁছতেই হবে। পারের সবার চোখ ওদের দিকে। শান্তিবাবু ভাবছেন শিবাশিস বোধ হয় ঘাবড়ে গেছে। সেই ক্ষৌরকার ওপারে পৌঁছেই তার হাতের বোঝা

রেখে আবার জলে নেমে এসে শিবাশিসের হাতের ফোলিও ব্যাগ আর ছাতা নিয়ে নিতেই শিবাশিস আরও একটু স্বচ্ছন্দ হতেই তাপীকে প্রায় এক টানেই পারে নিয়ে এল। শান্তিবাবু এগিয়ে এসে তাপীর হাত ধরে তুলে ফেলল প্যারে।

ওপার থেকে এক মাঝ বয়সী ফেরিওয়ালা মাথায় এক ঝুড়ি আম নিয়ে এপারে পৌঁছেছে—মালদহের আম। এ-ও সাহা। রাস্তায় এত কষ্ট সত্ত্বেও ব্যবসার কথা ভুলতে পারেনি। ছড়া পেরোতে মাঝ পথে মোটরের টায়ারের তৈরী স্যাণ্ডেলের একপাটি হাত থেকে পড়ে স্রোতের টানে চলে যেতেই ফেরিওয়ালা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাতের অন্য পাটিও দূরে নিক্ষেপ করে দিল।

এখন সময় প্রায় সাড়ে এগারটা। ফেরিওয়ালার আমের ঝুড়ি দেখে শিবাশিসের যেন ক্ষিদে পেয়ে গেল। কিন্তু একলা কি করে খায়? সে ফেরিওয়ালাকে নির্দেশ দিল "সবাইকে একটা একটা করে আম দাও"।

দাম জিজ্ঞেসও করল না, ক্ষিদের সময় পাওয়া যাচ্ছে এই যথেষ্ট।

ছড়ার জলে শিবাশিসের প্যান্টের কাঁদা সব ধুয়ে গেছে। এখন বৃষ্টিও নেই। আর যদি বৃষ্টি না হয় টেরিলিনের প্যান্ট পরণেই শুকিয়ে যাবে। তবে বৃষ্টিকে বিশ্বাস নেই শ্রাবণের ধারার মত হঠাৎ হতেও পারে। তাপীর শাড়ী সায়াও প্রায় কোমর অবধি ভিজে একাকার—উপায় নেই জল ঝরাতে সে ব্যস্ত।

এতক্ষণে সাহা পরিবারের সবার সঙ্গে শিবাশিসের দূরত্ব কমে গেছে, বয়স্কা মহিলা এক নজর তাপীর পানে চোখ বুলিয়ে, শিবাশিসকে বলল, "ভগবানই আপনাকে জুটিয়ে দিয়েছেন তা না হলে আজ তাপীর কপালে দুর্ভোগই ছিল, সঙ্গে আমাদেরও। আপনার এ ঋণ আমরা শোধ করতে পারব না। অমরপুর পর্যন্ত আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন বাবু। আমার কর্তাকে তো দেখছেন, ফেলে যাবেন না বাবু।"

তাপী অদূরে দাঁড়িয়ে শিবাশিসের চোখে চোখ ফেলল। এখন আর তার চোখে মুখে লজ্জা ছাড়া উদ্বেগ বা ভয়ের চিহ্ন মাত্র নেই, চোখে ফুটে উঠেছে অতি

সুক্ষ অভুতুড়ে মিষ্টি লালিমার দৃষ্টি যা দেখে শিবাশিস আশ্বাস দেয় মহিলাকে, "ঠিক আছে, আপনি ভাববেন না, আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকব।"

সবার আম খাওয়া হয়ে গেল। শিবাশিস আমের দাম মিটিয়ে দিতেই শান্তিবাবু নিজে একটা সিগেরেট নিয়ে শিবাশিসকে একটা দিয়ে লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিতে দিতে বললেন, "তাহলে স্যার আপনারা আসুন। আমি রওনা দিচ্ছি, অমরপুরে আপনি যেখানেই থাকুন আমি খবর নেব।"

শিবাশিসও বোধহয় তাই চেয়েছিল। তবে কি শান্তিবাবু তার মনের ভাব বুঝে ফেলেছে। পুলিশের লোকের সাধারণের চেয়ে কুট বুদ্ধি বেশি। শান্তিবাবু হয়ত ধরেই নিয়েছে এই সুন্দরী তাপীকে ছেড়ে শিবাশিস এক পাও নড়বে না।

বিমানবাবুতো আগেই চলে গেছেন। না, আর দেরী করা উচিত নয়। এগার মাইল দুরত্ব হাটা পথে অতিক্রম করা সহজ সাধ্য নয় বিশেষ স্ত্রীলোক নিয়ে। তাপী মহিলাকে বলছে, "বাচ্চাকে কোলে নিয়ে সে এক মাইলও একনাগাড়ে হাঁটতে পারবে না"।

শিবাশিস আগেই ফোলিও ব্যাগ কুলির হাতে দিয়ে দিয়েছে এখন তার হাতে শুধু ছাতা ভাবছে সে বলে, "ঠিক আছে এখন তো কোলে তুলে নাও অবস্থা বুঝে আমিও না হয় তাকে নেব।"

শিবাশিস তো কোন দিন কোন বাচ্চা কোলে নিয়ে হাঁটেনি। তবে কেন সে অমন ভাবল? বাচ্চাদের সে আদর করতে ভালবাসে, কিন্তু বিরক্তি এসে গেলে তখনি সে মায়েদের কোলে ফিরিয়ে দেয়, তার বৌদীদের মন্তব্য শিবাশিস নাকি গা বাঁচিয়ে চলে।

অতসব মন্তব্যের পরেও এখন কেন ভিন্ন রকম ভাবনা? তবে কি তাপীর মুখে চোখের সেই মিষ্টি লালিমার প্রতিক্রিয়ায় ঐ বাচ্চাকে মাধ্যম করে তাপীর সঙ্গী হতে আগ্রহী শিবাশিস?

হবেও বা।

তা যা হবার হবে এখন তো হাটা সুরু হোক।

সুরু হলো পদ যাত্রা।

সবাইর হাটার গতি বা পদক্ষেপ একরকম নয়। সাধারণ নিয়মে শিবাশিসের হাটা চলা দ্রুতগামী, কিন্তু এখন সে স্ত্রীলোকের সঙ্গে চলেছে। বিশেষ তাপী বাচ্চা কোলে নিয়ে হাটছে।

শিবাশিসের ইচ্ছা করল এবার বাচ্চাকে সেই কোলে নেয়।

ভগবানই সহায় অম্পিতে যে যুবকটি যাবে, তার হাটা দেখে মনে হয় এ রাস্তায় সে আগেও গেছে শিবাশিসের কোলে বাচ্চাকে দেখে সহযাত্রীর পারস্পরিকতায় সেই এগিয়ে এসে বলল, "আপনি পারবেন না বাবু বাচ্চা নিয়ে হাটতে আমাকে দিন। আমার বোঝা নিয়ে চলার অভ্যেস আছে।"

সত্যি বাচ্চা নিয়ে চলা এই পিচ্ছিল রাস্তায় চলা শিবাশিসের সাধ্য নয় তবু সে বাচ্চার মায়ের পানে তাকাল, তাকাল ঐ মহিলার পানে ওরা কি এই যুবককে চেনে ?

মহিলাটিই বলল, "ওর কাছেই দিন বাবু ও আমাদেরই আত্মীয়।"

যুবক বাচ্চা কাঁধে তুলে নিতেই বাচ্চারও ফূর্তি। এতক্ষণ শিবাশিসের কোলে আরামও পাচ্ছিল না। সেটাই যেন প্রমাণ হয়ে গেল যুবকের কাঁধে চড়ে। বাচ্চাটাও এমন তার কোল বাছাবাছি নেই। অন্য কোন বাচ্চা হলে কেঁদে ভাসাত।

এতক্ষণে মাত্র মাইল দেড়েক অতিক্রম করেছে, এই হারে চললে অমরপুর পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। শান্তিবাবুরা বোধ হয় অনেক দুর এগিয়ে গেছেন। বাচ্চা কাঁধে নিয়ে ঐ যুবকও জোড় কদমে যাচ্ছে।

মহিলার স্বামী সেই বধির প্রবর তাড়া দিল, "চিনুর মা, পা চালিয়ে চল।"

চিনু হল এদেরই সন্তান। সেই উসুল করা ছোকড়ারই নাম চিনু মানে চিন্ময় যে শিবাশিসের জুতো নিয়েছে।

বড়ই কষ্টকর এই যাত্রাপথ। রাস্তার কাজ শুরু হলেও বর্ষার কারণে বন্ধ। স্থানে স্থানে মোরাম অথবা ইট পাতা। মোরামের ঘষায় শিবাশিসের পায়ের পাতার দফা রফা, জুতো পায়ে চলার অভ্যেস। কিন্তু জুতোটা এমন ভাবে ভিজেছে আর কাঁদায় মাখা হয়ে পায়ে রাখা সম্ভব হলো না, আর এখন ওটা তো চিনুর জিম্মায়। সুতরাং মোরামের রাস্তায় পায়ে হাটা তার পক্ষে একটু কষ্ট সাধ্য। যেখানে ইটের সোয়েলিং বৃষ্টির দরুণ এত পিছিল হয়েছে অসাবধানে পা পড়লেই চিৎপটাং। আর যেসব স্থানে ইটও নেই মোরামও না সে সব জায়গায় হয় কাঁদা নয়ত বালি। মোট কথা সাবধানেই চলতে হবে।

চিনুর মায়ের সঙ্গে আলাপ করতে করতেই শিবাশিস হাটছে, চিনুর মা-ই কথা বলছে। দেশ ছেড়ে আসবার কারণ সবিস্তারে বলে চলেছে। মোছলমানদের জুলুম, সরকারের নিস্পৃহতা সব মিলিয়ে হিন্দুদের অবস্থা সঙ্গীন। পাকিস্থানে থাকা সম্ভব নয়, তাই জন্ম-কর্মের স্থান ছেড়ে এ রাজ্যে চলে আসতে হল।

তাপী, চিনুর মায়েরই দেওরের স্ত্রী। তাপীর স্বামী-এখনও রয়ে গেছে, কিছু বিলী ব্যবস্থা এখনও বাকী; তাই তাপী আর ঐ বাচ্চা ছেলেকে আমাদের সঙ্গেই দিয়েছে, বলা তো যায় না মোছলমানদের লোলুপ দৃষ্টি হিন্দু মেয়ে ছেলেদের উপর দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে বিশেষ করে পাঠানদের। তবে কিছু লক্ষণ থেকে বোঝা যাচ্ছে বাঙ্গালী মোছলমানরাও পাঠানদের অত্যাচার বেশিদিন সহ্য করবে না। তখন কাকের মাংস কাকেই খাবে। দেখবেন বাবু, "পশ্চিমী মোছলমান আর বাঙ্গালী মোছলমানের মারা মারি লাগল বলে। এসব কথা বাঙ্গালী মোছলমানদের মুখ থেকেই শুনেছি।"

কথায় কথায় প্রায় মাইল তিন কি চার অতিক্রম হয়ে গেল। একটা গাছের নীচে চিনুর বাবা একটু বিশ্রাম নিতে বসেছে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে।

শিবাশিসরা কথায় কথায় খেয়াল করেনি তাপী যে অনেক পেছনে পড়ে গেছে। হঠাৎ খেয়াল হতেই শিবাশিস থমকে দাঁড়াল চিনুর মাকে বলল, "আপনি এগুন আমি তাপীকে নিয়ে আসছি।"

"আপনি আবার যাবেন বাবু ? কী কষ্টই না আমরা আপনাকে দিচ্ছি !"

চিনুর মায়ের কথাগুলো কানে গেলেও শিবাশিস জোর কদমে ফিরে এল একটা বাঁকের কাছে। তাপী বেচারী সত্যি পরিশ্রান্ত এতটা পথ অতিক্রম করে হাঁফাচ্ছে। শিবাশিস ফিরে এসেছে দেখে ফাঁকা চোখে দেখল। চোখে চোখ মিলল না কারণ তাপী নতচক্ষু। কিন্তু শিবাশিসের চোখ টানল আহা ফুল্লরা যদি তাপীর মত দেখতেটি হতো।

তাপীর চলার গতিতে শ্লথ। বিশেষ এখানে একটু চড়াই বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে একটু পিচ্ছিলও, এটা অতিক্রম করতে তাপী ইতস্তত করছিল। শিবাশিস তাপীর হাত ধরতেই সে সহাস্যে উঠে এল, স্পর্শ মুদ্রায় বোধগম্য হল ভিতরে ভিতরে পরিবর্তন কিঞ্চিৎ।

তাপীর হাতের আঙ্গুলে মনোহারীত্ব আছে যার আন্তরিক আবেদন শিবাশিসের মন ছুঁয়ে গেল। বড় ইচ্ছা করছিল আঙ্গুলগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে তারপর স্পন্দন-পরিস্পন্দন, প্রেম নয় কৌতুহল।

কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। ঐ যে ওরা অপেক্ষা করছে। বাঁকটার পেরোলেই তো সবাইকে দেখা যাবে। যা কিছু ওদের চোখে ধূলো দিয়ে।

শিবাশিস তাপীও এসে গেল ওদের কাছে।

শিবাশিসও বসল। অনেকক্ষণ ধরে সিগেরেট খায়নি। সেই কখন নদীর পারে উঠে শান্তবাবুর দেওয়া সিগেরেট খেয়েছে। যে ব্যাগের মধ্যে সে সিগেরেট নিয়েছিল সে ব্যাগ তো কুলির কাছে, যে অনেক দুর এগিয়ে গেছে।

বাচ্চাদের ক্ষিধে পেয়েছে। ছোট একটা টিনে মুড়ি আছে, মোয়া আছে। চিনু মোয়া খেতে শুরু করেছে। চিনুর বাবা তার পকেট থেকে অ্যাম্বেসির প্যাকেট বের করে "টানবেন বাবু" বলে শিবাশিসের দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিল। চিনুর মা দিতে চাইল মুড়ির মোয়া।

এতক্ষনে চিনুর মায়ের কৌতুহল হল জানতে—শিবাশিস কে ? কোথায় থাকে। যাচ্ছে কোথায়, কি করে ?

শিবাশিস জানাল আগরতলায় থাকি, চাকরি করি সরকারী, কাজেই যাচ্ছি অমরপুরে।"

ব্যাস্ মুহূর্তে শিবাশিসের দাম বেড়ে গেল। শিবাশিস যে সে লোক নয়—রাজকর্মচারী। কী ভাগ্যি তাদের এমন লোকের সাহায্য পাচ্ছে! সারাজীবন মনে রাখবে। কৃতজ্ঞতার চাহনীর সঙ্গে বলে চিনুর মা, "মুসলমানদের বাড়ী ঘর

বদল করেই পেয়েছি। পরিষ্কার করতে সময় লাগবে, তা না হলে গৃহ প্রবেশের দিনই আপনাকে নিয়ে যেতাম, আপনার পায়ের ধূলো পড়লে বাড়ী পবিত্র হবে। যাবেন বাবু? বড় খুশি হব গেলে।"

সরল মানুষের প্রাণের উদ্বোধন—মনুষ্যত্বের সহজ বিকাশ, লেখা পড়া জানা লোকেদের চেয়ে এদের আন্তরিকতা তুলনাহীন। অনেক উঁচু ধরণের, এতটুকু কৃত্রিমতা নেই।

চিনু, তাপী মুড়ির মোয়া খেয়ে জলের প্রয়োজন বোধ করছে কিন্তু এখানে তো কোন ঝরণা চোখে পড়ছে না। অমরপুর থেকে আসা এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারা গেল এক মাইল গেলে একটা ঝরণা পড়বে। অগত্যা শুরু হউক পদযাত্রা।

এখান থেকে আর রাস্তা নয়, পায়ে চলা পথ। এই পথে গেলে একটু সর্টকাট হবে, এখন বৃষ্টি নেই। একটু জোরে পা চালালে তিনটা সাড়ে তিনটায় পৌঁছানো যাবে অমরপুর।

ওরা সবাই হাটতে শুরু করেছে। কিন্তু তাপী বিলম্বিত হয়ে উঠল। শিবাশিসের চোখে চোখ রেখে, দৃষ্টিতে একটা বিশেষ ভঙ্গী ভেসে উঠল যা দেখে শিবাশিস কিছুটা উল্লসিত। অর্থাৎ তাপী যেন বোঝাতে চাইল, "ওরা এগোক আপনি আমার সঙ্গেই থাকবেন," এমনই সঙ্কেত। ঠোঁটেও মৃদু বাঁক।

গ্রাম্য হলেও ফান্দ ফিকির জানে। এই ফিকিরে শিবাশিস পড়ে গেল। এমন সুন্দরীকে ছেড়ে কোন আহাম্মক আগে যায়! মনটা তার মোহাবিষ্ট হল,

কাছাকাছি পাশাপাশি চলার একটা মাদকতা আছে, আছে শিহরণ। শিবাশিস আর তাপীর শিক্ষা দীক্ষা, স্ট্যাণ্ডার্ড, স্ট্যাটাস্ এক গোত্রের নয়, তবে সুন্দরীর জয় সর্বত্র। তাপীর সঙ্কেতে শিবাশিস ধন্য। খানিক বাদে শিবাশিস-তাপীও উঠল। শিবাশিসের এখন মনে হচ্ছে তাপীর পিঠে বা কাঁধে হাত দিয়ে হাটা যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মন বলছে—ওটা হবে নিজেকে হাল্কা করার সামিল শিষ্টাচারহীন।

শিষ্টাচারহীন হলেও তাপী এখন শিবাশিসের গায়ে গায়ে, শিবাশিসও যেন ভুলে যেতে চাইছে সে একজন রাজকর্মচারী। তাপীর হাত ধরতে বড় ইচ্ছা। পথে লোকজনও নেই, পাশে ঝোপঝাড়ও কম নয়। এমন প্রকৃতি আর সুন্দরীর সান্নিধ্য ভাগ্য দেবীরই কৃপা-রোমাঞ্চকর।

কথা বলতে বলতেই ওরা হাটছে, তাপীই কথা বলছে, "রাস্তায় অনেক কষ্ট পেয়েছি রাজাবাবু তবুও অনেকের সাহায্য পেয়েছি। কষ্টের চেয়ে সাহায্যটাই মনে পড়ে বেশী। যারা কষ্ট দিয়েছে ভগবান করলে সেসব ভুলে যাব, কিন্তু যাদের সাহায্য পেয়েছি, এই যেমন আপনি কোন দিন ভুলতে পারব? আপনি না থাকলে আমাকে ছড়ার জলেই ভেসে যেতে হতো। হতো না?"

কথাগুলু বলতে বলতে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি মেলে শিবাশিসের চোখে চোখ ফেলে আবেগে তাপী শিবাশিসের হাতটা টেনে নিল নিজের হাতে। এমন করে হাত ধরা রীতিমতো অর্থবহ। এবং ক্রমশঃ তাপী হাত অনেকটা শক্ত করল, যেন দাবির কিংবা নিবিড় হাতছানির ইশারা, যেন কৃতজ্ঞতার মূল্য দিতে সে আগ্রহী যদি শিবাশিস তেমন কিছু চায়।

এখন ওরা যেন বেড়াতে আসা দম্পতি, হাত ধরাধরি করে চলছে।

শিবাশিসের মন ছম ছম করলেও বড় আরামও পাচ্ছে, এবং যত সময় যাচ্ছে তার প্রভাবও তীব্র হচ্ছে। তারও ইচ্ছা করছে নিজেও কিছু দাবী জানায়। জীবনী-শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে বড় আকাঙ্খা। পরক্ষণেই মনেতে ভিন্ন চিন্তা ঘাট আঘাটায় ভেসে যাবে কোন দুঃখে, হঠাৎ কোন পথচারীর চোখে পড়ে গেলে

রুমানে টান। "অহেতুক আবেগের" বহিঃপ্রকাশ করা থেকে সে বিরতই থাকল। কী দরকার অত মায়া বাড়িয়ে ?

বাঁ হাত ধরে চলতে চলতে তাপীরও বড় ইচ্ছা একটু রাজাবাবু'র পানে তাকালে হয় না ? তার কথাবার্তায়, চোখে সম্ভ্রম থাকলেও কিছু মহৎ প্রাপ্তির আকাঙ্খা ভিতরে ভিতরে। কিন্তু শিবাশিসের সংযত ভাবটা তার উপর প্রভাব ফেলল।

এই সেই ঝরণা। এক পথচারী বলেছিল, 'এক মাইল গেলেই ঝরণা'। গ্রামীণ মানুষেরা দূরত্বের পরিমাপ করতে জানে না। এক মাইল কত গজে এ হিসাবই তাদের জানা নেই।

অদ্ভুত মন নিয়ে হাটছিল ওরা, সময় বা দূরত্ব কোন কিছুই খেয়াল করেনি। কথায় কথায় তাপী বলছিল গত দিন বিশালগড় থেকে উদয়পুর নদীর পার পর্যন্ত আসতে খুব বমি করেছিল। বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল। "আর আজ দেখুন এত্তটা পথ হেঁটে এলাম একটুও ক্লান্তি বোধ করছিনা। এটা সম্ভব হল আপনি সঙ্গে আছেন বলে।"

ঝরণার কাছে এসে তাপী শিবাশিসের হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, "একটু দাঁড়াবেন ?"

তাপীর বোধ হয় একটু ইজি হওয়া দরকার এবং খুবই দরকার।

কতগুলু ব্যাপার আছে যা নিয়ে প্রশ্ন করা চলে না। যুগপৎ শিবাশিসেরও মনে হল তারও ইজি হওয়া প্রয়োজন।

আশ্চর্য সমাপতন।

শিবাশিস ইজি হয়ে ঘড়ি দেখল, এখন সময় বেলা আড়াইটা, এখন সূর্যও দেখা দিয়েছে যদিও তেমন তেজ নেই।

দেবতামুড়া মানে কোন নীরব পাহাড় নয়, চতুর্দিকেই শ্যামলিমার বৈচিত্র; চোখ ও মনকে আরাম দেয়।

ঝোপের আড়ালে তাপী নিজেকে হাল্কা করছে যেখানে শিবাশিসের উঁকি মারা শুধু অনভিপ্রেত নয় নিষেধ। তাই সে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে লক্ষ্য করল

কয়টি চিল আকাশে উড়ছে, একটা গাছের ডালায় দোয়েল জাতীয় একটা পাখী লেজ নাড়ছে, অচেনা অন্য একটা গাছে একটা কোকিল ডেকে উঠল—কুহু কুহু। এক ঝাঁক টিয়া পাখী অন্য একটা গাছে গিয়ে বসল।

আচমকা কানে বাজল তাপীর আর্ত ডাক 'রাজাবাবু' ···

কী হল, কী হল উদ্বেগ নিয়ে ডাক অনুসরণ করে যেতেই শিবাশিসের চক্ষু ছানাবড়া, এ কী দৃশ্য! এ যে অপ্রত্যাশিত!

ঘটনা হল হঠাৎ একটা বানর এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফ দিতেই চমকে গিয়ে তাপী তাড়াতাড়ি ঝোপ থেকে বেরোতেই লতাগুল্মে জড়িয়ে চিৎপটাং এবং যেভাবে পড়েছে যতটুকু দর্শনীয় তাতেই শিবাশিস কাবাল। যত অনভিপ্রেতই হউক ঘটনা চক্রে কিছু আশ্চর্য দেহ সম্পদ চোখে পড়ে গেল—স্পর্শকাতর এলাকার আশ্চর্য উন্মোচণ। বেচারি সত্যি সুন্দরী। শিবাশিসের দুচোখে ব্যাগ্র বিস্ময়।

ভালগ্যার, দেখা উচিত হয়নি, কিন্তু দেখা যখন হয়েই গেছে চোখ ফেরায় কেমন করে? বড় চটকাতে ইচ্ছা করছে, একটু লোকালুকি, একটু ক্রিয়া-বিক্রিয়া শারিরীক শক্তি প্রদর্শন, এখানে তেমন কিছু করলে কাক পক্ষীও টের পাবে না। রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়ালে কি এমন অশুদ্ধ হবে!

কী যে হচ্ছিল শিবাশিসের বুকের মধ্যে! এসব কি দেখা ভাল?

মানুষ জীবন নিয়ে খেলে না জীবনই মানুষকে নিয়ে খেলে। এটা তাপীর কোন ফন্দি ফিকির নয় তো? যদি তাই হয় শিবাশিসের স্পর্শ পেলেই সে হয়ত পাগলের মত হয়ে যাবে। তাই শিবাশিস ভয় পেয়ে গেল আগুনের মতো, হঠাৎ খামখেয়ালিপনায় তার ক্ষতিই হবে। সে এমন কাজ করে, ভাল কাজ করলে কেউ পিঠ চাপড়ায় না বটে, কিন্তু খারাপ কিছু করলেই সে সবার চোখে হয়ে যাবে ব্রাত্য-বিদ্বিষ্ট। শুরু হবে নানা জল্পনা কল্পনা।

নিজের কাছে নিজেকে প্রমাণ করাটাই গুরুত্বপূর্ণ শিবাশিসের কাছে। লতাগুল্মে জড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা তাপীর চোখ কি বলছে? তার চোখে চোখ

পড়তেই শিবাশিসের মনে হল কেউ যেন পিচ্‌কারী দিয়ে তার মুখে রঙ মেখে দিয়েছে লজ্জায় জড়সড় বাঁ হাতের কিছু অংশ ছড়েও গেছে। যা দেখে শিবাশিসের মনই বলল এটা ফন্দি ফিকিরের ব্যাপার নয়—আপাতন। ভাগ্যিস পা বা হাত ভাঙেনি। ছড়ে যাওয়াটা এমন সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়। সারা শরীরে রোমাঞ্চ খেলে গেলেও দায়িত্ব সচেতন অফিসারের ভূমিকাই মাথায় খেলে গেল। অস্বাভাবিক দৃঢ়তায় শিবাশিস অতি তৎপরতার সঙ্গে তাপীকে ধরে তুলে অতি সতর্ক সযত্নে উঠিয়ে নিয়ে এল ঝরণার ধারে। এবং প্রমাণ হয়ে গেল যা কিছু দেখ না, ঝুঁকির মধ্যে যেও না।

ঝরণার জলে তাপী মুখ হাত পা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিতেই আরও ঝকমকে উজ্জ্বল হয়ে গেল শিবাশিসের চোখে তার বড় ইচ্ছা করছিল অন্ততঃ একটা চুমু খায়। কিন্তু তার ভিতরে দ্বৈত সত্তা কী ভাবে নিজেকে সংযত করল প্রবল প্রলোভনের মুখে সেই জানে।

তাপী কৃতজ্ঞচিত্তে শিবাশিসের পানে তাকিয়ে মুখে কিছু না বললেও অনেক কিছু বলতে পারার হাসি দিয়ে আবার সে হাটতে শুরু করে দিল শিবাশিসের সাথে এক তালে।

শিবাশিস তাপীকে যত দেখছে ততই অবাক হচ্ছে। এখন সে যেন বাতাসের মতই স্বাভাবিক। মনটাও তার গোলাপি থেকে আরও গোলাপি যেন ডানা মেলে চলা এক শারিকা।

এখন তাপীর মাথায় ঘোমটাও নেই। খানিক আগে যা ঘটেছে একটু ক্ষণের ব্যাপার যেন সেটা কোন ব্যাপারই নয়। তাই তার লজ্জাও সরে গেছে। এবং অতি সহজেই সে আবার শিবাশিসের হাত ধরে চলতে থাকল। শিবাশিসও হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল না। পথের যেন শেষ নেই তবে এখন বোধ হয় দুজনারই মনে হচ্ছে এপথ যেন শেষ না হয়।

আর মাত্র মাইল দেড়েক রাস্তা বাকী। তাপী এখন মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়েছে, শাড়ীটাও টেনে টুনে ঠিক ঠাক করে নিয়ে শিবাশিসের হাত ছেড়ে দিয়ে

মন্থর গতিতে সে শিবাশিসের পিছু পিছু হাটতে থাকল। ভাব খানা এই

"ছাড়াছাড়ির সময় যখন এসেই গেছে আর হাত ধরে চলে
সামনে যারা গেছে ওদের চোখে পড়ার দরকার কী?
আপনি আগে আগে হাটুন, আমি পিছনে থাকি।

দুরত্ব বজায় রেখেই পাহাড় ছাড়িয়ে ওরা সমতল ভূমিতে এসে পড়তেই বয়স্ক মহিলা তাপীর বাচ্চাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে।

এখন সময় বিকেল সোয়া চারট।

তাপীকে দেখেই চিনুর মা তাপীর বাচ্চাকে তার কোলে দিতে দিতে বলল, "তোর ভাগ্য ভাল একজন নিল তোর বাচ্চাকে আর এই রাজাবাবু তোকে

একরকম আগলেই কষ্ট স্বীকার করে নিয়ে এলেন! উনি
না থাকলে আমাদের দুর্ভোগ্যের অন্ত থাকত না, কি বলে
যে বাবুর ঋণ শোধ করব?"

আর মাত্র দু'শত গজ গেলেই সরকারী গুদাম ঘর, ওখান থেকেই ছাড়াছাড়ি বা বিদায়ের পালা, ওরা সাথে সাথে চলতে থাকলেও উদাসী পথিকের মতই শিবাশিস হাটছে একমনে একটু আগে আগেই।

এখন চিনুর মা নয় চিনুর বাবা তার পেছনে। সেই বধিরই হঠাৎ পেছন থেকে ডেকে বলছে, "বাবু, এতদুর এক সঙ্গে এসে এখন কেন আমাদের এড়িয়ে

যাচ্ছেন? চলুন না বাবু ঐ গুদাম ঘর পর্যন্ত। সেখানে
চা-এর দোকান আছে, এক কাপ চা খেয়ে না গেলে মনটা
বাবু ভরবে না।"

শিবাশিস থম্‌কে দাঁড়াল বটে কিন্তু চা-এর লোভে নয়। তাপীর সঙ্গে শেষ চোখাচোখি করতে।

তাপীর চোখ মুখ এখন নিস্প্রভ স্পির্কিট নট্। একটু ম্লান দেখাচ্ছে। শিবাশিসের চোখের পানে এক পলক তাকিয়েই চোখ নত করল। সেই পলকের দৃষ্টিটা মনে হয় অনেকগুলু স্তর থেকে উঠে আসা। হঠাৎ গোটা

কয়েক ঘণ্টার সান্নিধ্যের আনন্দ এখন মৌন। প্রায় চার ঘণ্টা হাটল নির্জন চড়াই উতরাই, দেবতা মুড়ার বনতলে অথচ কোন ক্লান্তি বোধ করেনি। সেই মহারাণী ছড়া পারাপার থেকে এই সামনের পুরুষটি তার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ছিল তার প্রহরী, এখন মনে হয় ক্ষণকাল। ক্ষণকালের হলেও অনেক দিন মনে থাকবে। আর কি পাবে এই রাজাবাবুর সান্নিধ্য?

আগে যারা পৌঁছে গেছে তারা সবাই এখন অমর সাগরের কাছে চণ্ডী মণ্ডপের নিকতস্থ গাছ তলায় অপেক্ষমান। এরা প্রায় ১৫/২০ মিনিট আগেই পৌঁচেছে। শান্তিবাবু বিমানবাবুরা নিজ নিজ আস্তানায় চলে গেছেন। শিবাশিসের জিনিস নিয়ে ব্যবসায়ী যুবকটি আগলে আছে, কুলীকে। শিবাশিসের প্রদেয় টাকা যুবকটিই নিজ পকেট থেকে দিয়ে দিয়েছে। শিবাশিস যুবকটির প্রদত্ত টাকা মিটিয়ে দিল। কিন্তু এখানে চায়ের দোকান তো নেই! সুতরাং চা খাওয়া বাতিল।

আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? বিদায় নিলেই হয়। কিন্তু বিদায় যে নেবে হঠাৎ চিনুর মা বাবা বলে বসল, "বাবু, চা তো খাওয়াতে পারলাম না, চলুন না আমাদের বাড়ী, ঐ তো নদীর ওপারে অল্প একটু পথ।"

আধো ঘোমটায় কোলে বাচ্চা নিয়ে তাপী দাঁতে আঁচল কামড়ে শেষ সূর্যের আলোতে যে ভঙ্গীতে তাকাল মৌন ভাবে চোখে চোখ রেখে বাক্যে অনুবাদ করলে, "আস না রাজাবাবু, আমার পতি আপাতত অনুপস্থিত, তাই সমস্যা নেই। তোমার সেবা করে তোমার মধ্যে এমন আগুন জ্বালিয়ে দেব তুমি ভুলে যাবে তুমি একজন রাজপুরুষ। তোমার মন প্রান-দেহ করিব শীতল। আমিও তোমার প্রতিটি মূহুর্তের নির্যাস প্রবল আগ্রহে আস্বাদন আহরণ করে হইব তৃপ্ত, আস না রাজাবাব, আসবে না? এত করে বলছি!" দৃষ্টি স্বপ্নালু রঙ্গিন। কী অর্থ হয় অমন দৃষ্টির?

তাপীর চোখের চিক্ চিক্ লক্ষ্য করে বড় ইচ্ছা করছিল শিবাশিসের তার সঙ্গী হবার। তাপীর সেবা পেয়ে শিবাশিস তার নাঙ হয়ে যেতে পারে, কত কী ঘটে যেতে পারে একই শয্যায় প্রকৃতির আগদে, আর সে যদি নাঙ-ই হয় সেটা হবে তাপীর চৌদ্দ পুরুষের সৌভাগ্য।

কিন্তু অমন নাঙ হতে গেলে লাভের চেয়ে লোকসানের ভয়ও কম নয়। এমনিতে ফুল্লরাকে নিয়ে যে বিতর্ক আছে শুধু ফিস্‌ফাসের স্তরে আর এক বাচ্চার মা তাপীর সঙ্গে কিছু হলে যে আলোড়ন উঠবে গুঞ্জনের সীমা ছাড়িয়ে পৌঁছে যাবে কোলাহলের পর্যায়ে। তাই শিবাশিস তাপীর চোখে চোখ রেখে থনুকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, "তাপী তুমি যথেষ্ট আকর্ষক হলেও আমি খানিকটা উদ্বিগ্ন, খানিকটা ভীতুও, তাই তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমার সহবাস উপভোগ করার সাহস পাচ্ছি না। তোমার সঙ্গে যদি আমি এক রাত কাটাই সরকারী চিরায়ত প্রথা অনুযায়ী এর মধ্যে দিয়ে অনেক রকম অর্থ খোজা হবে। আমি তদন্ত করতে এসেছি তোমার পিছু পিছু ধাওয়া করলে আমার বিরুদ্ধেই তদন্ত শুরু হয়ে যাবে। তাপী, তুমি বুঝবে না আমার ঐ ভীতির মূল্য কতটা। অবৈধ প্রেমে আপাতত মজা, পরকীয়া সঙ্গমে সুখ অধিকতর, কিন্তু একটু জানাজানি হলেই নানা সব ব্যাতিক্রমী কথা শুনতে হবে। অনেক জিজ্ঞাসা তৈরী হবে। পরিণতি বিড়ম্বনার এক শেষ। অনেকের চোখেই আমি বেকুফ বলে গন্য হবো। ঊর্দ্ধতন কর্তা ব্যাক্তিদের কাছে অভিযুক্ত ব্যাক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়ে যাব। আত্মসম্মান চাকুরির পদমর্যাদা সব ধূলিস্যাৎ। তখন তুমিও আমাকে তেমন মর্যাদা দেবেনা। দেবে?"

ওসব ভাবতে ভাবতে শিবাশিসের অন্তরের অন্ত স্থলে তর্জনীর আস্ফালন কী প্রয়োজন এত জটিলতার মধ্যে নিজেকে জড়াবার?

ইটের জবাবে যে পাটকেল ছুড়ে চলে সে কেন পথে পাওয়া এই গ্রাম্য গৃহবধূর সঙ্গে নিজেকে জড়াবে ? ওটা হবে নিজের ভবিষ্যৎকে তছনছ করার সামিল। মনের মধ্যে এক ধরণের সেন্সরশীপ। আফ্‌টার অল তাপী পরস্ত্রী, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড নিয়ে কেন সে কাণ্ডজ্ঞান হারাবে ?

মাত ইজ্জতের কথা বাদ চাকুরিচ্যুত হলে সে পথে বসে যাবে।

শেষোক্ত চিন্তা মনে আসতেই শিবাশিসের মোহ টুকরো টুকরো।

সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যোদয়। সে না রাজ কর্মচারী—সে কেন দিক্‌ভ্রষ্ট হবে ? প্রচুর পরিশ্রম গেছে, কল্পলোকে হলেও মনের উপরও কম চাপ সৃষ্টি হয়নি। প্রতিকূল মনোভাব নিয়ে সে রাইট অ্যাবাউট টার্ন করতে যেতেই তাপীরও রসভঙ্গ হল। রসভঙ্গ হলেও সে ভুলে গেল না তার শেষ কর্তব্য! যার সঙ্গে চলতে চলতে প্রায় সারা দিন মৌন আনন্দ পেয়েছে তাকে প্রণাম না করে ছাড়া কি যায়!

এখন তাপীর চোখে ষোল আনা ভক্তি। গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াতেই শিবাশিস দেখল তার চোখ সজল, আঁচল দিয়ে সজল চোখ দুটো মুছে নিজের বাচ্চাকে কোলে তুলে গালে গাল ঠেকিয়ে আদর করতে করতে শেষ বারের মতো সে শিবাশিসের চোখে চোখ রাখল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মাত্রায়। নির্বাক মৌনী থেকেই সে যেন বোঝাতে চাইল—"আমার বাচ্চা আছে, আছে

বাচ্চার বাপও, তোমার মতন ন্যাকা পরপুরুষ না হলেও আমার জীবন কেটে যাবে। তুমি শুধু রাজপুরুষই। তোমার মধ্যে আকর্ষনীয় রমনীরঞ্জনের ব্যাপার স্যাপার থাকলেও তুমি কাপুরুষ নয়তো…থাক্ বাকীটা উহ্য…" দৃষ্টিটাই শ্লেষোক্ত পূর্ণ-স্মৃতি ধারণ।

খানিক আগের শিবাশিসকে নিভৃতে পাবার সেই মধুর দৃষ্টি একেবারে অদৃশ্য। অমন হঠাৎ দৃষ্টি বদলে চেহারাটাই পাল্টে হয়ে গেল পতিব্রতা এক সতী সাধ্বী। ঘোমটার আড়ালে থ্যাম্‌টা।

অভিনব স্বরূপ দর্শণ। এমন না হলে রমণীরত্ন! আহা, কী নাটকীয় পরিবর্তন! ধারালো মার্কা ঠোঁটের আকার প্রকার চঞ্চল করার মতই।

মৃদু নয়, প্রবল ঝাঁকুনীই খেল শিবাশিস, তার পৌরুষে ঘা। সে একেবারে বিহ্বল। চোখে একরাশ বিস্ময় আর অবিশ্বাসের দৃষ্টি।

তাপীর অমন বাহারি বিজ্ঞাপন দেখে এই মুহূর্তে তার বড়ই ইচ্ছা করছিল সে সিদ্ধান্ত পাল্টায়, উঠুক ঝড়, উঠুক তুফান। ভেসে যাক তার ইজ্জৎ পদমর্যাদা সব। কিন্তু না, হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। আর কি তাপীর পানে তাকানোর প্রয়োজন আছে?

ওরা একে অপরের হাত ধরাধরি করে দেবতামুড়ার কী দুস্তর পথই না অতিক্রম করে এসেছে। প্রতিটি পদক্ষেপেই তাপী তার পাশে। তার চোখ, ঠোঁট, গ্রীবার ভঙ্গী, চুলের উড়াল, শাড়ীর হিল্লোল, পদক্ষেপের তালে উরসিজ নিতম্বের দোদুল রিকিম ঝিকিম হিন্দোল, গায়ের গন্ধ স্পর্শ। সুডৌল হাতের ডানা সবই শিবাশিসের মুখস্থ। হাতে হাতে ছোঁয়ানোর ভিতর দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে আত্মীয়তার ভাব। আশ্লিষ্ট হলে অনেক কিছুই ঘটতে পারত। আর একবার আশ্লিষ্ট হলে বাকীটা তরতর, বনপথে ঝোপঝাড়ের অবস্থানও কম ছিল না।

বিদায় মুহূর্তে তাপী যে ছবি ফোটাল একেবারে মোক্ষম। হোয়াট অ্যান্ এও!

শিবাশিসের বুকের মধ্যে আশ্চর্য এক মোচড়। মনের মধ্যে জ্বালা ভীষণ জ্বালা। এ ছবি শিবাশিসের মন থেকে মুছবে না, মুছবে না, এমন দৃশ্য সে সারা জীবনেও ভুলবে না, ভুলবে না।

ভাব শূন্য ক্লান্ত অন্যমনস্ক বিষন্ন মনে মুখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে শিবাশিস তার তল্পি-তল্পা নিয়ে মন্থর গতিতে হাঁটতে থাকল ডাক-বাংলোর পথে। কেমন ফাঁকা শূন্য হয়ে গেল তার অন্তর।

আজ যা যা ঘটল তদ্দরুণ অশান্ত হৃদয় যন্ত্রকে শান্ত করতে এখন তার কি করণীয়? সাধারণতঃ উত্তেজক কোন পানীয় সে স্পর্শও করে না, তবে আজ তীক্ষ্ণ সুরা না পেলে স্বস্তি পাবে না শিবাশিস। ঘুমের জন্যও তাকে নিতে হবে কড়া ট্র্যাংকুয়িলাইজার ☐

বিড়ম্বনা

মনিময় গুপ্ত নাম তার। কিন্তু নামটা সবাই জানেও না, যারা জানত এক কালে তারাও প্রায় ভুলে যেতে বসেছে।

দিদিরা কাজ বাগাবার সময় সস্নেহে ডাকেন, 'লক্ষ্মী ভাইটি আমার"……

"পারব না" বললেই তৎক্ষণাৎ উক্তি হোতেন—"হতচ্ছাড়া তা পারবি কেন,
হোটেলে খাস আর মস্‌জিদে ঘুমোস্‌….

কোন জিনিস বেটে হিসেব করার সময়, "আমরা দুজন ছেলেরা ছয়, মেয়েরা
সাত মামা এক, নিতাই, মধুর মা।"…

এ শহরে আছে প্রায় বিশ বছর, আপন বলতে বোনেরা আর ভাগনে ভাগনীরা।

বোনেরা সংখ্যায় সাত-আপন, মাসতো, পিসতো, মামাত, জ্যাঠাতো, খুড়তো। এর পরেও পাড়াত দিদিরা কম নয় সবাই এ পাড়ায় ও পাড়ায় সারা শহর জুড়ে অনেক তুতো বোন।

বোনেদের সন্তান সন্ততির সংখ্যাও অঢেল, অগুনতি। তখন তো আর নীরোধের যুগ ছিল না!

তা যা হোক বোনেদের নিয়ে মনিময়ের কোন সমস্যা নেই, সমস্যা যত ভাগনে ভাগনীদের নিয়ে।

আপন ভাগনে-ভাগনীদের 'মামা' ডাকটা মিষ্টিই লাগে।

কিন্তু ওদেরও তো বন্ধু বান্ধব বান্ধবী সহকর্মী সহপাঠী কম নয় ওরাও মনিময়কে মামা বলেই ডাকে।

প্রথম প্রথম মামা ডাক শুনতে মনিময়ের খারাপ লাগত না। কিন্তু ঐ ডাক শুনতে শুনতে বাড়ীর ময়নাটাও মামা ডাকতে সুরু করেছে।

সত্যবাবু মনিময়ের এক ভগ্নীপতির ভাগনে। তাই মনিময় হল সত্যবাবুর মামার শালা।

কথায় আছে না—মামার শালা পিসার ভাই তার সাথে কোন সম্পর্ক নাই।

অথচ সত্যবাবুও মনিময়কে মামাই ডাকে।

পিসতুতো ভাই অবনীদা বিয়ে করলেন মনিময়েরই এক মামাতো বোন শ্যামলীকে।

ওদের ছেলে মেয়েরা বাপের দিকের সম্পর্কটা না ধরে মায়ের দিকের সম্পর্কটাই মেনে নিয়ে মনিময়কে ডাকে মামা বলে।

"কাকা বা কাকু বলেও তো ডাকতে পারত।"

কিন্তু কাকে বলছে সে ?

দিদিরা বলেন, "কাকুর চেয়ে মামা ডাকটাই মিষ্টি।"

মনিময় ভাবে মিষ্টি না ছাই ! প্রাণান্তকর আর কাকে বলে !

তারাপদবাবু সহকর্মী বয়স্ক লোক। দাদা বলেই ডেকে আসছে মনিময় বরাবর। তারাপদবাবুর বাড়ীতেও গেছে সে বহুদিন। ওনার মেয়েরা মনিময়কে কাকু বলে সরাসরি না ডাকলেও তারাপদবাবু মনিময় গেলেই হাঁক ছেড়েছেন, "কৈরে মনি কাকুকে তোরা চা দিবি না ? "

চা পরিবেশন কালে ঐ মেয়েদের কেউ এলে তারাপদবাবু বলেছেন, "দে দে আগে তোদেরই মনি কাকুকে দে।"

সেই তারাপদবাবুর বড় মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ বাদ করে বিয়ে হল মনিময়েরই এক ভাগনের সঙ্গে, ফলে রাতারাতিই সম্পর্কটা পাল্টে গেল। তারাপদবাবুর গুষ্টিকে গুষ্টি ডাকতে সুরু করল মনিময়কে মামা বলে।

এভাবেই একের পর এক আরও কতিপয় ভাগনে ভাগনীর বিয়ে হয়ে গেল এ পাড়ায় ও পাড়ায়। তারাও বাড়িতে ছিল। ভাগনে ভাগনীর সংখ্যা

অগুণতি, অসংখ্য সবার নামও জানা হয় না। অনেক সময় কে আপন কে পর বুঝতে পারে না।

জুনিয়র অফিসার সতীনাথ, মনিময়ের বড় প্রিয় পাত্র।

সতীনাথ মনিময়কে দাদা বলেই ডাকে 'স্যার' নয়।

ভাল ছেলে সুপাত্র, ভাগনী সাধনার যোগ্য পাত্র। হলো বিয়ে। ব্যস্ আর যায় কোথায়। সতীনাথের মামা তো হলই মনিময়, সতীনাথের সহকর্মীরাও ঐ ডাকে ডাকতে থাকলে মনিময়কে।

বিয়ের উৎসব ছাপিয়ে দাদা হল "মামা।"

আর এক ভাগ্নী মাধুরীর বিয়েতে গিয়ে চরম অভিজ্ঞতা। বসে ছিল বিবাহ বাসরের এক কোণে। কে যেন দেখল, আর দেখা মাত্রই টেনে নিয়ে গেল বরযাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। ব্যস্ হয়ে গেল বরযাত্রীদের বারোয়ারী মামা।

শুভ পরিণয়ের শুভ দৃষ্টি দেখবে কি, সানাইয়ের বাজনা ছাপিয়ে কানেতে বাজছে মামা মামা মামা।

রান্নাঘরে ছিল ভাগনী মলিনা, মনিময়কে দেখেই সে কাছে এসে জানতে চাইল, "টেস্ট করবেন মামা ?"

খাওয়ার ব্যাপারে মনিময়ের জিহ্বা বরাবরই লোভী "দে আমি বরং খেয়েই যাই।"

উদ্দেশ্য খেয়েই পালাবে সবার অগোচরে এই বিবাহ মণ্ডপ থেকে।

মলিনা পরিবেশন করছে, বেশ তৃপ্তি করেই খাচ্ছিল মনিময়! এসময় ঠিকে চাকর রান্নার ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ঠাকুরমশায়, মাংসটা কেমন হয়েছে মামাকে দিয়ে একটু টেস্ট করিয়ে নিন।"

ঠিকে চাকরের মামা সম্বোধনে মনিময়ের কানে বাজ, মনে বিস্ফোরণ, "শালার ব্যাটা তোরও আমি মামা ? শুয়রের বাচ্চা…"

ক্ষিপ্ত মনটা চেপেই সে বিয়ের আসর ছেড়ে চলে আসে।

রাঙাদির বাড়ী গেছে অনেক দিন পরে। ঝি দেখেই হাসি মুখে সামনে এসে প্রনাম করল, "মামা কতদিন পরে এলেন?"

রাঙাদির ভাড়া খাটানর জন্য জীপ আছে, আছে ড্রাইভার হ্যাণ্ডিম্যান।

রাঙাদি বলে দিয়েছে ড্রাইভারকে লাইনে বের হবার সময় যেন মামাকেও নিয়ে যায়।

রাঙাদির সঙ্গে মনিময়ের কথা শেষ হয় নি। হ্যাণ্ডিম্যান ছোকড়া এসে তাগিদ দিল "মামা. আকাশের অবস্থা ভাল নয় তাড়াতাড়ি চলুন...."

মামা ডাক শুনেই মনিময়ের রগ্ চটে গেল। ইচ্ছা করছিল দেয় এক চড় "শালার বেটা তোরও মামা আমি?"

চেপে গিয়ে জীপে গিয়ে উঠতে যেতেই ড্রাইভার জানতে চায়, "গাড়ী চালাবেন মামা?"

মনিময়ের গাড়ী চলোবার বড় সখ। ড্রাইভারের মুখ থেকে ঐ মামা ডাক শুনেই বিগড়ে যায় মন। ক্রোধে জ্বলতে থাকে মনে মনে। কি আপদ! ঝি থেকে সুরু করে হ্যাণ্ডিম্যান ড্রাইভার—সবারই সে মামা। প্রানটা উষ্টাগত। আংকলও তো ডাকতে পারে!

নতুন বাড়ীতে এসে উঠেছে। বাড়ীওয়ালা বেশ আপ্যায়ন করেই এনেছে। মনিময় ভাল পে-মাষ্টার। বাড়ীওয়ালার ছেলে মেয়েরা তাকে মেশোমশায় বলে ডাকতে শুরু করছে।

কিন্তু পাল্টে গেল সেই ডাক কিছুদিন পরেই। ঐ ভাগনে ভাগনীদের আনা গোনার ফলে। এ বাড়ীর মেয়েরা নাকি মনিময়ের ভাগনীদের সহপাঠী। সুতরাং এ বাড়ীর সবার পছন্দ মামা ডাকটাই।

হয়েছিল বাড়ীওয়ালার ভায়রা ভাই, হয়ে গেল বাড়ীওয়ালার প্রিয়তমার ভাই। গা জ্বলা কাণ্ড সব। মন খুলে বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোক শালাবাবু শালা করছে অথচ গালি দিচ্ছে এটাও ভাবতে পারছে না।

একটা কিছু ডাকতে হয় তাই হয়ত ডাকে মামা বলে ভাগ্নীদের সঙ্গী-সাথী পরিচিত জনরা। তারই মধ্যে মনিময় অনুশীলন করে বুঝেছে ওরই মধ্যে কেউ কেউ তাকে মামা মামা করলেও ঐ ডাকটা যেন অনিচ্ছাকৃত। মামা ডাকলেও একটু ইয়ার্কি ফাজলামি করতে বাধা কি ?

মনিময়ও আপত্তি করে না। কিন্তু ঐ সব করতে করতে মনিময়ের প্রকৃতিতে অবশ্যম্ভাবী কিছু পরিবর্তন হয়। কিছু স্বপ্ন কিছু কল্পনা একে ওকে তাকে ঘিরে। সুযোগ মত কাছে পেলে ঢোক গিলে নিজেকে প্রকাশ করার বাসনা চোখে খেলে "হাও নাইস্ ইউ আর !"

জহুরী ঠিক বুঝলেও "টেক্কা মারে, আপনি না মামা ! সম্পর্কটা ঠুনকো নয়, বুঝলেন মশায় ! ঘনিষ্ঠতাই আসল।"

"তাহলে এসো ঘনিষ্ঠতাই হউক। লেট আস ডিস্‌কভার ইচ্ আদার" ভঙ্গী তিড়িং বিড়িং করে ফসকায়। গলা তোলা আর হয়ে ওঠেনা। আর তখনি মনিময়ের মনে বিপরীত চিন্তা—যদি ছন্দময়ী কথাটা পেটে না রেখে বলে বেড়ায় ভাগ্নীদের, তোদের মামার রকম সকম বদলে যাচ্ছেরে। মামার একটা গতি কর।

নকলদের টিপ্পনী আসলদের কানে গেলেই হাটে হাঁড়ি।

গোপনীয়তা উন্মোচিত হলেই ইজ্জতনাশা।

কাউকে ভাল লাগলে, "তোমাকে আমার স্বপ্ন উপহার দিতে বড় ইচ্ছা—" বলবার উপায় নেই সে যে তার বাপের শালা।

স্বপ্নটাই মাঠে মারা।

কোন সুন্দরীর সঙ্গে কথা বলেছে তো ভাগ্নীরাই এক এক জন স্পাই। সহপাঠী বা বান্ধবীকে বলবে, "মামার সঙ্গে অত কথা কি রে। তোদের পাতলা স্বভাবের কারণেই মামাকে হাতাতে পেয়ে যাচ্ছে।"

উৎসাহী এক ভাগ্নী একদিন মণিময়কে একটা প্রস্তাব, দেয় "মামা হীরাকে আপনার পছন্দ হয় ? বড় ভালো মেয়ে আপনার সঙ্গে মানাবে বেশ ; রাজী থাকেন তো এগোতে পারি"।

'তা বেশ তো'—মণিময় রাজী।

অনেক দিন গত, ভাগনীর কোন উচ্চ বাচ্য নেই, ইতিমধ্যে মণিময় কিছু স্বপ্ন দেখে ফেলেছে হীরাকে ঘিরে। শেষে অধৈর্য হয়ে সেই উৎসাহিনীকে জিজ্ঞেস করে, "কিরে হীরার খবর কি? না, গুলবাজি দিলি?"

উৎসাহিনী জবাবে জানায়, 'না মামা পারলাম না তোমার গতি করতে, সে বলে কি জান? সে বলে—সেই প্রথম দিন থেকে মামা বলে জানি শেষে মামা হবে শ্যাম?"

মল্লিকা বলে মণিময়ের এক পাড়াত ভাগ্নী স্বেচ্ছায় বলেছে মণিময়েরই আর এক ভাগ্নীকে "তোর মামাকে বলনা আমাকে বিয়ে করবে কিনা?"

মণিময় মল্লিকাকে দেখেছে, তার চোখের তড়পানিতে সজ্ঘর্ষ হয়েছে তো সঙ্গে সঙ্গে মণিময়ের সারা শরীর শির শির—বড় জ্বালা সে জ্বালা মেটাতে মণিময় রাজী মল্লিকাকে বিবাহ করতে।

কিন্তু ওতে মল্লিকার হিতাকাঙ্খীরা ছিঃ ছিঃ করেছে। "তুই মামাকে বিয়ে করতে চাস? এমন বিবাহ হয়? তুই কেরালায় জন্মালি না কেন? শুনেছি ওখানে নাকি মামা ভাগ্নিতে খুব চল।"

মণিময় নিরুৎসাহী হয়ে যায়। যত তার জ্ঞাতি শত্রু। কী আর করবে, দরকার নেই বিবাহের, একলা চলার নীতিতেই সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

যে কেউ তাকে মামা মামা করে।

কানটাই যেন পঁচে যাচ্ছে।

এমন অনেক দিন হয়েছে রাস্তায় চলেছে হঠাৎ কানে ধাক্কা 'মামা'।

সে থমকে দাঁড়ায়, পরে টের পায় কানেরই বিভ্রম।

নকলে আসলে পাড়াত ভাগ্নে ভাগ্নীদের মেলে অস্বস্তিকর এক জ্বালাতনেই ভুগছে সে, হঠাৎ হঠাৎ কানেতে ধোঁকা ঐ ডাক 'মামা' 'মামা'। বড়ই বিরম্বনা বিরক্তিজনিত টেনশন, নিয়মিত মানসিক দ্বন্দ্বে হাবুডুবু।

মাসতুতো বোনের পিসতুতো দেওরের মেয়েকে পুষ্যি নিয়েছে খুড়তুতো ভাইদের মাসতুতো বোন।

এমন কিছু সম্পর্ক নয় তবে ঘনিষ্ঠতা খুব।

পুষ্যির মা সেই দিদি মণিময়ের কাছে উমেদারীতে এলেন সঙ্গে পুষ্যি জ্যোতির্ময়ী।

হ্যাঁ, জ্যোতির্ময়ীই বটে, সুরভিত টাটকা ফুল, রজঃস্বলা, সুন্দর মুখশ্রী, ভেতরে কিছু আছে। যেভাবে তেছরা চোখে দেখছিল বিশদ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন—চতুরালী। প্রখরা।

দিদি বললেন। "দে না ভাই এই ভাগ্নীটির একটা সংস্থান করে।"

আড়চোখে জ্যোতর্ময়ী-রূপী পুষ্যিতে নজর বুলিয়ে নিয়েছে। মুগ্ধ টুগ্ধ হবার উপায় নেই দিদির সম্মুখে। তবে কথা দিয়েছে সে দেখবে।

এর পর থেকে জ্যোতির্ময়ীর আবির্ভাব হতে থাকল মনিময়ের ডেরায় সঙ্গে ছোট ভাই বা বোন।

দিদির ভাবটা অপ্রকাশিত থাকলেও ইঙ্গিতটা নগ্ন, "যাচ্ছিস যা, না গেলে হবে কেন? মণির-ই বা মনে থাকবে কেন, সে যা ব্যস্ত মানুষ! তবে একলা না। দিন কাল খারাপ বিশেষ মণি তোর আপন মামা নয়—অতিরিক্ত বিশ্বাস ভাল নয় বুঝলি!"

তাই তো পুষ্যির সঙ্গে নজরদারীর ব্যবস্থা ফেউ। ব্যাপারটা মণির কাছে অবিশ্বাস্যই মনে হচ্ছিল।

ফেউ দেখে মণিময়ের মেজাজ খিঁচে তিক্ত। এমন অভিজ্ঞতা তার আগেও কম হয়নি। তথাকথিত এই দিদিরা ঠেকলেই ভাই, ভাইটি করে অথচ সোহাগের অন্তরালে শিকারী নেকড়ের চক্ষু, অদৃশ্য হুমকি—। "সাবধান আমার মেয়েকে নিয়ে অসৎ কোন চাতুরী খেলতে যেও না।"

তাই না আগলদার মোতায়েন। ফেউরাও তেমনি। জ্যোতি মণির সঙ্গে কথা বলতে গেছে তো রীতিমত কান খাড়া, সজাগ তীক্ষ্ণ নজরদার। যেমন নির্দেশ তেমনই পালন।

মণিময় বিস্মিত। বিস্মিত বললে কম বলা হয়—স্তম্ভিত। মেয়ের মা বলেই কি যেন তেন প্রকারেণ সন্দেহ বাতিক জাহির করে মানুষের ভিতর থেকে মানুষকে বের করতে হবে?

নির্বুদ্ধিতা, অভদ্রতা অনেক ভাবেই ব্যাপারটা নেওয়া যায়।

বড়ই অপমানজনক ভাবে বেদনাদায়ক। মণিময়ের মনে কাঁটার খোঁচা, সে যেন একটা লম্পট। তার মনে তো জ্যোতিকে নিয়ে সচেতন কোন পাপ চিন্তা ছিল না। স্বাভাবিক ভাবে ব্যাপারটা সে নিতেই পারছে না।

মনের এই অবস্থায় মণিময় কেন উৎসাহিত হবে জ্যোতির জন্য কিছু করবার সক্রিয় উদ্যোগ নিতে! ফেউ পরিবৃত্ত জ্যোতির আবির্ভাবেই তার মেজাজ বিগড়ে যায়। ভাব ভঙ্গীই হয়ে ওঠে ওজনভারী প্রভু প্রভু। অপমান জনিত প্রতিক্রিয়ায় গম্ভীর।

কয়দিন ঘুরে গেছে জ্যোতি, মণিময়ের ব্যবহারে অদ্ভুত শীতলতা। প্রীতি হীন। অফিসার সুলভ কেতা ভাট্ ডায়লগ—"আমার মনে আছে, দেখা যাক কি হয়। তোমাকে রোজ আসতে হবে না, কিছু হলে আমি নিজে গিয়েই খবর দেব"—এমনই গতানুগতিক মামুলী বাক্য সব।

কিংবা "আজ তো আমি ভীষণ ব্যস্ত, এখন কথা বলার সময় নেই।"

অল্প কথায় বিদায়। অনেকটা প্রবেশ ও প্রস্থান। "না তোমার কিছু হবার আশা নেই" কেবল এমন কথাটাই শোনা বাকী।

যে বোঝে সে ঠিকই বোঝে। মেয়েদের চোখ আগে ভাগে অনেক কিছু বুঝতে পারে অথবা জ্যোতি জহুরী, কিংবা হালহকিকৎ তার শোনা বা জানা। কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়। এমনিতে চিড়ে ভিজে না। বিশেষ চাকুরী। ওটা পাওয়া মানে চাঁদ হাতে পাওয়া। কিছু বকশিস্ খরচ করলে যদি হয়!

ছেঁটে দিল সে আগলদারদের, যা করবার সে নিজের কৌশলেই করবে। জ্যোতি আত্মবিশ্বাসী।

আজ মণিময়ের অফিস যাবার তাড়া. হঠাৎ কলিং বেলের শব্দে দরজা খুলতেই ভুরু হরধনু। জ্যোতি এসেছে, একলা। সুসংহত বেশ হাতে মিষ্টির প্যাকেট।

মণিময়ের মনে কয়েক সেকেণ্ড ধাঁধাঁ— "কী হল, হঠাৎ মিষ্টি নিয়ে ?
প্রহরীরা কই ? তোমার মাতৃদেবীর কার্ফু কি উয়ীদড্রন না
লঙ্ঘন ? '

চোখে বিস্ময়বিদ্ধ জিজ্ঞাসার সঙ্গে এই প্রথম জ্যোতির দিকে সরাসরি তাকাল সে। ফর্সা গোলাপী মুখে মিষ্টি হাসির ঝিলিকের অভিব্যক্তিতে গোপন
কথার রহস্য। "এতদিন মা'র সন্দেহ বাতিকে কষ্ট পেয়েছ,
আজ তার উপশম হউক।"

অভিব্যক্তির সঙ্গে তার চঞ্চুপুটে দাঁত চিক্ চিক্। মোহগ্রস্ত দুই চোখ মণিময়ের চোখের পানে রেখে আকুল ভাবে মৃদু ও প্রশ্রয়ী ভাবে একটা মাত্র আচরণই প্রত্যাশা করছে।

মণিময়ের চোখ এমনিতেই গোল, আরও গোল হয়ে গেল। মস্তক ঘুরিয়ে দেবার মতই অবস্থা। যার সঙ্গে কিছু হবার কথা নয়, না নিশানা, না কল্পনা, না ভাবের কথা। বরং চলছিল দুরত্ব সৃষ্টি করার প্রয়াস আর সেই কিনা মণিময়কে এক সুক্ষ্ম ভারসাম্যের উপর দাড় করাল। সহসা সে কোন কথাই বলতে পারল না স্তব্ধবাক্।

চ্ছা করলে মণিময় জ্যোতি যা চাইছে বাস্তব বা ভবিষ্যৎ পরোয়া না করে মোহগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে, অথবা রূঢ় কথা বলে জ্যোতির মোহ খান্ খান্ করে দিতে পারে, "আগে বল আমাকে কি দেখলে মনে হয় স্বভাব দোষে
উচ্ছৃঙ্খল দুবৃত্ত ?"

কিন্তু মণিময়ের মানসম্মান ব্যক্তিত্ব এমনই যে না পারল জ্যোতিকে বুকে টেনে নিতে, না পারল রূঢ় কথা বলতে। মনটাই এখন তার দোলাচলে।

তোর বরাবরই অপছন্দ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, আপত্তি জনক সম্পর্ক সে 'চায় না। তার দরকার স্ত্রী। জ্যোতিকে জীবন সঙ্গিনী হিসেবে পেতে সে অনাগ্রহী নয়। কিন্তু জ্যোতির ভাগ্য নির্দ্ধারণ করবার মালিক যিনি সেই মাতৃদেবী প্রাণ খুলে আশীর্বাদ না করলে তো জ্যোতিকে জীবন সঙ্গিনী হিসেবে পাওয়া মোটেও সম্ভব নয়।

এতসব ভাবনা দ্রুত চক্কর দিতে থাকল মণিময়ের মাথায়।

কী অসীম নিরাসক্তিতে সে তাকাল জ্যোতির পানে। তার বড় মায়া হচ্ছিল জ্যোতির জন্য। আহা, কী-বুদ্ধি! কী বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়েই না সে এসেছে চাকুরির উমেদারীতে চাকুরির শর্তাধীনে নিজেকে ছেড়ে দিতেও সে প্রস্তুত।

আচ্ছা, এই প্রস্তুতির পেছনে কি শুধু মাত্র স্বার্থ না মণিময় জ্যোতির পছন্দেরও কিছু পার্সেন্টেজ আছে?

একটু নেড়ে চেড়ে দেখলে হয় না? কিন্তু যা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল রেজাল্ট, একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠা সত্বেও যদি জ্যোতি তার না হয়—কোন মানে হয় না তবে ওটাই সম্ভাব্য বাস্তব।

অকস্মাৎ মণিময়ের মনে হল সে অহেতুক কি ভাবছে, সে হো হো করে হেসে ভারী পরিবেশটাকে লঘু করে দিল।

ভালবাসা তো শুধু মোহগ্রস্ততাতেই প্রমাণিত হয় না। ভাল বাসলে সব সময় ভাল বৌ হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। মোহগ্রস্থ হয়ে সে জ্যোতিকে বুকে টেনে না নিলেও করুণার দৃষ্টিতে সে মনে মনে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হল জ্যোতির জন্য একটা চাকরি তাকে বরাদ্দ করতে সক্রিয় উদ্যোগই নিতে হবে. "যাও,

তোমার চাকুরি হবে। আই অ্যাশুর্ ইউ, তার জন্য তোমাকে এমন বেচালে বিস্তার বিহার করতে হবে না।"

কথাগুলো কানে যেতেই সহসা জ্যোতির দুই চোখ জলে ভরে উঠল। সে কোন কথা বলতে পারল না বা বলার ক্ষমতা নেই। এভাবে সে নাকাল হবে ভাবতেই পারেনি, জল ভরা চোখ দুটি সরোবরের মত টল টল করছে যার তর্প

মণিময়কে স্পর্শ করল এবং তাৎক্ষণিক আলোড়নে চরিত্রের ভিতটাই নড়বড়ে হয়ে গেল এবং করুণা পরবশ হয়ে সে জ্ঞান হারাল। কিছুক্ষণের জন্য প্রবল এলোমেলো আচরণ। যখন সম্বিৎ ফিরল সে টের পেল জ্যোতি তার বুকে লেপ্টে-ঠোঁটে মাদক স্পর্শ। আলিঙ্গনে বড় সুখ—উদার বক্ষদেশ।

এত দ্রুত প্রস্তুত বিহীন ভাবে ফুশমন্তরে স্থাপিত হল একটা সম্পর্ক যার নাম প্রেম-এক গা শিউরানো অনুভূতি আপত্তি অনাপত্তির প্রশ্ন আর থাকল না—বশ্যতা স্বীকার—গট্ আপ। অদ্ভুত চমৎকার অভিজ্ঞতা অনুভূত পূর্ব পরমং সুখম্। জীবনে প্রথম যুবতী স্পর্শ, ঘ্রান, নিঃশ্বাস। মনে হচ্ছে এই কয়েক সেকেণ্ডেই মণিময় অনেক জোয়ান হয়ে গেছে।

মণিময়ের প্রাণ জুড়োল না বাড়িয়ে দিল ?

প্রেম কখনও থেমে থাকে না। উন্মেষ আর বিকাশের মধ্যে অসংখ্য পর্যায়। ছন্দে ছন্দে রঙ বদল ভোলবদল মায়া জালের বিস্তার বিহার সম্পর্ক সড়গড় ইন্‌টেন্‌সিভ্।

মণিময় ভেবেই খুশি জ্যোতি তার জীবনে সাম্‌বডি, স্বভাবতই যথা সময়ে জ্যোতির চাকুরিও হয়ে গেল—অগ্রাধিকার ভিত্তিতে।

জ্যোতি অকৃতজ্ঞ নয়। মণিময়তেই সে খুঁজে পেয়েছে তার মনের মানুষ। তার প্রত্যাশা, পরিপূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে মণিময় তাকে গ্রহণ করুক। ভাবের ঘরে চুরি সে জানে না। প্রতিটি পদক্ষেপে আত্মশ্লাঘার ইঙ্গিত। তার শরীরে সম্পদ ঐশ্বর্য, দেখা অদেখার যত কিছু যা কিছু আছে তার হদিস দিতে সে মোটেও লজ্জা পায় না।

জ্যোতি অকৃতজ্ঞ না হলে কি হবে, তার মাতৃদেবী বড়ই অকৃতজ্ঞ। ওনাও পেটে যে কী মতলব বোধগম্য না। বাহ্যিকভাবে জ্যোতির মুখের লিখন পাত্তাই দেন না। দেখন আস্ফালন, "ওরে সর্বনাশী, তোর পেটে পেটে এই। শেষে কিনা তুই ···ধিক্ তোকে"।

ভাবটা জ্যোতি যতই মজুক না কেন অত সহজে উনি মণিকে জামাতা হিসেবে মেনে নিতে নারাজ।

জ্যোতি দিশেহারা ভাবেই মণির কানে নামতা পড়ে চলেছে, "যা করবার তুমিই কর।"

মণিময় কী করবে? সে যদি কয়টা রাত জ্যোতিকে নিয়ে কোথাও গিয়ে কাটিয়ে ফেরে তাহলে জ্যোতির মাতৃদেবীর অগ্রাহ্যতা ধোঁপে টিকবে না। জ্যোতি দুগ্ধ পোষ্য বালিকা নয়।'

মিঞা বিবি রাজী হলে কী করবে কাজী?

অভিভাবকরা যত গর্জায় তত বর্ষায় না। শেষে বরণ ডালা নিয়ে সসম্মানেই গ্রহণ করে — উলুধ্বনি সহকারে সাদর অভ্যর্থনা।

এমন ঘটনা তো হামেশাই ঘটছে। এমনই কিছু বোধ হয় জ্যোতির মাতৃ-দেবীর পেটে পেটে. মণির কাছে জ্যোতির আনাগোনাতে ওনার নিয়ন্ত্রণ কেন এত শিথিল? উনি কেন চোখে ঠুলি দিয়ে রয়েছেন? অর্থাৎ, "তেমন কিছু কি তোরা করতে পারিস না?"

তেমন কোন কাণ্ড করবার ইচ্ছা বা সাহস মণিময়ের নেই। তেমন কিছু করলে তার ভাগ্নে ভাগ্নী পরিজনদের চোখে সে তামাশার পাত্র হয়ে যাবে না? অন্যান্যরাও ভেংচি কাটবে। অফিসেও সে হাসি টিপ্পনীর খোরাক হবে— পদাধিকারের আভিজাত্যে ঘা। কল্পনা করতে পারে সে দৃশ্যটা কেমন দাঁড়াবে। উপহাসের পাত্র হয়ে যাবে না সে? মুখে চুনকালি মাখারই সামিল। নানা-জনের জিহ্বায় আর চোখে একই সঙ্গে কৌতুক আর চাবুক। ওদের চোখে আর মুখে তো লিউকোপ্লাস্টার লাগান সম্ভব নয়।

সব মিলিয়ে অবস্থা মোটেও অনকূল নয়—বৈরী।

অঢেল জ্বালা। আসলে জ্যোতিকে সে আচমকাই ভুল করে পেয়েছিল বাস্তব ভবিষ্যৎ আগাম আন্দাজ না করেই। এখন সে সহজাত মর্যাদা বোধ নিয়েই তার পাণি প্রার্থী। কিন্তু অসংখ্য নিগেটিভ ফ্যাক্টার্স—অনেক যদি কিন্তু নাতি বৃহৎ অতিবৃহৎ—জল ঘোলার ব্যাপার।

জ্যোতিকে ভাল লাগা এক কথা, তাকে জীবনের দোসর হিসাবে পাওয়া অনেক জটিলতা। স্বাভাবিক নিয়মে তাকে পাওয়া যাবে না। অস্বাভাবিক কিছু করতেও সে অপারগ। শেষে জ্যোতি বুক ভরা অভিমান আর অচরিতার্থ কামনা নিয়ে পর হয়ে গেল। অন্যত্র পাত্রস্থ হওয়ার ফলে সম্পর্কের যবণিকা পাত।

চোখের জল নিয়ে শুরু, চোখের জলেই শেষ।

মণিময়ের জীবনে ছন্দ পতন। খুবই দুঃখের—ট্র্যাজিক।

বাস্তব নায়িকা হল ভাবনার নায়িকা। জ্যোতি মাধুরী এখন শুধু মাত্র স্মৃতি—সর্বক্ষণ চিন্তেন।

জ্যোতির্ সঙ্গে তার যা হয়েছে একেবারে নির্ভেজাল মনোরঞ্জনও নয়। কী যে হয়নি সে সব চিহ্নিত করাই কঠিন, কত কী যে আবিষ্কার করেছে তার ইয়ত্তা নেই—নৈতিক ব্যাপার। সে সব মনেতে অহরহ প্যাঁচিং, অদ্ভুত উপলব্ধিতে শূন্যতা বোধে মণিময় আক্রান্ত। মনটা খাঁ খাঁ — চিরচিরে কষ্ট সর্বক্ষণ, যেন বিরাট আপ্‌সেট্ ঘটে গেল জীবনে।

দিন যত যায় ততই মণিময়ের মনে হচ্ছে জ্যোতিকে বিবাহ করবার সক্রিয় উদ্যোগ না নিয়ে সে ভুলই করেছে—প্রলিফিক্ ব্লাণ্ডার, প্রেম করে কোথায়ও গিয়ে বিয়ে করে ফিরলে কার মনে কী প্রতিক্রিয়া হবে, কে কি হাস্য কৌতুক করবে ওসব ভাবতে গেলে তাকে সারাজীবন অবিবাহিতই থাকতে হবে। সাহায্য করার মুরোদ নেই, কীল মারার গোঁসাই—যত্তসব। জ্যোতির সঙ্গে তার প্রেম জমেও সে স্বপ্নচ্যুত হয়ে গেল। জ্যোতির বিবাহটা তার সব কিছু ওলট পালট করে দেওয়ার নজীর হয়ে গেল।

কেউ যদি তার অবস্থাটা অনুধাবন করত। তার সমস্যা শোনাবার লোকের বড় অভাব। প্রেমিক অবিবাহীতের অঢেল জ্বালা। জ্যোতি তার প্রেমিকা হয়েও তার কাছে আসে না। আসে না মানে উপায় নেই আসার। কারণ এলেই সে পরপুরুষগামিনী বলেই চিহ্নিত হয়ে যাবে।

মণিময়ও চায়না এমন বদনাম জ্যোতির হউক। চায়না বটে, জ্যোতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার দৃশ্য সব পূর্বাপর সে ভুলেই বা কি করে! ভুলতে হলে বিকল্প বা নির্দিষ্ট আস্থা অবলম্বন চাই। জীবনে যেমন জলের প্রয়োজন তেমনি নারীও প্রয়োজন। কাকে পাবে সে অতৃপ্ত অবসানের জন্য?

হ্যাঁ, পেতে পারে। এ বাড়ীতেই আছে। একজন হল বাড়ীওয়ালার শ্যালিকা মুক্তা, অন্যজন হল বাড়ীওয়ালারই ছোট বোন ঝিমলী।

বাইরে থেকে যাকে যেমনই দেখাক না কেন ভেতরটা তো একই ছাঁচের। এই দুজনার মধ্যে যে কোন এক জনার দখলিকার হতে পারে না সে? স্বজাতেরই তো সে?

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে মনেতে ভেসে উঠল বাড়ীওয়ালার মুখটা। বেটা কেমন অক্লেশে তাকে 'শালাবাবু' 'শালাবাবু' করে দশজনার সামনে।

বড়ই আপত্তিজনক ভাবে অসম্মানজনক।

অপ্রিয়তাকে কেয়ার করে করে মনে মনে মণিময় চটিতং। একটা নীরব প্রতিক্রিয়া আচমকাই তাকে ওসকাচ্ছে। এদের যে কোন একজনকে বিবাহ করতে পারলে এ বেটাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া যায়।

শালিকা মুক্তাকে যদি সে সহচারিণী হিসেবে পায় তবে ও বেটাই হবে তার ভায়রা ভাই। আর বোন ঝিমলীতে যদি দিশা পায় তবে আরও উত্তম। বাড়ীওয়ালাই হবে তার শ্যালক একটা বিরাট প্লাশ পয়েন্ট।

দেখতে ঝিমলী বেশ খোখা চোখা সুন্দরী, তবে শুকনো সুন্দরী নয়। ফিগারটাই সুঠাম। চোখ দুটো জ্বল জ্বলে সাড়ম্বরে। নজরও খুব সেয়ানা।

তুলনায় মুক্তা অনাড়ম্বরে, আপাত শান্ত নির্ভেজাল নিরীহ। ভারী চোখে মটকা মেরে চলে। এই চলাটা যদি ভেক্ হয় তবে ভাল জিনিষের ভেক্ ও ভাল।

মোট কথা দুজনের দু'রকম ঘরানা।

তা আগে তো নিঃসন্দেহ হতে হবে কে উপযুক্ত। সম্ভাব্য আস্থা অবলম্বনঃ কাকে ঘিরে পাবে? তারপর তো নিশানা!

দুজনাই পছন্দসই, এখন বেছে নাও।

ঝিম্‌লীই মণিময়ের ফার্স্ট প্রায়োরিটি, অগত্যা মুক্তা।

ঝিম্‌লীকে ঘিরেই মণিময়ের স্বভাবে একটা চিড় বিড়ানি ভাব চাড়া ছিল।

চক্ষুই তো মনের প্রদীপ, শরীরের চাহিদা যার মধ্যে থাকে একটা চোরা টান। সে টানে ঝিম্‌লীর চোখেও স্মিত সৌন্দর্যের আলো আধারি ধরা পড়ল যার ভিতর দিয়ে ঝিম্‌লীও বুঝিয়ে দিল তারও প্রয়োজন আছে মণিময়কে। জুতসই মওকা যে খুজছে তেমন আন্দাজও দিল চক্ষুর কৌশলে হাউ লাভ্‌লি।

কৌশলটা মণিময়ের হৃদয়ের উষ্ণতাকে উস্‌কে দেবার মতই। মণিময়ের মগজে কাতুকুতু রোমান্স শরীরে শিহরণ প্রপার টার্গেটিং।

এরপর দুজনেই তক্কে তক্কে, আগে তো পান ভোজন হউক। বাড়ীওয়ালার উদ্দেশ্যে মণিময় মনে মনে, "আগে তোমার বোনকে ক্লোজিটে পাই তারপর দেখব কার মুখ থেকে শালা আওয়াজ বেরোয়।"

কিন্তু ক্লোজ আপের সম্পর্কটা প্রকট হওয়ার আগেই মেঘ না চাইতেই জল। আপাত নির্ভেজাল মুক্তা যে ইতি মধ্যে নিঃশব্দে মণিময় আর ঝিম্‌লীর ষড় নিরীক্ষণ করতে সুরু করেছে সেটা মণিময়ের নজর এড়াল না প্রাত্যাহিকের চেয়ে অগতানুগতিক। ভেক্ মুছে গিয়ে মৌনমুখর একাগ্রতার কাহিল উৎসুক চোখে সুতীক্ষ্ণ তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি চুম্বকের মত টানছে মণিময়কে কী গভীর সন্ধিৎসু।

নমুনা দেখেই মণিময়ের মনটা দুলে উঠল মুক্তা হাওয়ায় মণঃশ্চক্ষে চাঁদে হাত পাওয়ার অনুভূতি।

অনুভূতিগুলি তাৎক্ষণিক হলেও একথাটা অনস্বীকার্য দুজনকে ঘিরেই মণিময়ের মনটা জগা খিচুড়ি।

প্রপার টার্গেটিং গুলিয়ে গেল। কে হবে তার অভীষ্ট?

একেই বোধ হয় বলা হয় ফেরে পড়া রীতিমত গোল মেলে।

না, অনর্থক ব্যাপারটাকে জটিল করলে চলবে না। অনুভূতি তার যেমনই হউক দু'জনেই যখন আগ্রহের পদক্ষেপ নিয়ে চলছে এখন দরকার সহজলভ্যতা এবং যে আগে সুযোগ বুঝে স্বউদ্যোগে স্বমহিমায় তাকে আরালে টেনে নেবে কিংবা অ্যাভেইল্যাবেল্ হবে তার ক্লজিটে তাকেই মণিময় অনুবাদ করবে অকৃত্রিম দোসর সেই হবে তার অভীষ্ট জীবন সঙ্গিনী ভাল বাসবে এবং ভালোতে বাস করবে। তার একটা ঋতুও সে ব্যর্থ হতে না।

কপালে কে আছে কে জানে ঝিমলী না মুক্তা ?

বাড়ীওয়ালা তবে কি তার শালা না ভায়রা ভাই ?

মুদ্রা নিক্ষেপনে টস্ করে করে ভাগ্য নির্দ্ধারণ করতে মণিময়ের সেই অ্যাভেইল্যাবিলিটির জন্য ইষ্টনাম জপতে জপতে প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই ☐

রহস্য

যুদ্ধে অনেক লোক মরেছে।

যুদ্ধ করল চার্চিল আর হিটলার। যোগ দিস ভারতবাসী। নেপালী আর আফ্রিকানরা।

চীৎকার দিয়ে যুদ্ধ নেতারা বলেছে, *"This is peoples 'war'*।

কাতারে কাতারে মরেছে ভারতবাসী। নেপালী আর আফ্রিকানরা। যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্মৃতি সৌধও তৈরী হয়েছে অনেক। *Tombstone,* মার্বেল পাথরে লেখা আছে অনেক কিছু ঃ—

'They fought for peoples' cause'

'They are myrters'

'They are patriots,' Remember them for 'a moment'

'Shed tears for them'

'They fought for liberty, equality & braternity'

অ্যারো আরো অনেক কিছু লেখা যাকে ঐ সব *tombstone* এ।

ক্যাপ্টেন ঘোষ প্রায়ই গিয়ে বসেন ঐ মিলিটারী *Grave yard* এ। এই *Grave yard* টি তার সবচাইতে বেশী ভাল লাগে। সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে কর্ত্তৃপক্ষ। প্রস্তরখণ্ডে লিখে রেখেছে,—

"When you go home, tell them of us for their tomorrow we gave our to-day"

ইতিহাস জানে এই *grave yard* শত সহস্র মানুষের জীবন্ত বিসর্জনের স্মৃতি চিহ্ন। এই খানে এলে ক্যাপ্টেন ঘোষের মন ছল ছল করে। অন্তর বড় নরম হয়ে যায়।

হঠাৎ চমকে উঠে। পাশে সেই বিকলাঙ্গ সৈনিকটি হোঃ হোঃ করে হেসে চমকে দেয়। চোখে জল কিন্তু বিকট হাসি। জাতিতে আফ্রিকান। নিগ্রো। এক পা নেই, বাঁ হাতের সব কয়টি আঙুল হারিয়ে বসে আছে। গরিলা যুদ্ধে কৃতিত্বের সাথে যুদ্ধ করেই ঐগুলি সে বিসর্জন দিয়েছে। কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। নিজের জীবনের আশা আকাঙ্খা সব গেছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে দাঁড়ায় ক্যাপ্টেন ঘোসের সামনে। স্বভাব হয়ে গেছে কিন্তু সেলিউট দিতে অক্ষম। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে সম্বোধন করে বলে, *"friend" , you Indian, me African, you fight, I fight, They say we fight for democracy. Both die, They say we are myrtars' All mystry*—অতি অল্প কথায় কত কি বোঝাতে চায়।

ক্ষমতার লোভে, বিজাতীয় যুদ্ধ, লেলিয়ে দিচ্ছে অসহায় অর্দ্ধাহারে জর্জ্জরিত সরল প্রকৃতির সাধারণ মানুষকে। মরে গেলে বাড়োয়ারী *Tombstone* লেখা থাকে *"upon their blood we live"*

যখন এরা বেঁচে ছিল কেউ তাদের দুর্দ্দশায় এগিয়ে আসেনি। না খেতে পেয়েই যুদ্ধে তারা যোগ দিয়েছে। আর যুদ্ধেতে এসেই তারা কাতারে কাতারে মরেছে। এখন তাদের স্মৃতি সৌধ বিরাট তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। যুগে যুগে এই তো ইতিহাস! ইতিহাসের নিশ্চিত নিয়তি। অনেক চিন্তা এসে জমা হয় ক্যাপ্টেন ঘোষের মনে ঐ আফ্রিকানটির কথা শুনে। ইচ্ছা করে চীৎকার দিয়ে বলে, "পালিয়ে যাও পালিয়ে যাও" বলে সবাইকে সতর্ক করে দেয়। *"They are patriots"* কিন্তু ক্যাপ্টেন ঘোষের মনে হয় সত্যি কথাই বলেছে ঐ আফ্রিকানটি–*"all mystry"* . □

বাবা-শালা

জীবনে শ্রীমান কিছুই করতে পারলে না। কারও উপদেশও সে গাঁয়ে মাখেনা। সহপাঠী চঞ্চল কত উপদেশ দেয় সে শোনে না চঞ্চল বাস্তববাদী। বাস্তব তার দৃষ্টিভঙ্গী। চঞ্চল খুব ভাল চাকরী পেয়ে গেছে অনেকদিন পরে চঞ্চলের সাথে শ্রীমানের দেখা। জানতে চায় কি করে চঞ্চল অত ভাল চাকুরী জোগাড় করল। অত বড় মার্কেন্টাইল ফারমে চাকুরী পাওয়া যে সে কথা নয়। চঞ্চলের যা কেরিয়ার আশ্চর্য্যই হতে হয়।

শ্রীমান অনেকদিন পরে চঞ্চলকে পেয়ে প্রশ্ন করে, "কি করে এই চাকুরী জোগাড় করলি ?" উত্তর শুনে অবাক হয়ে যায় শ্রীমান।

চঞ্চল জানায় "ঐ কোম্পানীর বড় সাহেবকে গিয়ে ধরেছিলাম। প্রথমে পাত্তা দেয়নি, শেষে একদিন সুযোগ পেয়ে পায়ে ধরে বলেছিলাম, আপনি আমার বাবা।" চোখের জলও ফেলেছিলাম কম নয়, ওতেই কাজ হয়েছে। বড় সাহেবের মন নরম হল। তারপর রোজ ধর্ণা দিতাম, শেষে হয়ে গেল। হয়ে গেল মানে ত্যক্ত বিরক্ত হয়েই নাছোড় বান্দাকে চাকুরি দিলেন।"

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে চঞ্চলের মুখপানে শ্রীমান। প্রশ্ন করে। "অত নীচে তুই নাবলি কি করে ? নাবতে পারলি ? শিক্ষার সংস্কারে বাধল না ? ছিঃ ছিঃ !"

হেসে চঞ্চল উত্তর দেয় অন্যায় কি ? কি এমন অন্যায় হয়েছে ? আইনের দিক দিয়ে ত ঠিকই বলেছি। মনে মনে বড় সাহেবের মেয়েকে প্রার্থনা করেছি। ওকে বিয়ে করলে বড় সাহেব কি *father-in-law* হতেন না ? বিয়ে না দেয়, ঠিক আছে, *brother-in-law* বলে দেব। আর যদি বিয়ে দেয় শ্বশুড়কে ত 'বাবা' বলেই সম্বোধন করব। না দেয় ঠিক আছে। চাকুরী ত পেয়ে গেছি ☐

দাগ

পিনাক যখন যেখানে গেছে ছেড়ে আসবার সময় সবাইকে কিছু না কিছু দিয়ে এসেছে অ্যাজ্ টোক্ন অব্ অ্যাফেক্শন্ অ্যাণ্ড লভ্।

কিন্তু মহুয়াকে সে কি দেবে? সে ট্যুরে এলে ওদের বাড়ীতেই ওঠে। মহুয়ারা পিনাকের কোন আত্মীয়ও নয় পরই। তবু পরই তো আপন। মহুয়া যা যত্ন করে তার বদলে সবার মত ছুট্‌কো কিছু টিপ্‌স দিয়ে তার মর্যাদা নষ্ট করতে চায়না পিনাক। ওর জন্য তাকে ভিন্ন ভাবে চিন্তা করতে হবে।

কি দেবে সে মহুয়াকে? কি পেলে মহুয়াও খুশি হবে? পিনাকও দিয়ে তৃপ্তি পাবে। মহুয়াও তাকে মনে রাখবে।

মহুয়া খুব হাসি ঝলমলে মেয়ে, সরল মুখে মিষ্টি সৌন্দর্য। ব্যবহারে উষ্ণতা। সুন্দর মুখশ্রীতে আদ্র করুণা আর ঠোঁটে সংকুচিত আপন আপন ভাব।

যতবারই পিনাক এসেছে মহুয়াদের বাড়ী, সে পেয়েছে মহুয়ার মধুর পক্ষপাত।

এবার বোধহয় মহুয়ার সঙ্গে পিনাকের শেষ বারের মত দেখা। আর দেখা হবে কিনা কে জানে। পিনাকও আসবে কিনা ঠিক নেই কারণ তার বদলীর কথা শোনা যাচ্ছে।

মহুয়ারও বিবাহের আলাপ চলছে। তার অভিভাবকরা পাত্র দেখার তোড়জোরে ব্যস্ত।

এই বুদ্ধিমতী মেয়েটিকে পিনাকের ভাল লেগেছে তবে সেটা তার অন্তরের ব্যাপার। অভ্যন্তরের ব্যাপারটা জানালেও ফয়দা নেই।

ছেড়ে আসবার আগের দিন সন্ধ্যায় পিনাক রিপোর্ট লিখছিল। এমন সময় মহুয়া চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। আর তখনি আলো গেল—লোড শেডিং। পিনাক তাড়াতাড়ি দিয়েশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বালাল মোমবাতি কোথায় ?

মহুয়া এগিয়ে এসে চা-এর কাপ টেবিলে রাখতেই কাঠির আলো শেষ।

আতঙ্কিত গলায় মহুয়া বলল, 'বাব্বা ! এ অন্ধকারে যাব কি করে ?

"অন্ধকারে যেতে হবে না" বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব একটা মেজাজ গড়ে উঠল আচমকা পিনাকের।

যেখান কার চা সেখানেই থাকল। একটা আবর্তে ঘন অন্ধকারে স্বতঃস্ফূর্ত আলোড়নে একটু একটু করে ঘন হয়ে মহুয়ার সামনে, কাছে আরও কাছে শেষে নিশ্বাসের ঘনিষ্ঠতায় স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে স্বাদে আহ্লাদে জিভ পর্যন্ত গলে গেল। এক টুকরো তৃপ্তি যা কিনা হৃদয়ের গতিকে দ্রুত করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ধমনী দিয়ে বয়ে গেল এক বন্যা গরম রক্ত।

এক মুহূর্তের ঘটনা বা বিভ্রাট মাত্র এবং এক তরফা। তার আগেও কোন ভূমিকা নেই পরেও কোন উপসংহার নেই। কিন্তু ভূমিকাহীন ঘটনাটাই মহুয়াকে কেমন তন্ময় করে দিল। পিনাকের দুহাতের ঘেরে সে আরও ঘন হয়ে মন্ত্রবশ্যা।

প্রায়ান্ধে দাড়ান অবস্থায় মহুয়া পিনাকের বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল। কান্না ভেজা কম্পিত ওষ্ঠের মন্তব্য এখনও পিনাকের কানে বাজে, "বিদায় বেলায় কেন এমন মায়ায় বেঁধে গেল ?"

আপাত দৃষ্টিতে পাঁচ কি দশ সেকেণ্ডের বিভ্রাট পঁচিশ কি ত্রিশ বছর আগের ঘটনা কিংবা তারও বেশি তবু ঐ ঘটনার দাগ এত বছর বাদেও মনেতে গেঁথে রয়েছে পিনাকের ☐

দুর্মর চিহ্ন

শুদ্ধর পোস্টিং হল এমন একটা স্থানে জায়গাটা ছবির মত।

এখানে একটা বিশাল জলাশয় আছে যার মধ্য ভাগে বিরাট এক রাজ প্রাসাদ—নীরমহল নামে খ্যাত। বড়ই আকর্ষণীয়।

স্থান মাহাত্ম্যে এখানে শখের পর্যটকদের আনাগোনাও খুব সারাবছরেই। শীতকালেই বেশি আকর্ষণীয়, তখন দলে দলে পিক্‌নিক্ পার্টীও আসে। আসে নানা স্ট্যাটাসের সরকারী-বেসরকারী মান্যগণ্য ব্যক্তিরা। কেউ আসে শুধু বড়শি বাইতে, কেউ শুধু নৌকা বিহারে। ইয়ুথ একচেঞ্জ প্রোগ্রামেও প্রেমিক প্রেমিকারা গোপন বিহারে উদয় হয়। আর শিকার তো এখানে একটা গেম্। কত জাতের পাখী যে আসে এই জলাশয়ে দুর দুরান্ত থেকে।

তা যে উদ্দেশ্যে যেই আসুক না কেন, এখানে কিছু সিস্টেম আছে এবং সে সব সিস্টেমের প্যারাফার্ণেলিয়া সবাইকে মেনে চলতে হয়।

সাধারণতঃ সব কিছুই যথা নিয়মে চলে। শুদ্ধর প্রখর তত্ত্বাবধানে, নিয়মের ব্যতিক্রম বড় হয়না। তবু যদি হয় সে যথাযথ ব্যবস্থাও নেয়।

মোট কথা এখানে শুদ্ধর জমিদার সুলভ প্রতাপ, কারণ এখানে সেই একমাত্র অফিসার বা প্রশাসক, এক কথায় কীম্যান।

সেদিন সকালটা ভারী চমৎকার, রোদে ঝল মল, কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে হঠাৎ আকাশটা মেঘে মেঘে ভারী গুমড়ে হয়ে গেল। এমনই সময় এক বিশিষ্ট অভিজাত বয়স্ক দম্পতি নিজেদের গাড়ী নিয়ে এসে হাজির, সঙ্গে গ্ল্যামারাস্ এক পাত্রী বোধ হয় তাদের মেয়ে।

সদ্য যুবতী, এত সুন্দর যে দৃষ্টি কেরে নিতে পারে ।

অনেক আগ্রহ নিয়ে ওরা এসেছে নীরমহল দেখবে বলে। কিন্তু জলা থৈ থৈ, ফন্ ফন্; সো সো করছে বাতাস, বাতাসের সঙ্গে ঢেউ উথাল পাতাল, খেয়া' ঘাটে নৌকোগুসু ঢেউ এর তালে একটার সঙ্গে আর একটা ধাক্কা খাচ্ছে। বুক কেঁপে ওঠবার মতই জলার চেহারা।

অবস্থা দেখে আগন্তুকরা বড় অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেল। বৃষ্টি হলে সোনায় সোহাগা। সম্ভাব্য দুর্যোগে ফিরে যাবার কথাও ভাবা যায় না। বয়স্ক ভদ্রলোক দিশেহারা ভাবেই শুদ্ধর শরণাপন্ন হলেন, "এখানে কি কোন সেন্টার পেতে পারি ?"

সাধারণ নিয়মে এখানে যারা আসে তারা দিনে আসে আবার দিনেই ফিরে যায়। কারণ এখানে কোন রেষ্ট হাউস নেই। যদি কারও একান্তই থাকতে ইচ্ছা জাগে তবে দেড় কিলোমিটার দূরে বাজারে গিয়ে কোন হোলেটে মোটেলে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সামাজিক কৌলিন্যে আর ঐশ্বর্যের পরিচয় জ্ঞাপক এই পরিবারকে শুদ্ধ কি বলতে পারে, "আপনারা বাজারে গিয়ে ট্রাই করুন"।

পারে না, পারল না। কারণ কোন কোন বয়োবৃদ্ধকে দেখলে মনে যেমন আপনা থেকে একটা সম্ভ্রম বোধ জাগে এনাকে দেখেও তেমনি জাগল শুদ্ধর। মনে' অন্য বিশেষ কারণ সঙ্গের চটকদারীণি নন্দিনী। যার দৃষ্টি এই মুহূর্তে শুদ্ধর নেম্ প্লেটে নিবদ্ধ যেন এমন নাম সে কখনও শোনেনি।

সত্যি নামের বাহার আছে। শুদ্ধ চিত্র শিব-চরিত্র পরিচয় জ্ঞাপক।

তা যা হউক, শুদ্ধ তার নিজস্ব গেষ্ট রুমটা স্পেয়ার করতে এক মুহূর্তও ইতস্ততঃ করল না, অ্যাজ এ স্পেশাল কেস্।

শুদ্ধর বদান্যতায় সস্ত্রীক ভদ্রলোক বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ এবং উদ্বেগমুক্ত।

খাদ্য সামগ্রী ওরা সঙ্গে করেই এনেছে। শুদ্ধকে আন্তরিক ভাবেই অনুরোধ করল এক সঙ্গে খেতে। কিন্তু শুদ্ধ যেই জানাল সে নিরামিষাশী পীড়াপীড়ি করার উপায় আর থাকল না। কিন্তু নন্দিনীর ভুরু কুচকে গেল,

সরু চোখে সরু প্রশ্ন, "এই বয়সে এত কৃচ্ছ্র সাধন? পরক্ষণেই সে বলল, তা না হয় খেলেন না, সঙ্গ তো দিতে পারেন, নাকি ঘ্রানেন অর্ধ ভোজনম ভয়ে তাতেও আপত্তি?"

প্রশ্নের সঙ্গে নন্দিনীর ওষ্ঠাধারে ভেসে উঠল রহস্য ময়ীর হাসি যা দেখে শুদ্ধর বড় বাসনা হল সঙ্গ দেয়। কিন্তু না, এসব প্রভাব থেকে সরে থাকাই বাঞ্ছনীয়, তাই সে গম্ভীর গলায় বলল, "অফিসে জরুরী কাজ বাকী।"

যাক্, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আকাশের চেহারা বদলে গেল। রোদ সমুজ্জ্বল। অফিসে বসেই কাজের ফাঁকে জানালা দিয়ে শুদ্ধ পরিষ্কার টের পেল খেয়াঘাটে নৌকো চলাচল সুরু হয়ে গেছে, যদিও আজ তেমন পর্যটক নেই।

হঠাৎ শুদ্ধ চমকে গেল নন্দিনীর আবির্ভাবে। মন ভরানো সৌন্দর্য তার না হলেও চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কিছুটা প্রকৃতিদত্ত, বাকীটা মেক্ আপ্ পাতলা ঠোট দু'টো লিপষ্টিকে চক্‌চক্ টুস্‌টুসে লাল, তারই ফাঁকে ঝক ঝকে সাদা দাঁতের পাটি চোখ টানে। রোদ চশমায় পরীর মত দেখাচ্ছে, ওফ্ ইটস্ ওয়াণ্ডারফুল!

চেম্বারে ঢুকেই নন্দিনী জানাল, এমন চমৎকার মেঘশূন্য আকাশ যখন এখনই তারা নীরমহল দেখতে যাবে, বাবা মা বাইরে অপেক্ষা করছেন, "আপনিও আসুন না আমাদের সঙ্গে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে নন্দিনীর বাবা শুদ্ধর চেম্বারে ঢুকে একই অনুরোধ করলেন, "আসুন না।"

শুদ্ধ দ্বিধান্বিত, অনেক কাজ তার কিন্তু একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অনুরোধ করছেন, অনাগ্রহের নরম প্রকাশও করতে পারল না, সে সিদ্ধান্ত নিল সেও সঙ্গী হবে এবং ইহাই কর্তব্য।

খেয়াঘাটে এসে সমস্যা দেখা দিল। সাধারণত শুদ্ধ তার নির্দিষ্ট পান্‌সিতে জলাতে ঘোরা ফেরা করে। কিন্তু এখন যে জলোচ্ছাস খোলা পান্‌সিতে চার জনকে নিয়ে যাত্রা বিপদজনক। তাই সে পান্‌সির মাঝিকে নির্দেশ দিল

একটা ছাউনি দেওয়া নৌকা ঠিক করতে, সে মতে হেমন্ত মাঝির নৌকাটাই ঠিক করল।

এতে বসে যাবার মোটা মোটী ব্যবস্থা আছে। বাবা মা নৌকোতে ওঠেও বসেছেন। কিন্তু আদুরে নন্দিনী জেদ ধরল সে পান্‌সিতেই যাবে। শুদ্ধর পানে তাকিয়ে, "আপনি আসুন ত।"

রাধুর পান্‌সিটা ঢেউয়ে টগবগ করে নড়ছে ঐ দেখে সুভদ্র বাবা অনুরোধের স্বরে বললেন, "আপনিও যান তো ওর সঙ্গে।"

শুদ্ধ বলিষ্ঠ যুবক, লম্বা অ্যাথলেটের মত পেটানো শরীর কিন্তু ব্যক্তিত্বে এবং গাম্ভীর্যে সে সাবধানী হুশিয়ারী টাইপের। সংসারে তার কোন বন্ধন নেই। এখানে সে আছে বটে কিন্তু ভেতরটা শূন্য রোমাঞ্চ বঞ্চিত জীবন তার। দিনের পর দিন শুধু প্রকৃতি দেখাও বড়ই একঘেয়ে। মন্দ কি এমন মোহিনী সঙ্গিনী নিয়ে কিছুক্ষণ নৌকো বিহার!

বাবা মাকে নিয়ে ঐ নৌকো আগেই ছেড়ে দিয়েছে। জলার প্রকৃতি দেখে নন্দিনীর পানে তাকিয়ে শুদ্ধ জানতে চাইল, "ভয় করবে না তো, শেষে না মাঝ জলায় পান্‌সি পাল্টাতে হয়!"

"উঠুন তো আপনি" মোহিনীর সজীব অস্তিত্বের মধ্যে চাঞ্চল্য বিদ্যমান, গলায় কর্তৃত্ব।

নৌকোয় ওঠার পর্বটা বেশ মজার। নন্দিনী যতবার উঠতে যায় ততবারই পান্‌সি টাল খায় এবং সরে সরে যায়। আতঙ্কে নন্দিনী যেমন ঘাবড়ে যায় তেমনি আবার হাসেও। শেষে রাধু নেমে পান্‌সি ধরে থাকল। কিন্তু তাতেও হলনা। নন্দিনী হাতটা বাড়িয়ে দিল শুদ্ধর দিকে, "ধরুন" ত! এবং শুদ্ধ নরম হাতের স্পর্শ শিহরণ নিয়ে ধরেই থাকল যতক্ষণ না নন্দিনী উঠে বসল।

রাধু দাড় ভালই বাইতে জানে। আকাশ পরিষ্কার হলেও বাতাস আছে, যদিও তেজ একটু কমেছে। তাহলেও শাড়ী চুল এলো মেলো করতে যথেষ্ট। পান্‌সি চলছে নন্দিনীর শাড়ী চুলও এলো মেলো হচ্ছে। হাত দিয়ে চুলের

খোঁপা সামলাতে না সামলাতেই শাড়ী আগোছালো. এসব ঠিক করতে না করতে আবার পানসিতে টাল্ সামলানোর সতর্কতার কারণে শারিরীক মুদ্রা সম্পর্কে অসচেতনতা বারে বারেই। অন্তর্বাস ঠেলে ওঠা বুকের কুসুম পূর্ণ বৃত্ত।

ইতি উতি সরু চাহনীতে নন্দিনীর শারিরীক বহর পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লক্ষ্য করতে করতে শুদ্ধর মন ক্যামেরার রীল একটার পর একটা ভর্তি হয়ে যেতেই পৌঁছে গেল নীরমহলে। তারপর ভাঙ্গা চোরা রাজপ্রাসাদের মহলের পর মহল দর্শন, তার শিল্প সুষমা বিশ্লেষণ। পারিপার্শ্বিক বনস্পতি দিয়ে ঘেরা ধীবর কুলের উপনিবেশ গুলির বিবরণ. তাদের সমস্যাকীর্ণ জীবন, বাঁচার জন্য নিরবচ্ছিন্ন লড়াই ইতস্তত কথা বার্তা এবং অলস ঘোরাঘুরির সুবাদে অপরিচয়ের স্বাভাবিক আড়ষ্টতা অদৃশ্য হয়ে যেতেই একসময় শুদ্ধ নন্দিনীর বাবা মাকে বলেই ফেলল, "আপনারা আমাকে আপনি আপনি করবেন না।"

সবাই এখন নীর মহলের পূর্ব প্রান্তে যেখানে মিনার বর্তমান। এই মিনা-রের চূড়ায় উঠতে একটা ঘোরানো সিঁড়িও আছে ভিতর দিকে। চূড়োয় উঠে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী—দেখতে নন্দিনী—বড়ই আগ্রহী। অনেকগুলু ধাপ, আঁকা বাঁকা। বাবা মায়ের পক্ষে ওঠা দুঃসাধ্য। তেমন আগ্রহও নেই, তাছাড়া ওনারা বেলায় বেলায় ফিরে যেতে চান। অথচ আদুরে মেয়ের এমনই জেদ সে চুড়োয় উঠবেই, অনেকটা সেই পানসিতে ওঠবার মতই পুণরাবৃত্তি। "আসুন তো আপনি"।

নন্দিনীর উৎসাহে শুদ্ধ আজ্ঞাবহ হতে রাজী হলেও তার বাবা মায়ের পানে তাকাল। ধীর স্থির স্বল্পভাষী সুভদ্র বাবার মন্তব্য হল, "সি ইজ গুড্ বাট্ কণ্ডাক্ট ইজ ভেরি মাচ্ ফিকল টেক্ কেয়ার অব হার।"

মিনারের চুড়োয় উঠতে ধাপগুলি ডিঙোনর ফলে পলে পলে যুবক যুবতীর প্রকৃতিগত স্বাভাবিক অনুভূতিগুলি ক্রমশ জাগরূক এবং এক সময় তারা চুড়োয় পৌঁছতেই কেউ আর কারও কাছে বিশেষ অস্পষ্ট থাকল না।

দুজনেই এখন কিছুটা শ্রান্ত। নন্দিনীর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম! শুদ্ধর বড় ইচ্ছা করছিল নিজের রুমাল দিয়ে তার মুখটা মুছে দিতে। কিন্তু মন চাইলেও নিজের দুর্বলতার ছবিটা দেখান থেকে সে বিরতই থাকল।

চূড়া থেকে সমগ্র এলাকা দৃশ্যমান—বর্ণাঢ্য পটভূমি। আকাশে গুটি কয়েক সাদা তুলোর মত মেঘ, তাছাড়া আকাশ পরিস্কার নীল। দিক্‌বলয়ে অবাক দৃশ্য! উড়ে যাচ্ছে সাদা বক দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে। টিয়া, ময়না, পায়রা, বালিহাঁস, আরও কত রঙ বেরঙের নাম না জানা অচিন পাখি। দূরে মাছ ধরার নৌকোগুলি কি ছোটই না দেখাচ্ছে, আরও দূরে বনের সারি। বড় সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য—ফার ফ্রম্ দ্য ম্যাডিং ক্রাউড্।

দারুণ নির্জনতা, আরাল গোপণীয়তা।

নন্দিনীর প্রাণে ফুর্তি বেশি, জীবনী শক্তিতে টগবগে তার বুদ্ধি আছে আছে চাতুর্য। সে বুঝেছে মিনারের চুড়ায় পৌঁছে যাওয়া মানে মহল দেখা শেষ। এর পরেই ফেরার পালা, ছাড়াছাড়ি এবং বিচ্ছেদ। তাই তার উক্তি হল, "ওফ্ হাউ ওয়াণ্ডারফুল এ প্লেস্! আমরা এখান থেকে সব দেখছি কিন্তু আমাদের কেউ দেখছে না। এমন অপূর্ব স্পটের কোন চিহ্ন দেবেন না? এ কীপ-সেক্!

কিসের চিহ্ন? প্রায় অচেনা এই মায়াবিনীকে কি চিহ্ন দেবে সে?

শুদ্ধর দৃষ্টিটা প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে নন্দিনীর চোখে মিলতেই একটা রহস্যময় আভা ছড়িয়ে পড়ল রহস্যময়ীর মুখমণ্ডলে—প্রশ্রয়ের ঝিলিক সংকেত। ভাষা অপেক্ষা চোখের মর্মার্থ বেশি। ইঙ্গিত স্পষ্ট বোধ্য।

কিমাশ্চর্যম। এই তব প্রার্থণা? ভয়ঙ্কর প্রলুব্ধকর প্রোফাইলে নন্দিনী, কিছুটা তরল, খানিকটা স্বৈরিণী। হাসির সঙ্গে লীলা বিস্ফুরিত। সব মিলিয়ে উত্তেজক-লাভেচ্ছা।

শুদ্ধ রক্তমাংসের মানুষ হলেও নৈষ্ঠিক যুবক এবং সংযমী। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সে একটা উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। একটুও বিচ্যুত হয়নি এত বয়স অবদি। মেয়ে মানুষ নিয়ে উদ্দেশহীন কোন ব্যাপারে তার আগ্রহ নেই। এখন পর্যন্ত সে কোন প্রেম করেনি, কারণ সে মনে করে প্রেমটা কাম ধান্দার বেশি কিছু নয়। ইট ইজ এ ডিজিজ। নন্দিনীর প্ররোচনা মূলক সঙ্কেতে সে পা দিতে

নারাজ। তার ভাবনায় যে কিছুক্ষণ বাদেই চলে যাবে তার সঙ্গে টাচ্-প্লের অঘটন ঘটিয়ে লাভ কি যদি না পরবর্তী মহরার সুযোগ পায়? তার বড় অনীহা এবং সে কারণে শুদ্ধর চোখে মুখে আপত্তিকর একটা ভাব ফুটে উঠে থাকবে। অথবা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায় দেখতে সে অন্যমনস্কতার ভাবে দেখাল।

উৎসাহের জবাবে আগ্রহ না দেখালে অনেকেই দমে যায়। কিন্তু ঐটুক সময়ই নন্দিনীকে ধৈর্যহীনতায় স্পর্শ করতে যথেষ্ট। শুদ্ধর কোন প্রতিক্রিয়া নেই দেখে হঠাৎ মেজাজ পরিবর্তন করে, "দুর তুমি বড় নিগেটিভ্ টাইপের" বলেই আপন আনন্দে চকিত চমকে কি অকুতোভয়েই না শুদ্ধর লিপে সিপ্ দিয়ে নিজের মত করে তড়াক চিয়ার্স—লম্বা নিঃশ্বাস। বড় মধুর দুলর্ভ আনন্দঘন মুহূর্ত। নিঝুম সম্মোহনের মত দম সম কিছুক্ষণ টগ্‌বগাতি মারাত্মক। ভাবটা 'আমি যখন কিছু খাই বিভোর হয়েই খাই' যেন এক মধুপায়ী একটা মাদকতা যার প্রতিটি মুহূর্ত এক এক বিন্দু অমৃত, সম্পূর্ণ নির্জনতার স্বাদ রাজমহলের চুড়ায় রীতিমত রাজকীয় খাতিরের দুর্মর চিহ্ন বিলিয়েই শুদ্ধর মন মানসিকতা ওলট পালট করে দিয়ে তাকে পজিটিভ্ হবার সুযোগ না দিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় লক্ষের ভঙ্গীতে তর তর করে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে যেতে থাকল বিস্ময় বালা। এত দ্রুত কোন মেয়ে আঁকা বাঁকা সিঁড়ি বেয়ে ছুটতে পারে?

কিছু বোঝার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। শুদ্ধর অবস্থা-লা জবাব। কী-স্বচ্ছন্দেই না সে তাকে তুমি বলল! মরি, মরি, সে কী রূপ আর তেজ! সেই সঙ্গে বক্ষের স্পন্দন নরম স্পর্শের শিহরণ হৃদয় হরণ মধুগন্ধি ম্যাজিক স্পেল চমক আছে।

অপ্রস্তুত বিস্ময়ের ধাক্কাটা নিয়েই দুর্মর দুর্মনায়মানভাবে ধীরে আস্তে নামল শুদ্ধ।

এখন ফেরার পালা। নৌকোয় উঠে পড়েছেন নন্দিনীর বাবা-মা, এখন আর পানসি নয়। একই নৌকোয় নন্দিনীও উঠেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে দেখে নিল লিপস্টিকের রক্তরাগ শুদ্ধর মুখে লেগে রয়েছে কিনা।

এপারে এসেই অভ্যাগতরা ব্যস্ত হয় পড়ল ফিরে যেতে। ড্রাইভার ইতি মধ্যে গেষ্ট হাউস থেকে সব জিনিষ গাড়ীতে তুলে নিয়েছে।

এবার বিদায় সম্ভাষনের পালা। অ্যাম্‌বেসেডারে সবাই উঠে বসেছে, এখন গাড়ী ষ্টার্ট দেবে। ঘোলা চোখে শুদ্ধ নন্দিনীর পানে তাকাতেই জাদুকরীর

শ্রুত বাক্য হল, "আই এনজয়েড দ্য প্যালেস ইন ইওর কম্‌প্যানি। ইউ আর নাইস, আই স্যাল রিমেম্বার ইউ, থ্যাঙ্কস্।"

চোখের রহস্যে অশ্রুত ভাব—ভিনি, ভিডি, ভিসি, 'এলাম, দেখলাম, তোমার শুদ্ধ, চিত্তও জয় করলাম, মনে রেখো।'

গাড়ী চলে যেতেই ঘরে ফিরে আয়নার সামনে দাড়িয়ে যে মানুষটাকে দেখছে শুদ্ধর যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। এত অল্প সময়ে এত দ্রুত ভাল লাগা! ঠোঁটে লেগে রয়েছে চকিত স্নেহ সুবাস—অপ্রত্যাশিত এক অনুভূতি নিতান্তই স্বল্প মেয়াদী একটা আনন্দ লহরী। এমনই একটা ব্যাপার যার সঙ্গে প্রেমের কোন সম্পর্ক নেই অথচ প্রতিটি মুহূর্ত একটা দৃশ্যই মনের মধ্যে ঘুরছে সঙ্গে কিছু আক্ষেপ কেন সে উপযুক্ত জবাব দিতে পারল না। অবচেতনে সৃষ্টি হল নতুন জগৎ—চিন্তা স্রোত তৈরী হল দুর্মর চিহ্ন ঘিরে যা কিনা তাকে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে বারে বারে।

বিকেলের পরন্ত রৌদ্রে প্রকৃতি কেমন যেন লজ্জায় লাল হয়ে উঠে আবার বিষন্নতায় ম্লান হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পেঁজা তুলোর মত লালচে লালচে আভায় মেঘগুলো শূন্যে ভাসতে ভাসতে চলেছে দক্ষিণ আকাশ থেকে উত্তরে। এক ঝাঁক বালিহাঁস সমান দুরত্বে প্যাঁক্ প্যাঁক্ করতে করতে উড়ে যাচ্ছে বিকেলের রৌদ্রের সোনায় গুঁড়ো মেখে। মেঘের নীচে আসতেই হঠাৎ কেমন যেন কালো হয়ে গেল তাদের বর্ণ তারপর ধীরে ধীরে বিন্দুতে পর্যবসিত হয়ে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল একসময়।

অন্যমনস্কতার ঘোরে কখন বিছানায় এলিয়ে দিয়েছে নিজের দেহ শুদ্ধর খেয়াল নেই। শুয়ে থাকতে থাকতেই এক সময় অন্ধকারও নেমে এল। তবু শুদ্ধর ইচ্ছা করল না পরিচারককে ডেকে নির্দেশ দেয় আলো জ্বেলে দিতে। অন্ধকারেই সেই দুর্মর চিহ্নটার কথা ভাবতেই বেশ লাগছে চোখ বন্ধ করে ফ্লাশ-ব্যাকে □

রেহানাবন্ধ

প্রেম চাই এমন কিছু হয়ত তীর্থর মজ্জায় ছিল, কিন্তু তৃষ্ণাকেই চাই এমন চিন্তা তার ছিল না। কিন্তু সেই তৃষ্ণাই কিনা তীর্থর জীবনে প্রথম আলোড়নটা তুলল।

তীর্থ তৃষ্ণা একে অপরের পড়শী হলেও কারও সাথেই কারও যোগাযোগ ছিল না। একদিন তীর্থর চোখে একটা পোকা পড়েছিল তৃষ্ণা তখন স্কুলে যাচ্ছিল, চটপট সে হাতের বইগুলু মাটিতে রেখে তার শাড়ীর আঁচল দিয়ে তীর্থর চোখে পড়া সুক্ষ পোকাটা তুলে এনে ফুঁ ফুঁ করে শাড়ীর তাপ দিয়েছিল তীর্থর চোখে।

বলতে গেলে যোগসূত্রের গৌরচন্দ্রিকার সেই প্রথম পর্ব।

বয়স যাই হউক নাবালিকা সুলভ আহ্লাদে ভাসা চেহারা। সুন্দরী সে খুব নয়, আবার একেবারে সাদামাটাও নয়। কিন্তু দুরন্ত এনার্জিতে ভরপুর, এবং এনার্জি আছে বলেই অকাল পক্কতাও একটু বেশি।

তার অকাল পক্কতার মধ্যে যে সুর ও ছন্দ তা দেখলে তীর্থর গা ছম্ ছম্ করে। তীর্থকে দেখলেই তৃষ্ণা দুষ্টুমি ভরা দৃষ্টি নিয়ে ছুটে আসে কাছে। ঠাট্টা তামাশাও করে সমবয়সীর মত। কথা বলতে বলতে ক্রমান্বয়ে চোখ বুলিয়ে নেওয়া তৃষ্ণার অভ্যেস। কথার সঙ্গে চোখ ছোট হয় বড় হয়। কথায় কথায় হাসি, হেলে দোলে শরীরটাই নৃত্য চঞ্চল। হাসিটা বোধহয় ঘুমোলেও যায় না। এমন প্রাণ খোলা মুক্ত কণ্ঠ হাস্য তীর্থ এর আগে কারও শোনেনি। অকারণে লজ্জা সরমের বালাই যেমন নেই মার প্যাঁচও নেই মেয়েটার মধ্যে। বয়স ১৪/১৫ হলেও চোখের মাপে ২/৩ বছর বড় বলেই মনে হয় যখন শাড়ী পড়ে, আবার

ঝুঁকে পড়লে যা রিয়েল— তাই স্বাভাবিক—নবীনা। তরুণী এ মড্ গার্ল সৌন্দর্য এবং যৌন আবেদনের চমৎকার এক মিশ্রণ।

তীর্থর বয়স কম নয়, তবু তৃষ্ণার চোখে সে যেন ছেলেমানুষ অথবা বয়সটা যেন কোন ফ্যাক্টরই নয় তৃষ্ণার কাছে।

তৃষ্ণার সাথে দেখা হলে তীর্থর ফুর্তিই হয়। ঝামেলায়ও পড়ে। কারণ ও যখন কথা বলে একেবারে গায়ে পড়ে, ঠেলা দিয়ে দিয়ে। 'আরে দাঁড়ান না, শুনুন না,' করে করে এমনভাবে কথা বলে নিঃশ্বাস লাগে তীর্থর মুখে।

সাইকেলে যাচ্ছিল তীর্থ। তৃষ্ণা তাকে দেখেই ইশারায় থামতে নির্দেশ দিল। তীর্থ মাটিতে এক পা, প্যাডেলে অন্য পায়ের টো-তে ভর দিয়ে সীটে বসে থেকে ব্রেক কষে থামল।

তৃষ্ণা এগিয়ে আসতে আসতে ইঙ্গিত করল, "এক পাশে আসুন"।

তীর্থ একপাশে এল। কোন কথা নেই তবু তৃষ্ণা তীর্থকে প্যাডেলে চাপ দিতে দিল না। যতবার সে চেষ্টা করে তৃষ্ণা ব্রেক চেপে ধরে রাখে।

"ছাড়, আমার তাড়া আছে।"

"তাহলে আমাকেও নিয়ে চলুন।"

"সাইকেলে ক্যারিয়ার নেই, কোথায় বসবি ?"

"কেন সামনে।"

"তুই একটা মেয়ে তোকে সামনে বসাই কি করে, লোকে বলবে কি ?

"রাখুন লোকের কথা," বলতে বলতে অদ্ভুত তৎপরতায় সে অক্লেশে সামনে উঠে বসল। এমনই অঘটন ঘটন পটিয়সী তৃষ্ণা।

এমনই খেয়ালী আমোদী তৃষ্ণা। সে কখন কি করে বসবে, কখন কি বলবে আন্দাজ করা অসম্ভব। যখন তখন এপ্রিল ফুল। কৌতুক প্রিয়তায় ভরা। সব সময় দুষ্টু হাসি লেগেই থাকে তার ঠোঁটে।

আজ তীর্থর শরীরটা ভাল নয়, তৃষ্ণা খোঁজ নিতে এল।

তীর্থকে শুয়ে থাকতে দেখে, "কী ব্যাপার শুয়ে রয়েছেন কেন ?

"শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, গা হাত পা কামড়াচ্ছে।"

"ম্যাসেজ করে দেব ?"

"তুই করবি, তা হলেই হয়েছে যাক্।"

"কেন, করলে দোষের কি ?"

তীর্থ চমকায় আর ভাবে এমন কোন পুরুষ আছে যার বিছানার পাশে বসে একটা যুবতী মেয়ে তার গা হাত পা টিপ্‌তে থাকলে স্নায়ু শিরা ছিড়ে যায় না ?

না, এমন আরাম উপভোগের ভাগ্য তার নয়। বহুসমস্যার সম্মুখীন, সে পিঠের পেছনে দেওয়াল নেই, পায়ের তলায় চোরাবালির মতন দুর্ভাগ্য। আর একদিন তৃষ্ণা নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "দেখুন তো আমার কব্জিটা টন্ টন্ করছে কেন ? ভীষণ ব্যথা।"

তীর্থ তার হাতটা আলগা করে ধরে দেখল, কিন্তু সে তো ডাক্তার নয়, তবু একটু টিপে টিপে পরীক্ষা করতেই তৃষ্ণা বলল, "টেপাতে একটু আরাম পাচ্ছি।"

"তাহলে নিজের হাত নিজেই টেপ।" তীর্থর কথায় তৃষ্ণা একটা ঝাপটা দিয়ে হাতটা টেনে নিয়ে বলল, "থাক আর বুদ্ধি দিতে হবে না, ঘটে বুদ্ধি থাকলে ত।"

"ঘটে বুদ্ধি নেই বলেই তো মরছি," তীর্থর উক্তি শুনেই তৃষ্ণা স্থির দৃষ্টে তাকাল, চোখে পলক না ফেলে তারপর হঠাৎ সে জিভ ভেঙ্গাল এমন ভঙ্গীতে যা হৃদয় স্পন্দন সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট।

বেশ লাগছিল তৃষ্ণাকে অমন ভঙ্গীতে। তীর্থ বুঝতে পারে তৃষ্ণা তার মনের ভাব গোপন রাখতে নারাজ। কিন্তু স্পষ্টতই তীর্থ নিজেকে গোপন রাখতে চায়। যা থেকে আদৌ ফয়দা তোলা যাবে না। তাতে উৎসাহ দেখান উচিত নয়। তৃষ্ণার সঙ্গে স্নেহের সম্পর্কই বজায় রাখতে হবে।

কিন্তু তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ক্রমশঃ আর ভেঙ্গানী-নয়, ভেঙ্গানীর সঙ্গে মিশেছে একের পর এক ছোট খাট কেরামতি, তির্যক দৃষ্টি, চটুল তামাশা আনুষঙ্গিক আরও কিছু যার ভিতরে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় সম্পর্কটা। যেমনটি আছে তেমনটি রখাতে চায় না তৃষ্ণা আর একটু এগুক্।

তীর্থ সতর্ক। তবু টেনশন পর্যায়ক্রমে বাড়তে বাড়তে মনেতে পিপাসা জমতে থাকল। মনে মনে ফণ্ডেল, প্রতিটি মুহূর্তেই তৃষ্ণাকে নিয়ে কিছু না কিছু ভাবে। কেন ভাবে ? কি কারণে ভাবে ? এমন ভাবতে থাকলে শরীর স্নায়ু কত দিন টান টান সতর্ক রাখতে পারবে ?

তৃষ্ণা জানে না তার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া চলছে তার কী জ্বালা। কিন্তু সে অকুতোভয়ে হাসে। তীর্থর নৈকট্য তার একান্তই কাম্য।

এক একদিন তীর্থ ভেবেছে তৃষ্ণাকে বলবে, "দয়া করে তুই আমাকে খোচাস না। আমাকে একটু নিরিবিলি থাকতে দে, বেশি মাখা মাখি ভাল নয়।"

কিন্তু বলবে কি, অনীকার মধ্যেও বুকের মধ্যে প্রবল ইচ্ছা—যা ঘটার তা লিমিটেড্ টেক্নিকে ঘটতে দিলে ক্ষতি কি ? পরক্ষণেই অন্যমন রাশ টেনে ধরে, না, তৃষ্ণার সঙ্গে অমন কোন কাণ্ডে লিপ্ত হবার কোন মানে হয় না। অশ্রেয়ষ্কর। মনের মধ্যে দ্বৈতশাসন।

অর্থাৎ যদিও একটা উস্খুস ভাব মনের মধ্যে সর্বক্ষণ, তৃষ্ণার প্রতি একটা মমতাও দানা বেধে গেল ক্রমশঃ।

সেদিন কি একটা কার্জে ব্যস্ত ছিল তীর্থ, তৃষ্ণা কখন যে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল টেরও পায়নি। কিন্তু যেই না তৃষ্ণা তার চোখ টিপে গা ঘেষে দাঁড়াল তীর্থর মন শির শির, সঙ্গে সঙ্গে কাজটা বন্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে সে তৃষ্ণাকে ধরল, 'খুব পেকেছিস্ যা হউক !"

তৃষ্ণা একটু হাসল ! ওষ্ঠ ভিজে ভিজে, চোখে আলোর দ্যুতি, তীর্থকে প্রলুব্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট মনের মধ্যে ফনাটা তুলতে যেতেই হঠাৎ মনে হল এই অপ্রাপ্ত বয়স্ককে ব্যাক্তিগত জীবনে ধরে রাখতে না পারলে সম্পর্কটা নষ্ট করে লাভ কি ? অমন ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণাকে ধরেও তীর্থ ছেড়ে দিল "বড় ডিস্টার্ব করিস; তুই এখন যা ত।"

আদর্শহীনতার অভিঘাতে দুর্বল হতে নারাজ।

এর ফলে রোজকার দেখা তৃষ্ণাও বদলে গেল। যে তার প্রাণের স্ফুরণ, প্রকাশ ব্যঞ্জনাকে অবহেলা করতে পারে তার কাছে সে আর যাবে না। তার সুন্দর সারা মুখে একটা অচ্ছিল্য পাকা জায়গা করে নিল। কাঠিন্যের তকমায় আটা। এবং শেষে উদাসীনতা।

তীর্থর অবস্থা সঙ্গীন। ইতিপূর্বে তৃষ্ণার এক তরফা ব্যাপার স্যাপারে তার মন মেজাজ খারাপ হতো ঠিকই কিন্তু এখন যে সে কাছেই ঘেষছে না। চোখের চাহনীতে কেমন বক্র হাসির রেখা। যেন এত খারাপ লোক সে জীবনে দেখেনি।

ওসব দেখে তীর্থর ভিতরে কেন এত জ্বালা? অদ্ভুত ধরণের মানসিক কষ্টে সে ভুগছে। কিছুই তার ভাল লাগছে না। কাজে কর্মেও মন বসাতে পারে না। নরম গলায় সে একদিন তৃষ্ণার কাছাকাছি গিয়ে বলতেও চেয়েছে, "কাম্ অন্ লেট্ আস্ ফরগেট দি হোল থিং, আমাদের সম্পর্ক আগের মতই হোক।"

কিন্তু তৃষ্ণা তেরিয়া। অর্থাৎ সম্পর্কের ভিত্ নড়ে গেছে।

এভাবে কদিন থাকা চলে? কি করবে তীর্থ? কি করা উচিত? নিজের মধ্যে হাতড়ায়, একটা আপোষ সূত্র রচনার প্রয়াসে তার হৃদয় আনচান। কিছু আমোদ প্রমোদ চাই। সত্যিই তৃষ্ণার মিষ্টি হাসিটা মুখে পুড়ে নেওয়ার মতো। অর্থাৎ মানসিক শৃঙ্খলা বলতে তলানিতে।

গোড়ার দিকে অভিমান জমা থাকার কারণে অনাগ্রহী ঘোরাফেরা করলেও আগ্রহতা প্রকট হয়ে গেল তৃষ্ণার আচরণেও।

অর্থাৎ নরনারী একের প্রতি অপরে আকৃষ্ট হলে কোন বিরোধই বেশিদিন স্থায়ী হয় না। একে অপরকে ভাল লাগলে সম্পর্কও আঁতাতের দিকেই এগোতে থাকে। আচরণটাই হয়ে যায় অভিসন্ধিমূলক সুযোগ সন্ধানী।

আসলে তীর্থ ভুগছে শুদ্ধ যৌবন নিয়ে আর তৃষ্ণা ভুগছে তারুণ্যের সতেজতায়।

তৃষ্ণা মোটেই তীর্থর উপযুক্ত নয়। কিন্তু অন্য কেউ না থাকার ফলে নিতান্ত বাধ্য হয়ে বা না পারতে হঠাৎ একদিন আঁতাত স্টার্ট হয়ে গেল। কোন লুকোচুরি না করেই—একেবারে দিনে দুপুরে—বড় ইন্টিমেট টাচ্।

স্পর্শেতে বোধগম্য হল কার আকর্ষণ প্রেমে, আর কার যৌনতায়। স্পর্শ ঘন হয় মাত্রাও বাড়ে সঙ্গে কিছু উদঘাটন। ঘন নিশ্বাসে ভারী হয়ে যায় মুহূর্ত এবং মহুর্মুহু—মাল্যগন্ধ বিলেপন।

তৃষ্ণার চোখে খুশিয়াল অভিব্যক্তি। কত আকাঙ্খায় তীর্থকে পাওয়া, যার স্পর্শে বড় আরাম। গর্বে পুলকে হৃদয় তার উত্তপ্ত এবং আশাতিরিক্ত প্রাপ্তির দম্ভে কণ্ঠে গুঞ্জন ধ্বনিত, "ও তীর্থ, ইউ আর সো ফাইন।"

যেন এক আহ্লাদিত আনন্দময়ূরী। চোখ দুটো হর্ষে জ্বল জ্বল।

সান্নিধ্য হয়ে যাবার ফলে তৃষ্ণার স্বভাবে চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পেল। ফলে তীর্থর নিভৃতিটুকুও গেল। এবং ক্রমে বেশি করে মজা আর রস খুঁজে নিতে স্প্রিং এর মত চাহিদাও বেড়ে যেতে লাগল—আড়ালে আবডালে রম্য খুনসুটি।

আশ্চর্যের আশ্চর্য, বয়সে এত ছোট হয়েও সে কিনা বিনা ক্লেশে তীর্থকে সমবয়সীর মত তীর্থ তীর্থ বলে ডাকতে শুরু করল।

সন্দেহবাদী ২/১ টি মেয়ের চোখে ধন্দও দেখতে পেল তীর্থ। সে ধন্দই তীর্থর মনে চেপে বসল একদিন তৃষ্ণা আর লিপা নামে আর একটি মেয়ের কথোপকথন শুনে। ওদের দুজনে ভীষণ রেষারেষি।

লিপা ঃ— একটা বয়স্ক লোককে তুই তীর্থ তীর্থ করে ডাকিস এ কেমন কথা?

তৃষ্ণা ঃ— কেন লেখক শঙ্কর কিংবা তারাশঙ্করকে সবাই নাম ধরে ডাকে না? ওতে কি স্বনামধন্য লেখকদের খ্যাতি বা সম্মান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?

লিপা ঃ— তোর আরগুমেন্ট আমি বুঝি না।

তৃষ্ণা ঃ— তা বুঝবি কি করে? লজিক না পড়লে এমনই বুদ্ধি হয়।

লিপা ঃ— ঠিক আছে চালিয়ে যা, যদি আমার দরকার হয় জানাস, দ্যূত ক্রীড়ায় আমি তোকে সাহায্য করতে পারব।

তৃষ্ণা ঃ— তুই আমাকে কচু সাহায্য করবি। তোর এত আগ্রহ কেন? নিজের এলেম জাহির করতে চাস্ না টেক্কা দেবার মতলব? না হিংসায় জ্বলছিস্!

লিপা ঃ—তোর ডানা গজিয়েছে, গোল্লায় গেছিস।

তৃষ্ণা ঃ— তুই কি তোর ডানা ছেঁটে ফেলেছিস্? চালনী বলে ছুঁচ্ তুই কেন ছেদা?

লিপা ঃ— তোর সর্বনাশ হউক।

তৃষ্ণা ঃ— সেরকম কিছু হলে তুই খুব মজা পাবি না?

অমন কথপোকথন শুনে তীর্থ অবাক নার্ভাস। তার ভয় অমন রেষা-রেষির ফলে সে না কোন খপ্পরে পড়ে যায়। সে আবাস পরিবর্তনের কথা চিন্তা করতে লাগল এবং যত সত্বর। নিজেকে নিজে রক্ষা না করলে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

আবাস পরিবর্তনের দিন তৃষ্ণার অনেক প্রশ্ন করার ছিল। কিন্তু একটি কথাও না বলে সে হতাশায় কাজল চোখে সজল দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থেকে চুপ চাপ দেখল তীর্থ বাক্স পেট্রার সঙ্গে একই গাড়ীতে কিভাবে উঠে বসেছে। ড্যাবড্যাবে তাকিয়েই রইল শূন্য উদাস চোখে বিষাদ প্রতিমার মত।

একটা ইচ্ছা সুখ যখন তার মনে দানা বাঁধছিল তখনই আশাভঙ্গের নিষ্ঠুর আঘাত ফলে তার বয়সটা যেন আরও পাঁচ বছর এগিয়ে গেছে। যা দেখে তীর্থর বুকটা ছ্যাৎ ছ্যাৎ ধক্ ধক্। তাই তো তীর্থর মনে প্রশ্ন এই বিষাদ প্রতিমাকে ছেড়ে চলে গেলে তার লাভ হবে না লোকসান হবে? তাকে কি পস্তাতে হবে?

তীর্থর সঙ্গে তৃষ্ণার যা হল বলতে গেলে কিছুই না, স্মৃতিতে হারিয়ে যাবারই কথা। তবু কেন তীর্থর অন্তরে সময় সময় তৃষ্ণা তৃষ্ণা করে? ৪৪/৪৫ বছর আগের কথা। তীর্থর স্মৃতিশক্তিও এখন তত প্রখর নয়। অনেক পরিচিত জনের চেহারাও নাম সে ভুলে গেছে সেই তৃষ্ণা এখন কোথায় আছে? বেঁচে আছে কি নেই তাও সে জানেনা অথচ এখনও তার হৃদয়টা তৃষ্ণাতে রেহানাবদ্ধ স্বপ্নের ঘোরে আশ্চর্য মায়া রোমাণ্টিক মোহ। এত বছর বাদেও তীর্থর মনে তৃষ্ণা এক বিশেষ সম্পদ □

রূপান্তর

রমণী কারও নাম নয় বিবরণ, অর্থাৎ যা যা বলা যেতে পারা যায় সেই অনেক বিশেষণের এক বিশেষণ,

আসলে মেয়েটির নাম মনোরমা, ওটাও নাম মাহাত্ম্য—মনোরম বলেই মনোরমা। ভেশভূষায় বহুজন চিত্তরঞ্জিনী।

সৌন্দর্য্য সম্পর্কে খুব সচেতন এই মেয়েটি। বয়স সতের কি আটার টেনেটুনে কুড়ি। বেশ সুন্দর, সুন্দর মানে লম্বা ফর্সা, স্মার্ট, গ্রীসিয়্যাল কাট চোখমোখ, স্যাম্পু করা ঘন চুল। অমন যার চেহারা সে লাখ পতির শর্যা সঙ্গিনী হবার যোগ্যা।

যে দেখে সেই বলে, খাসা বিউটিফুল হার্ট লাভলি সিম্পলি ডিভাইন! অপূর্ব অপরূপ আশ্চর্যই হতে হয় একই অঙ্গে এতরূপ অপরূপ। ঠিক নামই হয়েছে মনোরমা। কিন্তু সুপ্রিয় যেদিন এই মেয়েকে দেখল সেদিনই মনে মনে নাম দিল রমণী বলে।

মনোরমা নাম খারাপ নয় কিন্তু ও নামে কেউ ডাকে না যে তাকে। কেউ ডাকে 'মনু' বলে কেউ ডাকে রমা বলে।

ঐ সব নামে ডাকলে ফিটফাট রমণীর উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে যায়, যায় না?

তাই সুপ্রিয়র মোটেই পছন্দ নয় ঐ মনোরমা নামটা কবে কোথায় কি উপলক্ষ্যে দেখেছিল ঐ মেয়েটিকে সুপ্রিয়র সবই মনে পড়ে।

প্রথম দেখেছিল মেয়েটিকে সিনেমা হলে ঢুকতে বসেছিল সুপ্রিয়রই সামনের সারিতে, তখনই সুপ্রিয়র ইচ্ছা করছিল সিটটা পাল্টে ঐ মেয়েটির কাছে পাশাপাশি গিয়ে বসতে।

কিন্তু তাতো হবার নয় সাথে ছিল তার মা বোনেরা, তাছাড়া পরিবেশটা কি !

এর পরে দেখেছিল তাকে আরোহীবিহীন একটা মোটর সাইকেলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে।

মোটর সাইকেলটা কার ? কিন্তু সুপ্রিয়র ইচ্ছা করছিল ঐ মোটর সাইকেল তুলে নিয়ে ভোঁ করে দেয় এক ছুট্। এরকম মেয়ের জন্য হিরো হওয়া যায়।

কিন্তু তা কি করে সম্ভব ? সুপ্রিয় জানেই না মোটর সাইকেল চড়তে। কি করে ছুটবে ?

এর পরে দেখছে এক বিয়ে বাড়ীতে। সঙ্গে সঙ্গে একটা আবছা ইচ্ছা মনের উপর দিয়ে ভেসে গেল। কি তার পরিচয় ? কি তার জাত ? গোত্র কি ? ওসব দিকে গেলই না সুপ্রিয়, তার ইচ্ছে ঐ লগ্নে ঐ বিয়ের বাড়ীতেই ওকে নিয়ে সাজান বিয়ের আসনে বসেই পড়ে।

এরপর আরও অনেক দিন অনেক অবস্থায় দেখেছে, দেখেছে নানা পরিবেশে, অনেক জনের মাঝে, আবার একা একা ও দেখেছে, দেখে দেখে তাকে একান্তে পাবার আকাঙ্খাটা কী প্রবলই না হয়ে গেল !

কিরূপ ! কিরূপ ! এমন রূপবতী মেয়ে তার চোখে যে আর পড়ে নি, পড়েনি বলেই সুপ্রিয়র নেপথ্য নিঃশ্বাসের কারণই হয়ে গেল সে, সুপ্রিয়র অনুমান করল এই মেয়েটি হয় তার মন ভরাট করবে নয়তো শূন্য করবে—নিয়তিতে যা হবার হবেই। তবে তার বিশ্বাস চাওয়া পাওয়া এবং দেওয়ার কিছু ঘটনা ঘটবেই। এর পরেই খোজ, খোজ, কে এই মেয়ে ? বাড়ী কোথায় ? জাত কি ? কি করে ? কি পড়ে ?

প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে নিজের স্বপক্ষে অনেক কিছু পেয়েও গেল, জানল মেয়েটি ভাল, কিন্তু খুব কড়া প্রকৃতির, নিয়মের বাইরে কাউকে কোন সুবিধা দিতে নারাজ। কারণ সে মনে করে ভোগ স্বাভাবিক, কিন্তু উপভোগ

পাপ। অমন পাপেতে নিজেকে জড়ায় নি—জড়াবে না। মনে মনে স্থির করে নিল সুপ্রিয় এই মেয়েকে সে ভোগই করবে উপভোগ না। সেই লোভেই কার্যসিদ্ধির সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে সুপ্রিয় নিজেই এসে গেল ওদের বাড়ীতে একটা সরকারী তদন্ত উপলক্ষে।

অল্পেতেই জমিয়ে ফেলল রূপবতীর মায়ের সাথে মাসিমা ডাকের মাধ্যমে। এবং এই সামান্য ডাকের ভেতর দিয়ে ঘনিষ্ঠতার সোপানটা তৈরী করে ফিরল সুপ্রিয় সেদিন হৃষ্টমনে পুলকিত এক ভাব নিয়ে।

সেই প্রথম দিনের পরিচয়ের সামান্য সূত্র ধরেই আনাগোনা সুরু হলো সুপ্রিয়র এই রূপবতীর বাড়ীতে।

ধীরে ধীরে আনাগোনার উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার ধরা পড়ল মনোরমার চোখেও।

মেয়েরা চাহনী দেখে পুরুষের অভিসন্ধি বুঝতে পারে।

সুপ্রিয় যে খাস জমি বন্দোবস্ত করিয়ে দেবে সেই তদন্তে আসছে না আসছে তারই লোভে—অর্থাৎ পুরুষগুলো সবই একজাতের।

জানিত ব্যাপারের আভাষই সুপ্রিয়র চোখের দৃষ্টিতে। রূপই হয়েছে তার জ্বালা, এই রূপের কারণেই সে হয়ে পড়েছে বহু পুরুষের নেপথ্য নিঃশ্বাসের কারণ। ঐ পুরুষগুলোর চোখ দেখেই নিজের রূপের আকর্ষণ ক্ষমতা টের পায়।

আগে ভয় পেতো, অনেক দেখে এখন আর তত না। যথা সম্ভব এড়িয়ে চলতেই সচেষ্ট থাকে ঐ সব দৃষ্টি দোষ থেকে।

কিন্তু সুপ্রিয় কি জানে এই রূপবতীর মনের কথা? সে যে বিমুগ্ধ। সেই বিমুগ্ধ ভাবটাই প্রকাশ করে ফেলল একদিন আচম্বিতে মিষ্টি করে 'রমণী' ডাক দিয়ে প্রথম সম্বোধনেই।

প্রথম সম্ভাষণেই গোটা মনোরমার জ্বলে উঠেছিল সে যখন বুঝল ঐ রমণী ডাকটা তাকে উদ্দেশ্য করেই। প্রতিবাদের একটা ঝঙ্কার মনেতে এসেও গেল, "কি রমণী রমণী করেছো? কেন আমার নাম নাই? রমা বা মনু বলে ডাকতে পারেন না?"

ঝঙ্কারের শক্ত কথাগুলো মুখের ডগায় আসতেই ভাবল সূত্রপাতের সম্পর্কটা খারাপ করা উচিত না—বিশেষ মা যেখানে সুপ্রিয় সুপ্রিয় করতে একেবারে গলে যায়-অজ্ঞান।

কিন্তু সুপ্রিয় যেন ভাটা পড়তে দেবে না, "রাগ করেছ রমণী ডাকলাম বলে ? রমণী নামেই তোমাকে মানায়, আমি রমণী বলেই ডাকব তোমাকে।"

মনোরমা যেন আকাশ থেকে পড়ে, বিস্ফোরীত চোখ মেলে তাকায় ঐ প্রথম সুপ্রিয়র পানে তাকিয়েই অপ্রস্তুত হয়, উঁকি ঝুঁকি দেয় মনেতে অস্বস্তি সুপ্রিয়র রঞ্জনরশ্মির মত দৃষ্টির তোড়ে। প্রশ্ন খেলে যায় কেমনতরো জানি এই সুপ্রিয় লোকটা ?

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় এ ধরণের তাকানোতে কি জানি একটা মতলব আছে। সঙ্গে সঙ্গে বুকের কম্পন শুরু হয়।

কথা না পেয়ে কথা বলে সুপ্রিয়। 'আসলে আমি মানুষটা কিন্তু মোটেই খারাপ না কি বল রমণী ? '

এবার রমণী মৌনের বদলে উত্তরই দেয়, 'আমরা মানুষকে অত খারাপ চোখে দেখিও না, ভাল হলেই ভাল।

বলেই সুপ্রিয়র সুমুখ থেকে চলে যেতে পা বাড়াল এমন একটা ভঙ্গীতে যেন সে ভঙ্গিটাই মুখর হয়ে থাকল, আপনি একটা মানুষ না কামুক। অনেক ভেজাল আছে আপনার মধ্যে, মিষ্টি শয়তান আর কাকে বলে !

পরম রহস্যের মতই বুঝে নেয় মনোরমা তার মধ্যে যা আছে তার আকর্ষণেই সুপ্রিয়র এই আনাগোনা, কথা না পেয়ে গায়ে পড়ে কথা।

মানে তাকে জ্বালাবে এই সুপ্রিয়, মাত্র সুরু। এ কি 'রমা' না, 'মনু' না, "রমনী"—এটা কি ? মানে তার প্রতি সুপ্রিয়র যে একটা অবৈধ আকর্ষণ ঐ রমনী ডাকেতেই স্পষ্ট। তাকে লোভাতুর করতে চাইছে।

কেমন বলল 'আমি মানুষটা খারাপ না', আসলে একটা খচ্চর, খচ্চরামিটা তার অভ্যেসের মধ্যেই মিশে আছে।

অথচ মা কিনা সেদিন ধমকের সুরে বললেন, "সুপ্রিয়কে সুপ্রিয়দা ডাকতে পারিস না? সুপ্রিয়বাবু কি? শুনতে ভাল লাগে না কি?"

ফুঃ! যার দৃষ্টি আর হাসি তার সারা অঙ্গে ছোবল মারে তাকে আবার দাদা?

কি বিচ্ছিরি হাসি, আর কি বিচ্ছিরিই না দৃষ্টি। হাসে যখন নীচের ঠোটের মধ্যখানে একটা তিল নজরে পড়ে। ওটাই প্রমান করে সুপ্রিয়র লোলুপতা কামুকতার গভীরতা, এই মানুষটিকে কিনা মায়ের আদেশে সুপ্রিয়দা বলে ডাকতে হবে?

একটা আস্ত বাঁদর তাকে আবার দাদা! যত বদের হাড়ি। ইচ্ছা করে সুপ্রিয়দা না ডেকে কামুদা বলেই ডাকে। রমনী ডাকের উত্তরে অমনভাবে ডাকলেই ঠিক রিটর্ট হয়।

রিটর্ট দেবার ভঙ্গীতে সেদিন যেই না রমনী ডাকটা শুনল অমনি মনোরমা বলল, "রমনী তো আমার নাম নয় মা আমাকে মনু বলেই ডাকেন, আপনিও না হয়...."

বাকী কথা বলা হলো না সুপ্রিয়র চোখের ভ্রুকুটি দেখে, যদিও ইচ্ছা ছিল বলে "আপনি যদি অমন রমনী রমনী করেন তবে আমিও আপনাকে কামুদাই ডাকব"

কিন্তু মনের কথা অনুচ্চারিতই রয়ে গেল, স্তব্ধ হয়ে গেল বাকী কথা সুপ্রিয়র চোখের তারা দেখে।

ক্লান্তই বোধ করে মনোরমা, একটা অসহায় ভাব ফুটে ওঠে। এই মানুষটার মুখোমুখি হলেই কেমন যেন নিজের সত্বাবোধ খানিকটা স্তিমিত হয়েই যায়। আর ঐ অবস্থায় কিনা সুপ্রিয় অজিজ্ঞাসিত হয়ে কৈফিয়তের সুরে বলল, "আমার কি কোন অপরাধ হয়েছে তোমাকে রমনী ডাকি বলে? তোমার কাছে আমি না আসতে প্রস্তুত আছি কিন্তু যদি আসি তবে ওনামেই

ডাকব তোমাকে বুঝেছ রমনী, মনু. ডেকে আমি তোমার কমনীয়তা রমণীয়তা ম্লান করতে পারব না—যে ফিটফাট পরিপাট তুমি !"

ছিচকাদুনে কথা যেন জানেই না এই সুপ্রিয় মনে মনে ভাবে মনোরমা ভারি জবরদস্তি তো ! বেশী ভূমিকা না করে কেমন অকপটে বলে ফেলল তড়বড় করে অতগুলো কথা !

থতমত খেয়ে যায় মনোরমা; মেয়েদের সাথে এই বুঝি কথা বলার ঢঙ। ছিট্ আছে নিশ্চয় মাথায়।

বড়ই অস্বস্তি বোধ করে। সুপ্রিয়র ভাবভঙ্গী যত দেখে ততই ফুসতে থাকে মনে। স্থির করে আগে ভাগে সে অভদ্র হবে না তবে প্রয়োজন হলে সে ছেড়েও দেবে না—ছিট্ টিট্ করে দেবে ঠাস ঠাস্ কথা বলে।

ভেতরের গুমোট রাগে ভুরু জোড়া যেভাবে তীর হলো তাতে অদৃশ্য বিজ্ঞপ্তী টাংগানো হয়ে গেল যেন, "আমার দিকে অমন করে তাকিও না সুপ্রিয়া, সাবধান বলে দিলাম।"

কিন্তু সহজে বিচলিত হবার ছেলে সুপ্রিয় মোটেই নয় বাঁকাচোরা মেয়ের ভ্রুকুটি সে অনেক দেখেছে এবং কি করে বাঁকাচোরাকে বশ মানাতে হয় সেও কিছু কিছু জানে। তাই তার দৌরাত্ম্যের রূপও নিত্য নূতনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতি প্রভাতে শুভদিনের সূচনা করে রমণীর কথা ভেবে ভেবে। এবং শুভ সন্ধ্যা জানায় রমণী ডাক, দিয়ে মিটি মিটি হেসে মনোরমার দিকে তাকিয়ে। আর দেখতে দেখতে তার জলতেষ্টা পায় ঘন ঘন।

অমন বার বার জল দেবার মধ্যে মনোরমার যে কত অসহায় সেটা বোঝা যায় কিন্তু ওই অসহায়তার রূপটা বড়ই রমণীয় ঠেকে সুপ্রিয়র চোখে। এবং যতবারই জল চায় ততবারই সে রমণী বলেই ডাকে তাকায় সরাসরি হাসেও।

অমন হাসি ডাক আর তাকানি মনোরমার শঙ্কার কারণই হয়, মুখে বিড়ম্বনার ছায়া পড়ে, মনে হয় এক কলসী জল খাওয়ালেও সুপ্রিয়র জলের তেষ্টা মিটবে না।

বলা বাহুল্য জল পরিবেশন করার ধৈর্য্য বা উৎসাহ কোনটাই মনোরমা পায় না, কোনমতে জলের গ্লাসটা রেখেই সে পালাতে চায়।

কিন্তু সুপ্রিয় ছাড়বে কেন? তার ভেতরটা যে দুষ্টুমিতে ভরা তাই সে বলে, "পালাচ্ছ কেন? একটু বোসো না এখানে একটু গল্প করা যাক।"

মনোরমা ঘুরে চলে যেতে যেতে বুঝিয়ে দেয় "আপনার মত খচ্চরের কাছে বসে গল্প করতে আমার মত মেয়েকে পেতে আপনার একযুগ তপস্যা করতে হবে, বুঝলেন?"

দ্রুত সে চলে যায়। এই দ্রুত চলার হাবভাব দেখে এটাই স্পষ্ট হয় যে কোন কিছুর আশঙ্কায় মনোরমা ভীত সন্ত্রস্ত।

ঐ দেখে সুপ্রিয় কিছুক্ষণ একা একা বসে থেকে শেষে হাই তোলে এবং এক সময় ওঠেও যায়। এই ভেবে আচ্ছা ঠিক আছে কাল দেখা যাবে।

দৈনন্দিন দৌরাত্ম্যে মনোরমা অস্থির হয়ে উঠল, এমন একটা দিনও যায় না যেদিন তার রাগ বা উৎকণ্ঠার অবধি থাকে না। কিন্তু মা টা যে কি বোকা সেই সাবেকি মন নিয়েই সবাইকে বিচার করেন, সবাইকে ভাবেন ওনার মতই বুঝি সরল।

এত রাগ হয় মনোরমার কি বলবে? কাকে বলবে? সেদিন মা বললেন কিনা, "সুপ্রিয়টা এসে একা একা বসে থাকে, একটু কথা বার্তা বলতে পারিস না তুই? কি মেয়েরে তুই? তুই নাকি আবার কলেজে পড়িস, ছেলেটা আসে আর তুই কিনা এড়িয়ে চলিস! যা ওর সাথে বসে একটু গল্প করগে, যা উঠলি!"

মা টা যে কি কিছু বোঝেন না। কেমন উদাসীন, মা যখন এসব নিয়ে মাথা ঘামান না তখন দায়ে পড়েই এসে বসতে হয় সুপ্রিয়র মুখোমুখি।

কিন্তু বসবে যে কি সাধ্য! সেদিন যখন অমন তাড়া খেয়ে এসে বসল। বসতে না বসতেই সুপ্রিয় বলে কিনা,

"বুঝলে রমণী তোমাকে দেখলেই মনে হয় যেন কত দিনের চেনা, তাই ইচ্ছা করে কেবল তোমার সাথে কথা বলি, কত কথা যে আসে মনে কি বলব তোমাকে।" কথা বলার সময় সরাসরি মর্মভেদী দৃষ্টির ছোবল পড়ে তার গায়ে। নোরমার চোখে বিরক্তি বহ্নি ফেটে বেড়োয়।

"আপনার উদ্দেশ্যটা কি খুলে বলুন ত? "সেই বিক্ষোভেই সে প্রথমেই বলল "আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা পরিস্কার হওয়া দরকার।"

সুপ্রিয় বরাবরই চটপটি, তার উক্তি হয়, "কয়েকটা কথামানে? সব কথাই পরিস্কার হওয়া দরকার। আমার তোমার মধ্যে আড়াল থাকবে কেন?"

ইস্ কি কথা বলার ঢঙ্! অনতিক্রম্য বিহ্বলতায় মনোরমা মুক হয়েই গেল। ভাবল শক্ত কিছু বলে, কিন্তু পারল না বলতে পরিবর্তে বসে রইল স্থানুর মত কিছুক্ষণ, শক্ত হবার চেষ্টায় নিজের ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরে—কি বলবে তারই যেন মুশাবিদা করছে মনে মনে।

কিন্তু বিস্ময়েরও শেষ নাই। মনোরমার রাগ রাগ মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চায় সুপ্রিয় "তোমার কি শরীর ভাল নয় আজ?"

রাগের জেরেই মনোরমা বলে, "যে রেটে পাগলামি চালাচ্ছেন শুধু শরীর না মাথাই খারাপ হবে।"

তবু যা হোক এতদিনে কথা ফুটল, তাই উত্তরও দেয় সুপ্রিয় "হয়ত ওটাই আমার নিয়তি নইলে আমি কি জানতাম এই ৩৬/৩৭ বছর বয়সে হঠাৎ তোমার মত বয়সী একটা মেয়ের কাছে নিজের দাবী জানাতে এত উতলা হবো?"

এর পরেও বসে থাকা চলে এই লোকের সামনে? মাকে বললে মা হয়ত বিশ্বাসই করবেন না। হয়ত বলবেন,

"তোর বেশী বেশী, কি কথার কি অর্থ করিস তুই জানিস, বড় কদর্থ করতে পারিস কথায় কথায়।"

মনোরমার ইচ্ছা করছিল বলে, "আচ্ছা লিখে দিন তো আপনার কি কি দাবী।"

ঐ লেখা কাগজ দেখালে যদি মায়ের টনক নড়ে। কথা বলতে ইচ্ছাই করে না এমন অসমবয়সী লোকের সাথে-প্রবৃত্তিও হয় না, বেশ শিক্ষা প্রাপ্তি হয়েছে মায়ের কথায় সুপ্রিয়র সম্মুখে এসে বসে, সে ওঠে দাঁড়িয়ে পা-ই চালাব এমন একটা ভঙ্গীতে যেন বাতাসে কথা ছড়িয়ে দিল,

"আপনার ধৃষ্টতা তো কর্ম নয়। আমাকে সুলভ একটা প্রাপ্য বলে ধারণা হলো আপনার কি করে? কি ভাবেন নিজেকে?"

এরপর থেকেই মনোরমা বড় গম্ভীর। এত গম্ভীর যে সুপ্রিয়র নিজেরই কেমন ভয় করে। তবুও সে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় রান্নাঘরের দিকে। অনেকক্ষণ চুপ চাপ দাঁড়িয়েই থাকে।

মনোরমার মা কি করতে রান্নাঘরের দিকে আসতেই অমন করে সুপ্রিয়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বলেন, "কি রে মনু তুই কি? সুপ্রিয়কে একটা কিছু বসতে দে—তোর কিছুই খেয়াল থাকে না, কি ভাবিস সব সময়?"

একমনে রান্না করে যাচ্ছিল মনোরমা, হঠাৎ যেন সচেতন হলো মায়ের বকায়। মুখে কিছু না বলে সে একটা পিঁড়ি পেতে দিল সুপ্রিয়কে রান্নাঘরেই। ঐ পিঁড়ি পেতে দেবার মধ্যে চোখে যেন এক ঝলক অংগার খেলে গেল তার। ঐ দেখে এক নিমেষে হিম হয়ে যায় সুপ্রিয়র সব উদ্দীপনা। একটু মীইয়েই গেল যেন।

অমন অবস্থায় তার বসতেই ইচ্ছা করল না বহ্নি শিখর সম্মুখে রান্নাঘরে, তাই সে স্থির করল গিয়ে বসবে ঐ খোলামেলা আধছা চত্তরে। কিন্তু খাবার সময় মনোরমার অংগার মূর্ত্তি না দেখার ভান করে চক্ষু লজ্জার মাথা খেয়ে বলে ফেলল, "রমণী এক কাপ চা কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও তো।"

সুপ্রিয় গিয়ে বসল চত্তরের এক কোণে। যতদুর সম্ভব এক কোণে মনোরমার থেকে যতদুর সম্ভব দূরে।

মুস্কিলেই পড়ল রমণী কাকে দিয়ে চা পাঠাবে? আর বলেই বা কি করে, "এখানে বসেই চা খেয়ে যান?" তার চেয়ে থাক চা, যদি কেউ আসে ইতিমধ্যে তাহলে তাকে দিয়েই পাঠাবে। নিজে না।

ঠিক সময় মা ঠাকুর ঘর থেকে হেকে জানতে চান, 'সুপ্রিয়কে চা দিয়েছিস ? '

বাধ্য হয়েই মনোরমা চা করল, চা নিয়েই হাজির হলো সুপ্রিয়র সম্মুখে এমন একটা ভঙ্গীতে মা যখন এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না তখন তার কি দায় পড়েছে এমন দম আটকে বারবার সুপ্রিয় সম্মুখে ? অসহ্য ঠেকলেও সুপ্রিয়কে তার সহ্য করতে হবে।

মনোরমা যখন চা নিয়ে হাজির হলো তখন তার অন্য চেহারা মুখ থমথমে, গম্ভীর রুক্ষ, বিতৃষ্ণায় ভরা যেন না পারেতেই মায়ের কথায় তাকে একটা বিশ্রী স্বভাবের লোকের সম্মুখে আতিথ্য পরায়না হতে হচ্ছে। চোখে মুখে ভাসে বিরক্তি বিতৃষ্ণা।

ঐ দেখে সুপ্রিয়রও চা খেতে ইচ্ছা হয় না, বলল, "না, আমি চা খাব না, আমি এখন যাচ্ছি" ভাবটা অনেক সস্তা হয়ে গেছে সে, আর না সস্তা হওয়াই ভাল।

সঙ্গে সঙ্গে মনোরমার চোখ ছানা বড়া, "এই বললেন চা খাব, চা দাও, এখন খাবেন না — এ কেমন কথা ? চা না খেয়ে যান তো দেখি। -এই রইল চা।" সে প্রকৃতই দিশেহারা, বিভ্রান্ত। ফলে নিজের অজ্ঞাতসারেই নিজের স্বভাব বিশ্বাস-ঘাতকতা করল। দৃষ্টিতে ক্ষণ পূর্বের রাগ রুক্ষতা বিতৃষ্ণা বেমালুম নিরুদ্দেশ পরিবর্তে ফুটে উঠল মমতা-মায়া-আতিথেয়তার কমনীয়তা।

মনোরমা হাসল, বুদ্ধিমন্ত হাসি এবং ইঙ্গিতপূর্ণ—চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত।
বাহা, বাহা, বাহা, যেমন রূপ তেমনই হাসির মহিমা—মধুরে মধুর প্রলোভন।
আলটপকা অপ্রত্যাশিত।

অমন বৈপরীত্য দর্শনে বিশাল বিস্ময় বোধক চাহনীর সঙ্গে মুহূর্তে সুপ্রিয় বসা থেকে দাঁড়িয়ে খপ্ করে মনোরমার এক হাত ধরতেই সে লিপ পেতে দিল সুপ্রিয়র তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটাতে।

চুমুটা সুপ্রিয় জোরেই খেল বিলম্বিত ভঙ্গীতে দীর্ঘক্ষণ, যেন এক রাশ কথা এক সঙ্গে উগ্‌রে দিল। অর্থাৎ যা কিছু বক্তব্য আর চোখে নয় নিঃশ্বাসে

প্রশ্বাসে। গুরুত্বর অলিপান চমৎকার প্রীতি প্রাশন, যার তাপে উত্তাপে মনোরমা অনুভব করল সুপ্রিয় তাকে সত্যি ভীষণ ভাবে ভালবাসে, আর তখনি তার মনে প্রতিক্রিয়া হল যে তাকে এমন ভাবে ভালবাসতে পারে তাকে রসে বসে আটকে রাখা তারই কর্তব্য।

সহজ হিসাব, কিন্তু হিসাবটা যত সহজই হউক না কেন পারিবারিক ঐতিহ্যকে গুঁড়িয়ে দেবার ক্ষমতা যে তার নেই। তাই অতি কৌশলে চোখ দুটো দুরজার ভিতর দিয়ে ঠাকুর ঘরের মধ্যে ব্যস্তে বুলিয়ে নিল মনোরমা, কারণ মাকে তো সে জানে, মা যদি একবার টের পান তার মনু তারই নির্দেশে সুপ্রিয়কে চা দিতে এসে একেবারে বুক ঘেঁষে অন্য কিছু পরিবেশন করছে তা হলে অজ্ঞানই হয়ে যাবেন কিংবা হার্টফেল্ করবেন।

চোখ বুলিয়েই বুঝল জায়গাটা সত্যি ছায়াবৎ এবং মায়ের দৃষ্টির বাইরে, নজরে পড়বার আশঙ্কা নেই, তাছাড়া সময়টাও গুপ্ত বৃত্তির পক্ষে সহায়ক। কারণ মা এখন সন্ধ্যা পূজায় জ্ঞানশূন্য ভাবে বিভোর থাকবেন কমপক্ষে একঘণ্টা।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেব নিকেশ নিখুঁত মনে হতেই মনোরমা আরও একটু ঘন হল সুপ্রিয়র অনুভবের স্পর্শ আরাম পেতে যা কি না মাদকতার মতই মাদকের আকর্ষণ।

ঘন হওয়ার মুহূর্তে মনোরমার চোখে মুখে আলোর রশ্মি হয়ে গেল দারুণ প্রখরা, চোখ দুটো আঁধারে মানিক, দৃষ্টিতে মমতা ও ক্ষুধা দুই-ই জ্বলে উঠল এবং অদ্ভুত তৎপরতায় সে যা পরিবেশন করল নিজস্ব শৈলীতে একেবারে নিরামিষও না। যেন এক বিলাসী পাখী-ডাবল্ ফাষ্ট। সারা মুখ দ্বোশ্বাসে টক্‌টক্ যেন সুপ্রিয়র ব্রহ্মতালুর আল জিহ্বা ধরে টান। ওরিব্বাস। যেন লহরী খেল।

ইট ইজ দ্য ফীলিং, ইট ইজ দ্য সেয়ারিং। ইট ইজ দ্য লাভ ওয়ে অব ক্যারেসিং। অঙ্গের সোহাগ লাবণ্যের প্রকাশ, মনের মতো সাবলীলতায় অন্তরের এক প্রস্থ মোলায়েম রঙ, কোন কৃত্রিমতা নেই। কাঠিন্যের তকমায় ভেল্কিবাজী। দুটো চোখ জ্বল জ্বল উজ্জ্বলতার সঙ্গে হাসি মাখানো রভসময়।

এর পরেও মনোরমা যে কড়া প্রকৃতির বা অতিথি পরায়না নয় এমন কথা ভাবা চলে না। এ গুড় হোস্টেস্ বড়ই রমনীয় তেমনি কমনীয়। কাঠিন্যটাই তার ছদ্মবেশ।

সুপ্রিয়র অন্তর পুলকিত। সাফল্যের তাৎক্ষণিকতায় আষ্টে পৃষ্ঠা জড়িয়ে থেকে মনোরমা যে খুব নরম এটা অনুভব করলেও সেটা কতদূর পর্যন্ত তা জানতে হলে তার বক্ষের আবরণ উন্মোচন জরুরী। কিন্তু তা করতে যেতেই মনোরমা জিভ কেটে পিছিয়ে গিয়ে না না ঢঙে মাথা ঝাকাল।

"তা হলে থাক আপাততঃ।" ভঙ্গিতে সুপ্রিয়ও থমকে গেল।

আসলে সুপ্রিয় আঁচ করতেই পারেনি পরের মূহুর্তে মনোরমা কি করবে বা করতে পারে।

মনোরমার না না কতটা সঠিক এ হিসেব করতে সময় লাগল না, পিছিয়ে গিয়েই আবছা থেকে সে সুমধুর লাস্যে মোচড় দিল চোখে, ভাবটা সুপ্রিয় যা চাইছে তাকে তাই করতে দেওয়া উচিত। মনের গভীরে তারও প্রত্যাশা একটু নাড়াচাড়া হউক। চোখের দৃষ্টিতে পরিস্ফুট "ডু অ্যাজ ইউ উয়িশ।"

অপরাধ মূলক কাজের পক্ষে এর চেয়ে আদর্শ জায়গা বাছা এই মূহুর্তে সম্ভব নয়। সংসারে কম মেয়ের মাথায় এমন বুদ্ধি খেলে, বোঝা গেল গা গরম করতে সে কতটা উৎসাহী।

চঞ্চল ব্রস্তে হলেও তাই, দু পাশে দুটো পিঙ্গলবর্ণের স্তনফুল বড়ই লোভনীয় ভাবে আকর্ষনীয়। সুপ্রিয়র মুগ্ধ হতে সময় লাগল না। পারদ চড় চড় করে উঠে গেল—পারম্পায়ারিং।

সুপ্রিয় যেমন হাতড়াল, টের পেল মনোরমাও তৃপ্তিতে খুশিতে আবেশে আহ্লাদে পরখ করল সুপ্রিয়র দীপ্র দেহ সৌষ্ঠব। হাতের জাদু পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং আন্তরিক, আমেজ সৃষ্টির কী সহজ সযত্ন প্রয়াস! আচরণে এতটুকুও ছিঃ ছিঃ বা গেল গেল ব্যাপার স্যাপার মোটেও লক্ষণীয় নয়। কোন অবাক ভাবই

তাকে স্পর্শ করেনি যেন সাদাসাপটা ব্যাপার। ভাল লাগার অদ্ভুত তরঙ্গে না রাখ, না ঢাক্ অবদমিত বাসনার আবেগ বড় তীব্র চুম্বন আর কোলাকুলির সমন্বয়ে। সোহাগ বিতরণে কোন কৃত্রিমতা নেই।

না সুপ্রিয়, না মনোরমা কেউ ভাবতে পারেনি এমন একটা মুহূর্ত তাদের জীবনে আসার সঙ্গে সঙ্গে এত অল্প সময়ে একে অপরের ইন্‌টিমেট্ হয়ে যাবে। উত্তেজনাই বটে।

রসালো পর্বের প্রতিটি মুহূর্ত মুচমুচে চমচমে আরাম। মধুরম মধুবাৎ "বোথ্ অব দেম্ এন্‌জয়েড এভ্রি মোমেণ্ট অব ইট্।"

যা হলো তো হলো এর পরেই অনিবার্য সংলাপ সুরু হল। এলোমেলো ভাবে অনুচ্চ স্বরে ঃ--

সুপ্রিয় ঃ "প্রথম দিন থেকেই যদি তুমি আমার কথা শুনতে মনু তাহলে এতগুলু দিন নষ্ট হতো না। এখন বুঝলে তো আন্তরিকতাই শ্রেষ্ঠ আতিথেয়তা।"

বাহুবন্দিনী মনুর এখন আর স্বীকার করতে এতটুকু সঙ্কোচ নেই একটা মানুষকে এক দণ্ডের চুমুকে এত ভাল লাগতে পারে সে কি জানত? জানত না বলেই তো 'রমণী' ডাক শুনলেই তার মনে একটা বিরক্তি ভাব জাগত। মনকে চোখ ঠেরে তো লাভ নেই, সে এখন সুপ্রিয়র নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত, তাই সে নিঃসঙ্কোচে সুপ্রিয়কে চাপা স্বরের উচ্ছ্বাসে অনুমতি দিল— "মনু না, তুমি আমাকে রমণী বলেই ডেকো।"

কী অনায়াসেই না সে আপনি থেকে তুমিতে টপকে গেল। অমন টপকানোর মধ্যে কত যে আনন্দের লহর, কত যে স্বপ্ন আশা জমেছে তা অনুধাবন করতে পারে সুপ্রিয় ঠিকই এবং পারল বলেই গলা জড়িয়ে সেও উৎফুল্লাল, "সত্যি রমণী, তুমি ঠিক অর্থেই মনোরমা, তোমার তুলনা হয় না। তুমিই হবে আমার ব্যক্তিত্বের পরম শোভা, তোমার জন্য আমি সব সময় অপেক্ষা করব। আমার বিজন কুঞ্জে যখন খুশি চলে এসো।

রমণী ছলকাল ঃ "এত যে নাড়া চাড়া হল এরপর আবার বিজন কুঞ্জে কেন?"

সুপ্রিয় ঃ তা হলেও কিছুই হয় নি, নিজ আস্তানায় একটু গা ঘামাব না? কিছু অ্যাকশন তো চাই, নির্জন আবাসে! "

রমণী ঃ "তা কি করে সম্ভব?"

সুপ্রিয় ঃ "অসম্ভবটা কিসের?"

রমণী ঃ "তুমি বেশ লোক হে, আমি যেতে পারব কি পারব না একবারও জানতে চাইলে না। দেখছ না কেমন ঘেরা টোপ আর অনুশাসনে আছি।"

সুপ্রিয় ঃ "অতশত জানিনা; তবে জানি যেখানে অনুশাসন বেশি সেখানে শিথিলতাও বেশি! মর্জি হলে যাবে, না হলে যাবে না। আমি একলাই থাকব আর তোমার পথ চেয়ে থাকব যদি তুমি উদয় হও আচমকা, যদি তেমন আচমকাও না ঘটে তাহলে যদির যাবতীয় সম্ভাবনা ছেঁটে ফেলে আমিই উদয় হবো তোমার কাছে।"

রমণী ঃ "সেই ভাল, আমাদের ইয়ে এখানেই হবে, তুমিই যেমন আসছ তেমনই আসবে।"

এর পরেও কিছু ফিস্‌ফিসানি হল যার মূল কথা হল রমণী পারলে সুপ্রিয়র কুঞ্জেই যাবে না পারলে এখানেই।

মায়ের সন্ধ্যারতি প্রায় শেষ পর্যায়ে। শঙ্খধ্বনি হচ্ছে, কানে যেতেই রমণী সুপ্রিয়কে তাড়া দিল ছেড়ে দিতে, ছেড়ে দেবার আগে নিঃশ্বাসের সবটুকু জড়ো করে সুপ্রিয় যা করল অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়।

ছেড়ে দিতেই রমণী মুখে বলল 'রাক্কস' বললেও সে খুশীই হলো, প্রকাশ করল দিগ্বিজয়ী হাসির সঙ্গে জিভ্ ভ্যাংচে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আলগা করে চট্ জলদি সরে গিয়ে সহজ এবং তরল গলায় আওয়াজ দিল, "তা হলে ঐ কথা, উয়ী স্যাল্ মীট হিয়ার অ্যাণ্ড দ্যাট্স্ দ্যাট্—এখন যাও।"

সুপ্রিয়কে 'এখন যাও" বলাটা তো বলা নয়, আগামী দিন এই সময় আবার যখন সে আসবে কি ভাবে তাকে অভ্যর্থনা করবে তারই গনাগাঁথা করতে হবে, আবার মায়ের চোখে যেন ব্যতিক্রম দৃষ্ট না হয় সে খেয়ালও রাখতে হবে।

মনোরমা এই মুহূর্ত থেকে অন্তর্গূঢ় চিন্তায় তন্ময় সুপ্রিয়কে নিয়েই।

সুপ্রিয়র সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকাতেই সে অভ্যস্ত ছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে সম্পর্ক তৈরী হলো আবার কি ফেরা যাবে তেমন অভ্যস্ততায় মায়ের সামনে? মা যদি টের পান তাদের এই অদ্ভুত গোপন সাথ্ সঙ্গত মেল বন্ধন মোটেও বরদাস্ত করবেন না।

তাহলে করণীয় কি? কিছু নাটক করতে হবে যাতে মায়ের মনে ন্যূনতম সন্দেহও না জাগে। আর ধোঁকা, যেন গোপণ ব্যাপারটা মা ধরতেই না পারেন।

এমন আড়ালের ব্যাপার কত দিন চলবে? গোপন প্রেমে আনন্দ যত আতঙ্ক ততোধিক। মায়ের চোখে পড়লে, "ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা!"

তবু কিছু কল্পনার ফাঁক আছে। ব্যাপারটা ওভাবে মা না-ও নিতে পারেন। আজ কাল তেমনভাবে অনেক মা-ই নেয়ও না।

সুতরাং প্রাক্ চিন্তন করে লাভ নেই।

ভবিষ্যতে তেমন কিছু অঘটন ঘটলে ভবিষ্যৎ-ই সাহস জোগাবে। তখন ঢাক ঢাক গুড় গুড় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মাকে সে বলবে, "সুপ্রিয় ছাড়া আমার

> ফাঁক আর কেউ ভরাট করতে পারবে না। আমি পাকাপাকি
> এবং খোলাখুলি ভাবেই তার ব্যক্তিত্বের শোভা হতে চাই,
> এটাই আমার শেষ কথা।"

অমন জেদ বা বায়না ধরলে মায়ের আপত্তিও ধোপে টিকবে না। কারণ, মা-ই তো তাদের ঘনিষ্ঠতার সোপানটা তৈরী করে দিয়েছেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এবং নানা ভাবেঃ-"সুপ্রিয়কে বসতে দিলি না,? সুপ্রিয়বাবু সুপ্রিয়বাবু

> করিস কেন? সুপ্রিয়দা ডাকতে পারিস না? সুপ্রিয়কে
> চা দিয়েছিস্? তুই কি রে...একটু বসে কথা বলতে
> পারিস না?"

ঐসব কথাগুলু অন্ততঃ এমনই সাম্য দেয়। এর পেছনে যদি মায়ের তেমন কোন মতলব বা উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সুপ্রিয়র সাথে সম্পর্কটা সার্থকতার দিকে এগোলে মায়ের উজ্জ্বল সম্মতিই পাবে সে, অন্যথায় শেষ কথা মায়ের নয়, তার। এবং জেদের জোরেই সুপ্রিয়র সঙ্গে হবে তার মাল্য বন্ধন।

আগে তো কত কি হতে হবে তারপর তো আসল ভাবনা।

এখন সে কাকে বেশি ভালবাসে? মাকে, না সুপ্রিয়কে?

মাকে সে ভালবাসে বটে, তবে সুপ্রিয়ই এখন তার ইন্দ্রিয়ের তন্ত্রীতে পুলক জাগাবার জাদুকর। তার চিন্তাতে মনোরমা অহংকারে ডগমগ। সুপ্রিয়ই তার অনুভবের ধন।

সুপ্রিয় খুব লম্বা না হলেও সাধারণ সাইজের, কিন্তু দৈহিক গঠনে শক্ত পোক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাপা জোকা মানান সই। নিখুঁত মসৃণ ত্বক। মুখে চোখে উজ্জলতার প্রসন্ন ভাব। দাঁতের সারি সাজানো, চওড়া কপাল সব মিলিয়ে দীপ্র এক ব্যক্তিত্ব। হি হ্যাজ্ ইমেন্স্ ম্যাস্কুলিন্ কোয়ালিটিজ। মনোরমা তার স্নায়ু পেশীর স্পর্শেতেই টের পেয়েছে হাউ অ্যাট্রাকটিভ হি ইজ। অমন আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্বকে নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতার গরিমায় জয় করতে পেরে সে পুলকিত। এমন ব্যক্তির সহচরী হওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার।

ভাবতে মনোরমার অবাকই লাগছে, যে সুপ্রিয় সাধারণ কিছু বলতে গেলেই তার চোখে মুখে ভেসে উঠত বিরক্তি বিতৃষ্ণা, আশঙ্কা আর আতঙ্ক, এক চুমুকের প্রতিক্রিয়ায় বিপ্লব ঘটে গেল তার তনু মনে এমনই এখন তার চোখ দুটো সুপ্রিয় চিন্তাতেই তন্ময়। কাল সে ঠিক সময়ে আসবে তো! এমনই রূপান্তর □

অত্যাগসহন

একটা জিনিষ আনতে গিয়েছিল আবীর দিল্লী থেকে তারই এক কলিগ্ তড়িৎকে। তড়িৎ দিল্লী থেকে ফিরেই অসুস্থ হয়ে পড়ল তাই জিনিষটা পাঠাল তার বোনকে দিয়ে যার নাম নেলী।

সেই প্রথম আলাপের সূত্রপাত! অবশ্য নেলি একলা আসেনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তার ছোট বোন শেলীকে।

নেলী বি এ পরীক্ষা দিয়েছে, শেলী হায়ার সেকেণ্ডারী দেবে।

ওরা যমজ নয় কিন্তু চেহারায় অদ্ভুত মিল—একই নক্সা, একই আয়তন, একই স্থাপত্য।

নেলী শেলীও এল মুষলধারায় বৃষ্টিও নামল। আবীরের ইচ্ছা তাদের একটু আপ্যায়ণ করে। কিন্তু কি করে তা সম্ভব?

কিভাবে খাবার আনাবে, দোকান পাট কাছাকাছি একটাও নেই, পাণ্ডব বর্জিত এলাকা। হাতের কাছে কেউ নেইও যাকে ডেকে সে নির্দেশ দেবে কিছু আনতে।

নেলী বলল, "আপনি অহেতুক ব্যস্ত হবেন না।"

কিন্তু আবীরের যে আতিথেয়তা জ্ঞান অগাধ। তাই সে ব্যস্ত সমস্ত।

ঠিক সময়ে একটা রিক্সো যাচ্ছিল। প্যাসেঞ্জার নেই বৃষ্টির দরুণ। আবীর রিক্সোওয়ালাকে ডাকল। ইঙ্গিত করল বারান্দায় আসতে।

সে এল। আসতেই তাকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে একটা প্লাস্টিকের বালতিতে দুটো স্টেনলেস্ ষ্টীলের বড় বাটি দিয়ে আবীর নির্দেশ দিয়ে বলল, "এক ডজন রসগোল্লা, দশ টাকার ক্ষীর আর বাকি টাকার আম নিয়ে আসবে। যাবে আর আসবে, জিনিষ ভাল হওয়া চাই।

ফিরে এলে ভাড়া পাবে, বকশিসও ? ”

জানা নেই, চেনা নেই, পথ চলতি এমন একটা উট্‌কো রিক্সো ওয়ালাকে ফস্ করে টাকা দেওয়ায় নেলী-শেলী-দুজনেই হতবাক্ । ওদের প্রশ্ন, ও “যদি ফিরে না আসে ?”

আবীর বলল, “দেখ না কি দাঁড়ায়. জিনিষ ফিরে এলে মজা করে খাব । আর না এলে দ্যাট্‌ ইজ দি একস্‌পেণ্ডিচার অন্ একাউন্ট অব ইওর ভিজিট । কেউ যখন নেই আই অ্যাম টু ডিপেণ্ড আপন্ সামবডি ।”

নেলীর চোখের দৃষ্টি, “তা বলে অমন উট্‌কো লোকের উপর নির্ভর করতে হবে ?”

কিছুক্ষণ কেটে গেল বৃষ্টির তোড়ও তেমনি বেড়ে গেল । এই তোড়ের মুখেই রিক্সোওয়ালা ফিরল নির্দেশ মত জিনিষ নিয়ে ।

সঙ্গে সঙ্গে নেলীর সঙ্গে আবীরের দৃষ্টি মিলল, “দেখলে তো মানুষকে বিশ্বাস করলে ঠকতে হয় না ।”

রিক্সো চালক একেবারে ভিজে জবজবে । তাকে একটা আধা পুরাণো তোয়ালে দিতে যেতেই সে অনিচ্ছুকভাবে মাথা নাড়ালেও আবীরের অবাধ্য না হয়ে ঐ দিয়েই সে তার গা মাথা মুছে নিল । এবার এক প্রস্থ পোষাক (সার্ট আর লুঙ্গি) দিতে যেতেই সে না না করল কিন্তু আবীরের কাছে তার আপত্তি টিকল না ।

আবীর কয়েকটি ডিস্ হাতে নিতেই নেলী-তৎপর হয়ে প্রায় ধমকের সুরেই বলল, “আমাকে দিন তো, এবার আমরাই পারব, “আপনি শুধু বসে থাকুন ।”

খুশির চোটে সে রিক্সো চালককেও নির্দেশ দিল সেও যেন খেয়ে যায় । আচার আচারণে অনায়াস কতৃত্ব ।

এর পর নেলী-শেলী যেভাবে গোছ গাছ করে খাবার পরিবেশন করল যেন এটা ওদের নিজস্ব ঘর বাড়ী ।

রিক্সো চালককেও ওরা সযত্নেই পরিবেশন করে খাওয়াল

সেদিন থেকে আবীর ঐ দুই বোনের চোখে হিরো হয়ে গেল।

নেলী সুশ্রী চনমনে আহ্লাদী যৌন দীপ্তিতে ঝলমলে। তার চোখে মুখে দাঁতে ঠোঁটে এমন সব জিনিষ মনযোগ দখল করার পক্ষে যথেষ্ট।

শেলী হালকা পলকা, চেহারা বুদ্ধি দীপ্ত, সচেতন দুটি চোখ মানসিক সচলতা সজীব। জীবনী শক্তিতে ভরপুর, কোমল পদ্মবর্ণ দেহ ত্বক।

নেলী-শেলীর মধ্যে কে বেশি আকর্ষণীয় বলা মুস্কিল। তবে নেলীই আবীরকে টানল, অথবা আবীর তাকে বেছে নিল।

নির্বাচন ঠিক হয়েছিল কিনা জানে না, তবে শেলীর জন্য আক্ষেপ থাক-লেও নেলীর চোখে যা দেখল তার তুলনা হয় না।

প্রথম দিকে নেলীর সাথে রাস্তা ঘাটে দেখা হলে 'ভাল আছেন? কেমন আছেন?' এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল সম্পর্কটা।

অল্পকালে তিল মারা সম্ভব নয়। কিন্তু আচম্বিতে আবীর তাই করল এক-দিন, "কেমন আছি সেটা বুঝিয়ে না বললে বুঝবে না তুমি, আমি কেমন আছি এসো না একদিন, দেখবে।"

যখন কেউ প্রেমিক হতে চায় প্রেমিকাকে সেটা কোন ব্যাপারই নয়, প্রচ্ছন্ন আহ্বান ফুটল আবীরের চোখের তারায়। যা দেখে নেলীরও মনে হল আবীরের তাকে দরকার।

বাহ্যিক ভাবে সে কোন আগ্রহ প্রকাশ না করলেও সে বুঝেছে আবীরের মনোভাব। তাই নেলী শুধু দেখল আবীরকে এক পলক। ঐ দেখায় ভিতর দিয়ে সেও বুঝে নিল আবীরের কাছে তারও কিছু পাওয়ার আছে। তারপর হঠাৎ নেলী দৃষ্টি পাল্টে, "ঠিক আছে যাব না হয় একদিন ওকে।"

বলেই আবীরের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে সে চলে গেল নির্লিপ্ত চালে। আর ফিরেও তাকাল না।

এই চালটা কিসের? আবীরের কাছে অস্পষ্টই ঠেকল।

কিন্তু সেই অস্পষ্ট-টাই স্পষ্ট হয়ে গেল সত্যি সত্যি নেলী আবীরের আস্তানায় উদয় হল। কিন্তু সঙ্গে সেই শেলী।

প্রবেশ মুহূর্তেই আবীরের চোখে প্রশ্ন ভাসল, "একা না এসে ওকে আবার সঙ্গে নিয়ে এলে কেন ?

আবীরের দৃষ্টিটা অনুবাদ করতে নেলীর পক্ষে মোটেও কঠিন নয়, তাই সে অতি সহজে আবীরকে বুঝিয়ে দিল, "সাবধান ওকে যতটা বালিকা ভাবছেন ও মোটেও তা নয়।"

কিন্তু আবীরের তো অনেক কথা বলার ছিল যা শেলীর সামনে বলা চলে না, তার মেজাজ চড়ে গেল কিন্তু সে শেলীর সামনে কোন সিন্ করল না।

সিন্ না করলে কি হবে, শেলীর বুদ্ধি আছে, নির্লিপ্ত হলেও তীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্ন সে। ছাদটা কেমন দেখতে ব্যস্ত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেল সে।

এই আরালটা পেয়েই নেলী বলল, "দেখলেন তো, শেলী সব অনুমান করতে পারে, সে একেবারে সরলা বালিকা নয়, "বলেই মুচকি হেসে আবীরের মনে এমন সুড়সুড়ি দিল প্রাণ লুকিয়ে ছিল হাঁসির আরালে।

বলতে গেলে হাসিটাই নেলীর প্রথম উপহার, হাসি যে এত মিষ্টি হয় এর আগে আবীরের জানা ছিল না, ফলে তার ভেতর থেকে একটা ইচ্ছাই ঠেলে তাকে চঞ্চল করে দিল। এবং তার গলায় এমন কিছু শব্দ হলো কুন্দশুভ্র দাঁতের পঙক্তি বার করে ওষ্ঠাধর বিস্তৃত করে নেলী আপনা আপনি পজিশন নিল। তার মুখের বর্ণ দেখবার মতো চিত্তচমৎকারী। আহা কী আশ্চর্য !

প্রেমের প্রথম কথাই হলো চোখে মুখে ঠোঁটের মিল চুমুকে চমক প্রকৃতির তাগিদ। সেই তাগিদে যেন এক গল্প এ গিলে ফেলবে। যেন এই ঠোঁট সে আর কখনও ছাড়বে না। ঠোঁটের সঙ্গে শরীরের মোচড় সহজাত ইন্ধন জোগানোর পক্ষে আদর্শ। সত্যি বলতে কি নেলীর মধ্যে একটা ভাব আপনা থেকে কাজ করল, তাৎক্ষণিক আলোড়নে চোখ বুজে চো চো চুম্ করে উদ্‌ভ্রান্তের মতো অবিকল আবীরের স্টাইলেই যা করল সত্য সত্যই ইন্দ্রজাল তার আয়ত্তে অদ্ভুত শিহরণ দুজনেই বিহ্বল। আহা কী অপূর্ব !

শুধু শিহরণেই থেমে থাকল না সেই অনুভূতি। সঙ্গে যুক্ত হলো আতঙ্ক লজ্জা যদি শেলী এই মুহূর্তে ছাদ থেকে নেমে এসে দেখে ফেলে তাদের দুরভিসন্ধি মূলক মোলাকাত!

দশ মিনিট কতটা সময় তার হিসেব আবীরের জানা নেই, কোন সময় দশ মিনিট দশ ঘন্টা। এখন মনে হচ্ছে দশ সেকেণ্ড। কিন্তু এই দশ সেকেণ্ডেই একে অপরের নড়া চড়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সব জানা হয়ে গেল ঠোঁটের জোরে।

এর পর যেমন হওয়ার ঠিক তেমনই হয়ে গেল সম্পর্কটা ইনুটেনসিভ মেলামেশা শুরু। জয়েন্ট ভেঞ্চার।

প্রেম যত এগোয় ততই নতুন নতুন তথ্য বেরোতে থাকে সঙ্গে নতুন নতুন সত্য উদ্ঘাটিত হতে থাকল, আর যতই ওসব হতে থাকল, প্রেমের প্যাটার্নটা পাল্টে যেতে থাকল। কিন্তু প্রাণ খুলে কিছু করা সম্ভব নয় ওই আরাল আবডাল আনাচ কানাচই বেছে নিতে হয়। তবে কায়সংযমের কথা মনে রেখেই যা কিছু আড়ষ্টতা ছেটে ফেলে দিয়ে কিছু মোছড়া মোচড়ির মহড়ায় নেলীই আবীরের প্রেমিকা হিসাবে রঙ ঢঙের ভাবমূর্ত্তি হয়ে গেল। মোট কথা নেলী আবীরের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেল। এবং তাকে আজকাল পরশুর বাস্তবতায় পাকাপাকি ভাবে ধরে রাখতে ওর মন আনচান। শর্ত সাপেক্ষ স্বীকৃতির সঙ্গে নেলী প্রতিশ্রুতি দিলেও পাকাপাকি ভাবে বাঁধা পড়তে সে এক্ষণি প্রস্তুত বা আগ্রহী নয়। অর্থাৎ সে এক্ষণি ওর ভার্জিনিটি হারাতে নারাজ।

তবু নেলীর কাছে যা পেত আবীর আগে কারও কাছ থেকে পায়নি আশ্লেষে টস্কনে ভাবের মিল ছন্দের মিল দীর্ঘ দীর্ঘ চুম্বনের সঙ্গে প্রতিটি স্নায়ুর স্পর্শ আলোড়ন।

ছন্দ ভাবের মিল হলেও অনেক অসম্পূর্ণতা থেকে যেত। তবু তার সান্নিধ্যে দিনগুলি যাচ্ছিল বেশ। সেই নেলী কিনা হঠাৎ আবীরের হৃদপিণ্ড কাঁপিয়ে কয়েক মাসের জন্য বাইরে বেড়াতে গেল! ফলে আবীর আক্রান্ত হল একটা অভাব বোধ আর শূন্যতায়।

যারা প্রেম করে তারা প্রেম ছাড়া থাকতে পারে না।

প্রেম করার আগে অনেকেরই আদর্শের জোর থাকে কিন্তু প্রেমশূন্য হলেই আর জোর থাকেনা। আবীরেরও থাকল না।

নেলীর সঙ্গে যেসব খুনসুটি হতো নেলীর অনুপস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় এখন আবীর বড়ই অসহায় বিরহ ক্লিষ্ট। তার আচরনের স্মৃতির প্রতিটি অংশ প্রখর।

তার মন কতটা ক্ষত বিক্ষত। কতটা যন্ত্রনায় কাতর কাকে বোঝাবে সে? ধারাবাহিকতা না থাকলে প্রেম বড় সিপ্‌টিং।

শেলীর ফিট্‌ফাট স্মার্টনেসই তাকে চুম্বকের মত টানল।

ওকে দেখা মানে ভাললাগা।

শুরু হলো শেলীকে ভজনার সূত্রপাত।

আসলে নেলীর সঙ্গে আবীরের কি জাতীয় সম্পর্ক ছিল শেলীর চোখের সামনে না ঘটলেও তার কাছে খুব গোপনও ছিল না।

নেলী থাকতে সে আবীরের সঙ্গে কথা কম বললেও আড়ালে সে হাসত। হাসির ধরণে বোঝা যেতো সে জানে অনেক। মুখের ভাজ ধাড়িবাজের মতো। কথা বার্তা এবং ব্যবহারে বেশ ঘনিষ্ঠ ধরনের শত্রু. ভাবটা "আমার চোখকে আপনারা ফাঁকি দেবেন" তাহলেও তার সাত্বিক রূপটি ঢাকা ছিল আংশিক রূপের আরালে। কিন্তু নেলী চলে যেতেই শেলী যেমন বুঝে ফেলল আজ কাল তার সঙ্গে আবীর যেন একটু ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে অথবা আবীর বুঝল নেলী নেই বলে এই তার সুযোগ।

শেলীর চলা ফেরা, হাল চাল অনেক পাল্টে গেছে। কী সব বিচিত্র বিচিত্র ভাব ভঙ্গী। কথা বলার সময় তার জিভ নড়ে, ঠোঁট নড়ে, চক্ষু তারকা তারকা নড়ে, নাসারন্ধ্রও কাঁপে। একটু রসিকতার আচ পেয়েছে তো হাসির দমকে সমগ্র শরীরটাই কেঁপে ওঠে যেন চুল বুলে এক কন্যে।

চুলবুলে শেলীকে দেখতে দেখতে আবীরের জিভের প্রত্যন্ত প্রদেশ লালায়িত হয়ে উঠল। বড় ইচ্ছা একটু মুখশুদ্ধি পেতে। আবার ভিন্ন ভাবনা হিন্ট দিলে যদি শেলী তেরিয়া হয়ে ওঠে? অতি কষ্টে নিজেকে সামাল দেয়।

নিজেকে নিয়ে আবীর বিব্রত বোধ করতে থাকল।

নানারকম ইচ্ছে অনিচ্ছে তাকে দোলাচ্ছে। এমন প্রগলভ আচরণ নেলী থাকতে তো দেখেনি আবীর, শেলীর হাব ভাবে।

আবীর একজন স্বাভাবিক প্রকৃতির মানুষ এবং যুবক। টেন্‌শন এক্‌সাইটমেণ্ট প্রোভোকেশন্‌ চোখের সামনে। নার্ভের উপর ক্রমান্বয়ে প্রেসার সৃষ্টি হতে লালগ এবং মাত্রাটা বেড়েই লাগল।

ভেতরে ভেতরে একটা রহস্যময় মনস্তত্ব কাজ করে চলল।

তার নিশ্বাস প্রশ্বাসে নেলীর আশ্বাস এখনও অক্ষয় অথচ মনের গভীরে শেলীকে ঘিরে অনুপম সৌন্দর্য তৈরী হতে থাকল। সত্যি শেলীর মধ্যে অজস্র ভ্যারাইটি। তার সুর, স্বর, ভঙ্গী আর মুদ্রাই সৌন্দর্য।

অস্থিরতাই তার সৌন্দর্য, আশ্চর্য প্রতি মূহর্তে সে রামধেনু রচনা করে চলেছে যার ভেতরে প্ররোচনা উহ্য।

আবীর বুঝতে পারছে একবার নাসিকা গলাতে চাইলে সে শেষ দেখতে পারবে শেলী কি চায় এবং কেমন করে চায় তা বোঝার পক্ষে যা দেখছে তাই যথেষ্ট মূল বক্তব্য মুখে প্রকাশ না করলেও অনেক প্রসারিত এবং আবীর বুঝতে পারছে এ রকম চলতে থাকলে এবং নেলী যদি সহসায় না ফেরে একদিন দুম্‌ ফটাস্‌ হবেই হবে। কী যে হবে বলা কঠিন।

আবীরের মধ্যে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে শেলীরও মজা, ও যেন বলতে চায়, "আপনি আছেন, আমিও আছি, দেখি কেমন জমে।"

শেলী সব সময় হালকা হয়ে ঘুরছে চটুল চপল, অনর্গল কথা, নানা কথা, নানা বিষয়ে। আবীরকে উঠতেই দেয় না, "আরে, বসুন না, ঘরে গিয়ে করবেনটা কি একলা একলা।"

হাতটা যে আবীরের গায়ে ঠেকাল সেটা স্বেচ্ছাকৃত।

তক্ষণি আড়ালটা সবে যাবারই কথা কিন্তু আবীর দোটানায়। একদিকে নেলীর প্রতি ভালবাসা যে এখন নেই, অপরদিকে শেলীর প্রতি মোহ, যে তার সম্মুখে যার দৃষ্টির ফ্লোরাসেণ্টা আবীরকে ছায়ার মত তাড়া করছে।

নেলীর সঙ্গে আবীরের সম্পর্কটা আসলে কোন পর্যায়ে ? তার সঙ্গে আবীরের যা হয়েছে বলতে গেলে কিছুই না। টুক টুক প্রেম, মানে কিছু চুম্বন, কিছু আলিঙ্গন। কিছু লুকোচুরি খেলার ছটফটানি, অল্পস্বল্প বিনোদন আনন্দ ভাগাভাগি থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড় সব কিছুই কাঁচা এবং অ্যামেচ্যারিশ। স্বাদ গন্ধ ঘনীভূত হলেও পুরোপুরে কিছুই না। ঢিলে ঢালা ভাবে রক্ত চাপ বৃদ্ধি ও হৃদস্পন্দনকে বিপজ্জনক পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে অতীব কৌশলে স্থিতাবস্থা বজায়। সর্বাধিক পৌরুষ পূর্ণ অনুভূতিকে জাগ্রত করলেও সেরা সময়ে কুমারীত্ব রক্ষার জন্য দিয়েছে মন রাখা প্রতিশ্রুতি "আগে তো বিয়েটা হউক, ততদিন দোহাই তো·ার শয্যায় টেনো না বাপু।"

বোকার মত আবীর ভেবেছে প্রতিশ্রুতিতে তারা যখন আবদ্ধ আর কি চাই ! নেলী যে তার প্রেমিকা !

কিন্তু সেই প্রেমিকার অনুপস্থিতিতে আবীরের ভেতরে ভরা যৌবনের মাতাল রক্তে শেলীকে নিয়েই স্বপ্ন কল্পনা।

নেলী তাকে তাতিয়ে ফেলে গেছে, এখন আবীর শুনছে সে কবে ফিরবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। একটা চিঠিও দিচ্ছেনা আবীরকে যা পেলে অন্তত একাগ্র চিত্তে থাকতে পারে আবীর।

একটা বীতশ্রদ্ধ ভাব ভিতরে ভিতরে কাজ করে যাচ্ছিল। এই বীতশ্রদ্ধ মনোভাবই আবীরের বিবেচনার বদল হতে ত্বরান্বিত করল।

তবু দোটানার কারণে কয়দিন শেলীদের বাড়ী গেল না আবীর। গেলে কি থেকে কি হবে, একটা জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়বে হয়ত বা।

কিন্তু না গেলে কি হবে ছোট জায়গায় দেখা না হবার কোন কারণ নেই।

সেদিন দেখা হতেই শেলী এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, "কী খবর কেমন আছেন ? "

আবীর ঃ "আমার সঙ্গে দেখা হলে ও ভাবে জিজ্ঞেস করতে হবে তাই বুঝি এতদিন অপেক্ষা করছিলে ? তুমিও তো একবার খোঁজ নিতে পারতে আমি কেমন আছি। আমি তোমার উপর রেগে আছি।"

শেলী ঃ "রাগের কথা থাক, পরে মীমাংসা হবে, এখন যাচ্ছেন কোথায় ?"

আবীর ঃ "যাবার জায়গা নেই।"

শেলী ঃ তাহলে চলুন আমার সঙ্গে।"

আবির ঃ "না, তুমিই চল আমার সঙ্গে।"

শেলী দ্বিরুক্তি না করে আবীরের সঙ্গী হল। চলতে চলতে ওদের যে জাতীয় কথোপকথন হল তা নিম্নরূপঃ-

"আপনার খোজ খবর নেবার লোক কি আপনাকে চিঠি দিচ্ছে না ?"

"তুমি কি তোমার দিদির কথা আলাপ করতেই আমার সঙ্গী হয়েছ ?"– "কেন দিদির ব্যাপারটা কি এতই গোপনীয় এবং সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত আমার সঙ্গেও আলাপ করা চলবে না, না কি আজকাল সম্পর্কের হের ফের হয়েছে ? আর কেউ জানুক আর না জানুক আমি তো জানি আপনি দিদিকেই বিয়ে করবেন।"

"বিয়ের ব্যাপারটা ওর হুয়িমস্, আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি।"

শেলী যথার্থই অবাক, কিন্তু সে কি বলবে কি বলা উচিত ভেবে না পেয়ে শুধু নীরস মন্তব্য করল, "দিদিটা যে কী !"

শেলীর নীরস মন্তব্য শুনে হঠাৎ আবীরের মনে হল কথা থেকে কথা না বাড়িয়ে সর্টকাট করাই ভাল, অই সে বলে ফেলল, "থাক্ তোমার দিদির কথা, এখন আমি তোমারে কথাই ভাবি।"

শেলী ঃ "বাঃ! চমৎকার হঠাৎ আমার উপর নজর কেন, দিদি নেই বলে, না মতিচ্ছন্নে পেয়েছে ?"

আবীর ঃ "নজর তুমিই কেড়েছ।"

শেলী ঃ "আমি ? পাগল না মাথা খারাপ !" বলেই তার কি হাসি।

শেলীর হাসির ধরনে আবীরের ভিতরে দহনের আভা দুম্‌ফটাস্। আবীর শেলীর স্পর্শ প্রার্থনা করল ভিক্ষে চাওয়ার মুখ করে।

সঙ্গে সঙ্গে শেলীর চোখের তারায় বিস্ফোরণ, "অসম্ভব, একবার দিদির কথা ভাবুন ত।"

আবীর, "মনের বাসনা সম্ভব অসম্ভব মেনে চলে না।"

আবীরের বক্তব্যে শেলী একটুও রাগ করল না। কিন্তু সতর্ক সরবে স্বভাব সুলভ ভঙ্গীতে ছলকাল, "দিদিকে আজই আমি চিঠি দেব দিদি বাইরে বেশিদিন থাকলে আপনার মাথার গোলমালই হবে।"

আবীর : "গোলমাল যাতে না হয় সেটা তোমার দেখা উচিত।"

"দেখছিই তো, এই যে আমরা একসাথে চলছি কথা বলছি, এটা কি দেখা নয়?"

"না, আমি যেভাবে চাই সেভাবে দেখা," বলতে বলতে আবীর শেলীর হাত স্পর্শ করল। স্পর্শেতেই গূঢ় বার্তা ছিল। "অত ইন্তু কিন্তু কিসের?"

রাগায় তার চোখ, ভ্রূপল্লব সমগ্র অবয়ব, "ন্যাকামীর সীমা থাকা দরকার।"

কথাগুলো শেলীর গায়ে হুল ফোটালেও, সে ঠাণ্ডা থাকল, কিন্তু আবীরের আকুতি তাকে নাড়া দিল। নাড়া দিলেও সে খোলসা হতে পারছেনা অর্থাৎ আবীরের সঙ্গে মাততে সে সাহস পাচ্ছে না দিদির কথা ভেবে।

আবীরের সঙ্গে কিছু হলে দিদির সঙ্গে সম্পর্কটা জটিল হয়ে যাবে আবার একজন শক্ত সমর্থ পুরুষের আকর্ষণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতেও ইচ্ছা করছে না। অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে শেলী আপাতত নির্বাক।

এই সময় দুদিক থেকে দুটো খালি রিক্সো আসছে দেখেই আবীর দুজনকে থামাল, তারপর শেলীর পানে তাকিয়ে, "তুমি ঐ রিক্সোয় উঠে দিদির কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ী যাও।"

বলা শেষ হতেই 'গুড্ নাইট' বলে আবীর অন্য রিক্সোয় উঠে বসে চালককে নির্দেশ দিল গুরু গম্ভীর ভাবে 'চল'।

আবীরের অমন আচমকা কাণ্ডে তাল কেটে যাবার ফলে নিজের ভাগ্যকে দোষ দিতে দিতে নিঃশব্দে বাড়ী ফিরে এল একলা একলা শেলী।

ব্যাপারটা মোটেও সুখকর নয়। এ রকমটা যে আবীর করবে ভাবতেই পারেনি।

অন্তর্দাহে কয়টা দিন কেটে গেল শেলীর।

আবীর ভেবে ঠিক করেছে শেলীর কথা আর সে ভাববে না। কিন্তু ভাবতে না চাইলেই বা কি শেলীকে ঘিরেই সে দারুণ দারুণ স্বপ্ন দেখতে থাকল। হৃদয় আনচান।

চিত্ত যখন ঘুরপাক খেতে খেতে আবীরের মনটা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল তখনই হঠাৎ শেলীর মনোরম আবির্ভাব আবীরের ডেরায়। এ ভেরি স্পেশ্যাল অ্যাপীয়ারান্স।

এ ধরণের হঠাৎ আবির্ভাবে বুদ্ধিমান লোকেরাও হতভম্ব হয়ে যায় আর আবীরের তো মাথা ঘুরে যাবার ব্যাপার।

যা বাবা! তাজ্জব কাণ্ড! একী সত্য, না স্বপ্ন?

শেলীর হাতে মিষ্টির প্যাকেট। মুখে কৃত-কৃতার্থের লাখ টাকার হাসি। চোখ দুটো এমনই উজ্জ্বল যেন আলো জ্বলছে ললিত লোভন কুসুম। সঙ্গে সঙ্গে আবীরের আভিজাত্য আর গুরু গম্ভীর ভাব ভেঙ্গে টুকরো, মুক্ত তড়াক, "তুমি যে আমাকে মনে রেখেছ, এই যথেষ্ট, মিষ্টি তো খাবই তার আগে এসো কংগ্র্যাচিউলেট্ করি।"

হাতে হাত ছোঁয়াতেই ঠোঁটে ঠোঁট জোর ঠোকাঠুকি।

শেলীর ভঙ্গীতে আনুগত্যের ভাব। প্রথম মুখশুদ্ধিতেই আরাম। আহা, কী খেলাম! কী খেলাম! ভাব, চোখে ফুটল আবার খাবার চঞ্চলতা। তার পর চাপ চাপ আরও চাপ যতক্ষণ না জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণই চাপ। এর পর সঠিক অভিব্যক্তিতেই হুবহু ঠোঁট মেলান। সঙ্গে অঙ্গ সঞ্চালন।

শেলী আবেশে চক্ষু মুদিত, আশ্চর্য অনুভূতিতে বণ সুখলব্ধা।

সুখাদ্যের ঘ্রাণ পেয়ে আবীর দিশেহারা ভাবেই নেশুড়ে। অজগরের মত পেঁচিয়ে ধরে উন্মাদনার উল্লাসে আবেগ পূর্ণ আলিঙ্গনের লুব্ধতায় ক্রমশ টপ্ থেকে

বীর্য আলু থালু করে একেবারে শয্যায় ভূপাতিত করে ঢেকে ফেলতেই দেহশুদ্ধ বা লজ্জাজনিত সহজাত সংস্কারে শরীবে সামান্য কম্পনের সঙ্গে শেলীর চোখ উন্মীলিত বিষন খাওয়া অবাক ! ভ্রূ কুঞ্চনে জিজ্ঞাসা—'এক লপ্তে সব ?"

কম্পনটা কি ভয় বিস্ময় না কি মুগ্ধতার প্রকাশ আবীর জানেনা। তবে কম্পনটা মালুম হতেই শরীরে লেপ্টে থেকেই ডোন্ট্ ওয়রির নির্ভয় হাসির সঙ্গে আবীর সবাক, "আগে তো কিছু মোচড়া মোচড়ি হোক তার পর ভাবা যাবে আর কি করণীয়।"

" প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নিস্পলক চেয়ে থেকে হঠাৎ পাওয়া খুশিটা চেপে রাখতে না পেরে শেলী চোখে জল তরঙ্গ নিয়ে কী অবলীলায় না আবীরেব গালে চকাশ কবে চুমু খেয়ে যা করল অন্তরের কামনা ছাড়া এমন টি কেউ করতে পারে না। আহা, কী টাট্কা ! বুকটা ভরে গেল আবীরের।

আহ্লাদে আবীরেব হাত শেলীর লাউডগাব মত দেহ সৌষ্টব ঘিরে দুই থেকে তিন মিনিট ধরে যা করল যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। বিস্তর অনুসন্ধানে শেলীর সুসংহত দশাই বিলুপ্ত। একটার পর একটা অঙ্গ, উবু চুচুক বৃন্ত, রম্ভোরু জঘন এবং এবং এবং অসাধারণ দেহ সম্পদ অভাবনীয় চক্ষুষ তৃপ্তির মৃগয়াভূমি। তার মনেই হচ্ছেনা সে এমন কিছু অন্যায় করছে—এলো মেলো ওয়র্ম আপ্। আপত্তি করে লাভ নেই পড়েছে মোগলের হাতে।

শেলীর পক্ষে এখন কিছুই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা সম্ভব নয়। একবারও সে চোখ বন্ধ করল না। যেন বুক দুরু দুরু করার মত কোন ঘটনাই নয়। নির্বাক হলেও নিজস্ব শৈলীতে সক্রিয়।

নারীর শরীরে শিল্প লুকিয়ে থাকে। অতএব তেমন শিল্প প্রকাশ হতেই আবীরেরও স্বীয় শিল্প প্রকাশ হয়ে পড়ে যার অর্ধেক সাবাস শেলীরই প্রাপ্য।

শেলী অনেক কিছু জানে। তার অমন জানার পেছনে নিজস্ব কোন বাহাদুরী নেই। বয়সের সঙ্গে ঋতুগত প্রকৃতিই তাকে শিখিয়েছে কখন কি করতে হয়। আবীরের ভেতরে যে বিপুল শক্তি নড়া চড়া চলছে শেলী তা লুফে নিতে ব্যাগ্র। চোখ দুটো লালসা ঘন পিট্ পিট্।

আবীরের রোমকূপে উত্তেজনা সত্বেও প্রথম মোলাকাতেই দুশ্চিন্তা ভাবনায় মত্ত না হয়ে আবীরের বিস্মিত চোখ শেলীকে নিরীক্ষণ করল। তার চোখের গ্লাশ বাল্ব-এর অসংখ্য কলকাণির মধ্যে ধরা পড়ে গেল শেলীর আগ্রহ যেন চড়ুনীর মত ব্যস্ত সমস্ত। এবং সেই অনুযায়ী ছক কষার কাজ সুরু। পা দুটি ফাঁক করে যৌন ভঙ্গী করতেই আবীরের শরীরটাই হয়ে গেল শেলীর প্রতিপক্ষ দেহ সৌষ্টবের প্রতিযোগীতা উচ্ছাসের আতিশয্য। বেহুস মুহূর্ত—স্বর্গের সিঁড়ি। শ্লীল-অশ্লীলতার সীমানা মুছে দিয়ে ভাললাগা ভালবাসায় উন্মেষ উত্তরণ অন্তরে তড়িৎ গতিতে এমন কিছু ঘটল যা আগে ঘটেনি।

যে সুক্ষ্ম একটা নিয়ন্ত্রণ এত দিন ধরে রেখেছিল আবীর নেলীর জন্য আজ তার উল্লঙ্ঘন হল শেলীর সঙ্গে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল।

আবীর এখন গভীর ভাবে ক্লান্ত, ভীষণ ক্লান্ত নেশার আলিস্যে ভাবছে দ্য বেস্ট থিং হুইচ্ কুড্ এভার হ্যাপেন উয়ীথ নেলী হ্যাপেণ্ড্ উয়ীথ শেলী আর তখনি কানের কাছে, শেলী ফিস্‌ফিস্‌াল, "এরকম ব্যাপার আমার আর

কারও সঙ্গে হয়নি, তুমিই প্রথম, তুমি দারুন লোক হে।"

মনোবল এতটাই বদলে গেল এক ধাপে শেলী আপনি থেকে তুমি তে টপকে গেল।

শীর্ণকায় শেলীর অসাধারণ পারফরম্যান্সে আবীর মুগ্ধ এবং সে যে কতখানি দক্ষ বোঝাতে পেরে সেও খুশী। এত অল্প সময়ে একটা সুবৃপাকে নিজস্ব ভাবতে পারাটা কম কথা নয়। উদ্ভ্রান্তের মত প্রায় আধঘণ্টা ধরে অনাবিল আনন্দ উচ্ছাসের সাথ সঙ্গতের শেষে আরও কিছু পরিচর্যা অন্তে, "এখন

তোমার আনা মিষ্টি খাওয়া যেতে পারে, কাম লেট আস্

শেয়ার দ্য স্পিরিট অব জয়।"

এতক্ষণ কার উৎসাহ বর্ধক ব্যাপারের পর মিষ্টি কেন কিছুই খাবারের দরকার হয় না। তবে খেতে যাওয়াতেই তো আনন্দ সঙ্গে আরও উষ্ণতা আহরণ নিছক পুনরাবৃত্তির মন্দেশ ডেলিকেসি, যাকে বলে প্রাণ আর জীবনী শক্তির শলিড ফুয়েল।

তুলনা করলে শেলীর চটকদারীর কাছে নেলী ম্রিয়মান। শেলীই আবীরের মন পসন্দ নায়িকা। সবই নতুন। এমনকি গন্ধটাও কী সুন্দর রসভ তৃপ্ত মুখাবয়ব। চোখে মুখে ফুটে উঠল অলৌকিক ক্রিয়াসাধনের গরিমা অর্থাৎ এসবই অতি সাধারণ এবং প্রেম করতে গেলে অবশ্য কর্ত্তব্য।

সেদিনের প্রলয়ের পর শেলীর আর তার দিদির জন্য সার কথা শোনাবার মন থাকল না। হঠাৎ হঠাৎ আবীরের আস্তানায় আবির্ভূতা হয়ে টপা টপ নির্বসনা হয়ে জানু মুড়ে শুয়ে সে বুঝিয়ে দিত তার সর্ব গ্রাসী অস্তিত্ব তবে হালকা চালে কথা বলার মধ্যে অবশ্য ফুটে উঠত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেবার ইসারা।

অর্থাৎ 'উদর পূর্ত্তি হয়ে গেলে কি হবে ?"

"আগে তো তেমন হোক্, তখন দেখা যাবে, দেহে ধুলো লাগলে ধুয়ে ফেলা কোন ব্যাপারই নয়, ভয় পাচ্ছ কেন ?" দুনিয়া অনেক এগিয়ে গেছে।"

আবীরে অমন আস্বাসে শেলী অক্টোপাসের মত দুহাত ছড়িয়ে থাসা ষ্টাইলে অপ্রাতিবোধ্য ভাগিদে উষ্ণ আলীঙ্গণে আবীরকে জড়িয়ে ধরে, "তবে তো কোই বাত্ নেহি।

অর্থাৎ এমন লোকের কাছে প্রেমের কারণে আসা যাওয়ার একটা মানে খোঁজা যায় সার্থকতা আছে ফলে ডবল এনার্জি।

হাসি খুশি মুখে হৈ চৈ ব্যাপার সাধন করে যেমন অকষ্যাৎ উদয় হতো তেমনি আলোড়ন সৃষ্টি করে ফিরে যেতো চকিত তৎপরতায়, মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই কেমন ঝড়ো বৈঠক সঙ্গে করে গেল।

শেলীর সঙ্গগুনে বা দোষে আবীরের ভাবনা চিন্তা চেতনা অ.কাংখা অবিচ্ছেদ্য ভাবে জুড়ে গেল জীবনই এখন শেলী, শেলীই তার জীবন। এবং ক্রমশঃ নেলী সম্বন্ধে যাবতীর আকর্ষণ হারিয়ে ধীরে ধীরে নিশ্চিত ভাবে শেলীকে নিয়ে সংসার পাতার ভাবনাটাই তাকে পেয়ে বসল জপযন্ত্রবৎ।

সেদিনও শেলী যথা সময়ের আগেই এল, আনুষঙ্গিক সব কিছুর শেষে শাড়ি টাড়ি পরে শেলী যখন ফিরে যাবার জন্য তৈরী হল, আবীর বিছানা ছেড়ে

উঠে আয়নার সামনে তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে তার কাঁধে চিবুক রেখে বলল, "আর উয়ী নট্ গুড্ ম্যাচ ?"

আয়নার ভেতরেই শেলীর চোখ দুটো আবীর দেখল, কেমন নরম কিন্তু মুখে চোখে কিসের যেন ভাবনা।

শেলী কি কিছু বলতে চায় ?

আবীর ঃ "কই কিছু বলছ না কেন ? আমাকে কি তোমার খুব খারাপ লাগছে ?"

শেলী ঃ "না, সে কথা নয়, ভাল যেমন লাগছে তেমনি খারাপও লাগছে।"

আবীর ঃ "কারণ ?"

শেলী ঃ "আমরা একটা মারাত্মক জটিলতায় জড়িয়ে পড়লাম।"

আবীর ঃ "অর্থ ? খুলে বলছ না কেন ?"

শেলী ঃ "সেটা কি খুলে বলতে হবে ? দিদির মাথাটা খেয়ে শেষে আমার সঙ্গে এটা কি ঠিক ? দিদি ফিরে এলে খেঁয়ো খেঁয়ি যে কোন পর্যায়ে যাবে আমি ভেবে পাচ্ছি না। দিদি তো তোমার সঙ্গে হেসে কথা বললেও সন্দেহের চোখে তাকাত কান খাড়া করে।"

আবীর ঃ "এখন আমি তো তোমার দিদির কথা মোটেও ভাবি না। তাকে আমার আর প্রয়োজন নেই, শি ইজ টু ফাইণ্ড আউট অল্টারনেটিভ, তোমাকেই আমি বিয়ে করব।"

আবীরের গলার স্বর স্পষ্ট কিন্তু আবীরের স্পষ্ট কথায় শেলী আর এক ডিগ্রী স্পষ্ট এবং বেশ কঠিন, "তা হলে তোমাকেও অল্টারনেটিভ খুঁজতে হবে, দিদির সাথে প্রথমে নিজেকে জড়িয়ে এখন আমাকে বিয়ে করতে চাইছ, আমি পারব না তোমাকে বিয়ে করতে। সারাজীবন এই অপরাধের বোঝা নিয়ে আমি দিদির মুখোমুখী

দাঁড়াতে পারব না। ছেদ যখন টানতেই হবে সেটা আজ থেকেই টানা হউক. আমি আর আসব না তোমার কাছে।''

কত সহজ এবং কেমন সহজ স্বরে কথাগুলু উচ্চারণ করল শেলী। তার পর অপরাধীর মত আবীরের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে শান্ত স্থির এবং দৃঢ় ভঙ্গীতে তার ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে বের হয়ে যেতে তার বুকটা এতটুকু কাঁপেনি।

আবীর হতবাক অবাক যেন সে তার কুকর্মের ফল পেল।

হায়, মনকে রঙ্গিন করতে যার কিনা মুখ্য ভূমিকা শেষ পর্যন্ত সেই কিনা আবীরের মনের সব রঙ ধুয়ে মুছে দিয়ে গেল।

শেলী আবীরের ভীষণ ক্ষতি সাধন করল। তার সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ টেনে আর একজনকে বিয়ে করতে শেলীর এতটুক মায়া হল না।

নারী জাতটাই এমন, হৃদয় বলতে কিছু নেই। শেলীর ব্যতিক্রমী আচরণে কষ্ট আবেগ দুই এক সঙ্গে কাজ করে চলল আবীরের মনে। কষ্টটা নেলীর জন্য, আবেগটা শেলীর কারণে।

নেলীর সঙ্গে তার অনেক কিছুই হয়নি সে জন্য তার আক্ষেপ আছে। তবে শেলীর সঙ্গে আবীরের যা হয়েছে তা অন্য ব্যাপার। সি ওয়াজ অ্যাজ ন্যাচারেল অ্যাও হোল সাম্ অথচ সে তার বৌ হল না। এটা শুধু তার হার নয় দুর্ভাগ্য। কপালে যে এরকম একটা ভোগান্তি হবে আবীর কল্পনাও করতে পারে নি।

এখন যে ফাঁক হলো নেলী-ফিরে এলেও ভরাট করতে পারবে না। সে যখন জানতে পারবে শেলীর সঙ্গে আবীরের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তার অনুপস্থিতিতে তাহলে প্রীতির কোন স্নিগ্ধ ছায়াই থাকবে না তারও চোখে মুখে।

এক পক্ষে ভালই হলো। বড় শূন্যে ভাসছিল আবীর প্রেম করে। আত্মতুষ্টিতে ঘা না পড়লে ঠিক পথ পেতো না।

প্রেম করে যা হলো — কিছুই না, ধপ করে পতন কেউ তার সহচরী হলো না। এই অন্তর্দাহ থেকে উদ্ধার পেতে ঝেড়ে ফেলে দিল আবীর তার ব্যাচেলার পরিচয়—প্রেমহীন বিবাহ করে। বাতিলের খাতায় জমা পড়ে গেল মেলীও।

সে কত বছর হলো? হিসাব নেই।

প্রেমহীন বিবাহ করে অবৈধ সম্পর্কের গোপন যন্ত্রনা থেকে উদ্ধার পেয়েছে আবীর ঠিকই কিন্তু একলা বা নিজের মধ্যে নিজে থাকলে এত বছর বাদেও মনশ্চক্ষুতে ভেসে ওঠে নেলী শেলীর চেহারা আর তখনই কেন তার মধ্যে সেই লুক্কায়িত অত্যাগহসন জাগে? এক একটা অনাবিল মুহূর্ত না চাইলেও আপনা থেকেই হঠাৎ হঠাৎ চলে আসে চোখের সামনে ☐

শুভস্য শীঘ্রম

শঙ্কর বাড়ী পাচ্ছিল না। কারণ সে ব্যাচেলর। ব্যাচেলরদের বাড়ী দিতে মালিকদের ভীষণ আপত্তি।

অনেক খুঁজেছে সে, যে দুয়েকটি পাওয়া যায় তার পরিবেশ শঙ্করের মনমত নয়। শেষে তার এক সহকর্মী অবণীর সোর্সে দুই রুমের একটি আস্তানা জুটে গেল। যদিও ভাড়া মোটেই ন্যায্য নয়।

বাড়ীটা অবণীর এক দিদির। যে দিন শঙ্কর নতুন আস্তানায় এল সঙ্গে অবণীও ছিল। বাড়ীর অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে অবণী ঠাট্টা করে শঙ্করের কানে কানে বলে গেল, "এখানে যতদিন খুশি থাক, তবে সাবধান

দিদির মেয়ের দিকে দৃষ্টি দিও না। কথা বার্তা বলতে আপত্তি নেই তবে প্রেম করা চলবে না। অবশ্য বিয়ে করতে চাইলে আমি ঘটক হতে রাজী। অন্য গড়বড় হলে বাড়ী তো ছাড়তে হবেই—পাড়াও।"

শঙ্কর এমনিতেই হুঁশিয়ার টাইপের। এতৎ সত্বেও একই বাড়ীতে থাকতে গেলে একটা আত্মীয়তা বোধ জাগেই। অবণীর ভাগ্নে ভাগ্নীরা শঙ্করকে ইতি-মধ্যেই আঙ্কেল বলে ডাকতে শুরু করেছে। অবণীর দিদিকে দিদি বলে না ডাকলেও অভিভাবকের মতই মেনে চলে শঙ্কর।

শঙ্করকে মাঝে মাঝে টুরে যেতে হয়। সাধারণ নিয়মেও অফিস থেকে ফেরার সময় তার ঠিক থাকে না। তাই কাজের লোকের সুবিধের জন্য সে চাবি রেখে যেতে শুরু করল অবণীর দিদির কাছে। উনি ব্যস্ত থাকলে অবণীর বড় ভাগ্নী হিয়াই রেখে দেয় চাবির গোছা।

এমনি করে আলটিমেট্‌লি হিয়ার উপরই দায়িত্ব বর্তাল, চাবি রাখা, কাজের লোককে চাবি দেওয়া, আবার ফেরত নিয়ে নেওয়া। প্রয়োজন বোধে কিছু তদারক। নানা ঘটনায় পরস্পরকে টেনে নিয়ে খেতে থাকল পরস্পরের কাছে।

শংকর আকৃষ্ট হলো হিয়ার প্রতি। অথবা হিয়ার আকর্ষণ উপেক্ষা করার সাধ্য তার থাকল না। তারিফ করার মতই চেহারা হিয়ার। গায়ে ত্বকে তেল তেলে ভাব, বিদ্যুৎলতার মত শাণিত—চলকে চলকে চলে। বি. এ তে রিস্ক্‌ পেয়ে হতাশ হয়ে আর পড়বে না বলেই স্থির করেছে। এর বেশি হিয়া সম্পর্কে আর কিছু জানে না শংকর। কৌতুহলও দেখায় নি। কিংবা কৌতু-হল থাকলেও স্থিতাবস্থাই চলছে।

সেদিন কোন এক নেতার হঠাৎ মৃত্যুর কারণে অফিস হাফ ছুটি হয়ে গেল। তবু শংকরকে বাড়ী ফিরতে ফিরতে সেই চারটে। বাড়ী ফিরে জানতে পারল কাজের লোক আসেনি। চাবি নেবার জন্য হিয়াদের ঘরে ঢুকতেই হিয়াকে ঘুমানো অবস্থায় দেখে শংকর ড্রইং রুমে বসে অপেক্ষা করতে থাকল কিছুক্ষণ যতক্ষণ না হিয়া স্বাভাবিক ভাবে জাগে।

কিছু না করে বসে থাকা যায় না, তাই ড্রইং রুম থেকেই তার চোখ চলে যাচ্ছিল সেই দিকে যেখানে ঢিলে ঢালা ভাবে ঘুমোচ্ছে। একটু কৌতুহল জাগতে না জাগতেই সে চোখ ফিরিয়ে নিল। হিয়া তাকে যথেষ্ট সমীহ করে। সে শব্দ করে গলা খাকারি দিল।

শব্দটা কানে যেতেই হিয়া জেগে গেল। চোখ মেলে তাকাল।

"এই শেষ বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছ ?" শংকরের প্রশ্নে হাই তুলে হিয়া বলল, "কি করব ঘুম ছাড়া ?"

"পরীক্ষাটা দিয়ে দিলেই পার। বি. এ. পাশ না করলে এই পর্যন্ত পড়ার কোন মূল্য নেই। পড়তে শুরু করত দরকার হলে একটু আধটু আমিও দেখিয়ে দিতে পারি।" বলেই শংকর চাবি চাইল।

চাবি নিয়ে শংকর উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে মন্তব্য করল। "অসমাপ্ত কিছুই ভাল নয়। ভেবে দেখ।"

হিয়া ভাবল। শঙ্করের উৎসাহে সে আবার পড়তে শুরু করল। মাঝে মাঝে ভোর রাতেও হিয়া যে পড়ছে শঙ্কর শুয়ে শুয়েই টের পেত। কিন্তু রোজ নয়।

একদিন মুখোমুখি হতেই শঙ্কর জিজ্ঞেস করল, "কেমন প্রস্তুতি চলছে। রোজ ভোরে ওঠ না ?"

হিয়া জানাল তার ঘুম বেশি। এলার্ম ঘড়ি থাকলে সুবিধে হতো।

এরপর দিনই শঙ্কর হিয়াকে একটা এলার্ম ঘড়ি উপহার দিল।

এরপরে একদিন কি একটা বুঝতে শঙ্করের কাছে এলে শঙ্কর তাকে বসতে নির্দেশ দিয়ে বলল, "আমি ডিক্টেট করছি, লিখে নাও।"

হিয়া কলম আনেনি শঙ্করের টেবিলে পড়ে থাকা অনেকগুলো কলম থেকে একটা তুলে সে লিখে নিল শঙ্কর যা বলল।

লেখা শেষ হতেই কলমের ক্যাপটা লাগিয়ে জায়গা মত রাখতে রাখতে বলল— "কলমটা ভারী সুন্দর, আমি পরিক্ষার সময় এটা নেব।" বলেই সে চলে যাচ্ছিল। তার আগেই শঙ্কর হিয়ার হাতটা ধরে কলমটা দিয়ে "এটা তোমার।"

হিয়া "না না এটা অনেক দামী" বলেই সে চলে যেতে চাইল।

কিন্তু শঙ্কর তাকে কলমটা দিলই।

ঐ কলম দিয়েই হিয়া পরীক্ষা দিল, পাশও করল।

এমনি করে হিয়াকে আরও কিছু উপহার শঙ্কর দিয়েছে, সবাই জানে হিয়া শঙ্করের প্রীতি ধন্যা।

এখন হিয়া কি করবে ? শঙ্কর পরামর্শ দিল "সর্টহ্যাণ্ড শেখো। ভাল স্পীড হলে চাকুরি পেতে অসুবিধে হবে না।"

তাই সে এখন রাখে। শংকরের গাইডেন্সে। এবং সে কারণে ছুটি ছাটার দিন হিয়া বেশি সময় শংকরের ঘরেই কাটায়।

একদিন হিয়া নিজে থেকেই শংকরকে বলল — "একটা জিনিষ দেবেন ?"

শংকর প্রশ্ন করল "কি জিনিষ ?"

হিয়ার উত্তর, "আগে বলুন দেবেন কিনা।"

"তার মানে তোমার জিনিষটা চাই ?" বলেই শংকর তাকাল তার পানে "কি সে জিনিষ ?" চোখে প্রশ্ন চিহ্ন নিয়ে।

অস্পষ্ট স্বরে নীচু গলায় কি যেন বলতে গেল হিয়া। আর্জিটা শুনতে শংকরকে ওর মুখের কাছে কান নিয়ে যেতে হলো। এত কাছে যে প্রায় বুকের কাছে চলে এসেছে তার মুখ। হিয়ার শরীরের উত্তাপ আর ঘ্রাণ এসে লাগছে শংকরের নাকে, চোখ চলে যাচ্ছে শরীরের গভীর প্রদেশে। গায়ে গা ও লেগে যাচ্ছে।

হিয়ার চক্ষু স্থির যেন ধরতে চেষ্টা করছে এমন হঠাৎ করে বুকের কাছে মুখ আনার কারণটা কি ? অবাক হলো। অবাক হলেও ভাল লাগছিল। প্রেম বোধহয় এভাবেই শুরু হয় ! এ ও কি সম্ভব ?

ঠোকাঠুকি হয়ে গেল চোখে চোখে। তারপর হিয়া হাসল, হাসির বিনিময়ে শংকরও হাসল। হাসিটা মাখা মাখি হওয়ার মুহূর্তে প্রথমে শংকরের ডান হাত পরক্ষণেই বাঁ হাত উঠে এল হিয়ার গালে চিবুকে তারপর মুখটা কানের কাছে নিয়ে তপ্ত গলায় বলল, "কান পেতে শোন, যে আমার অনুরাগিনী হয় তাকে আমি অনেক কিছু দেই, বুঝতে পেরেছো ?"

হিয়ার কান দুটো লাল হয়ে গেল। আর তখনি কানের কাছে প্রশ্ন "বুঝতে পারনি ত ?"

মুখে না শুধু মাথা নেড়ে জবাব দেয় হিয়া—বুঝেছে।

মানে চোখ কান মন প্রস্তুত শুধু শুরুর অপেক্ষা।

আপ্যায়নের কোন প্রথাটা আগে ? সেটা করার আগে শংকর হিয়াকে বলল, "এরপর থেকে যদি কিছু দরকার হয় স্পষ্ট করে বলবে এই যেমন আমি তোমাকে বলছি·······কি বলছি বলতো ? ততক্ষণে শংকরের আঙ্গুল হিয়ার ঠোঁটে।

নিজেকে অব্যক্ত রাখলেও শংকরের আঙ্গুলটাই মুখর। আস্তে আস্তে হাত নেমে এসেছে হিয়ার গলার কাছে, উষ্ণতা পাওয়ার জন্য ছুঁই ছুঁই করে ছুঁয়েও ফেলল হিয়ার বক্ষদেশ।

অবিশ্বাসের সীমানা থেকে বিশ্বাসের সীমানায় পৌছে হিয়া শংকরের হাতটা ধরে রেখে শংকরের চোখের দিকে না তাকিয়েই বলল "সর্বনাশ করলেন ! যে সম্মান সমীহ আপনাকে করতাম সব নষ্ট করলেন তো !"

চাল চলন, হাসি দেখে উৎসাহ পেয়েছিল, কণ্ঠস্বর শুনে নিজের হাতটা টেনে নিয়ে বোঝার চেষ্টা করল শংকর "এটা কি হিয়ার মনের কথা ?"

চোখে চোখ ফেলতেই শংকর দেখল ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হিয়া হাসছে শয়তানির হাসি। ভেতরের চেহারাটা খোলসা। সঙ্গে সঙ্গে একটা গতির আমেজ এল শংকরের আচরণে। যতটুকু আস্কারা দেওয়া উচিত তাই দিল হিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই।

হিয়ার ভাল লাগল। এই ভাল লাগার স্বাদ পেয়ে কত সহজে সহজ হয়ে গেল দিনে দিনে। এই সহজ হওয়ার মধ্যে একটা আনন্দও বিদ্যমান।

যত ঘনিষ্ট হচ্ছে সর্ট হ্যাণ্ড শেখার সাথে নির্জন স্বাদের জন্য এখন হিয়া সময় অসময় নেই শংকরের ঘরেই থাকে, গোপনে অর্থাৎ সবার আড়ালে ওরা পরস্পরকে তুমি বলেই সম্বোধন করে।

শংকর সর্টহ্যাণ্ড শেখাবার সাথে সাথে হিয়ার গা ঘেষে দাঁড়ায়, বসে একটু গন্ধও শোকে। হঠাৎ করে ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে আরামের নিশ্বাসও নেয়।

হিয়াও ঐ টুকিটাকি খেলায় বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

বেশি টানাটানি করেনি শংকর কোনদিন, কিন্তু একদিন ব্যতিক্রম হলো।

সেদিন হিয়া শংকরের ঘরে দুপুরে একটা গল্পের বই পড়তে পড়তে একসময় ডিভ্যানেই ঘুমিয়ে পড়ল। শংকর যখন ফিরল তখনও হিয়া ঘুমোচ্ছিল। ঘুমের ঘোরে শাড়ীটা তার অনেকটা উপরে উঠে গেছে। ফর্সা পায়ের গোছ দৃশ্যমান।

শংকর জামা কাপর ছাড়ল, পাখার হাওয়াটা বাড়িয়ে দিল বলেই বোধহয় হিয়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে গেলেও সামান্য সময় শুয়ে থাকল চোখ বন্ধ করে, কারণ সে বুঝতে পাচ্ছিল এক দৃষ্টে শংকর তাকিয়ে আছে তার পায়ের গোছার দিকে।

এই তাকিয়ে থাকতে থাকতেই এক সময় শংকরের ইচ্ছা করল ডিভ্যানে গিয়ে বসে। বসতে না বসতে হিয়া পাশ ফিরল। চোখ মেলে তাকাল। চোখে চোখ পড়তেই শংকর অকপট, "তোমার পাশে একটু শুই ? অ.ই স্যাল নট্ ডু এনিথিং রং।"

হিয়া ধরে ফেলল শঙ্করের কৌতুহলটা এই মূহুর্তে কিসে। হকচকিয়ে গেলেও যে এমন করে বলে তাকে না-ই-বা করে কি করে ? হিয়া সম্মতি জানাল।

মুখোমুখি শুয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি চলল, তারই মধ্যে অবিরত মন্থর চালে একদিকে মুখ অন্যদিকে কিছু করণীয় কর্মাদি—একটু তত্ব তল্লাশ বর্ণাঢ্য রূপের ক্রমোন্মচন। চোখের সামনে প্রদর্শনী হয়ে গেল হিয়া।

এই মূহুর্তে অসাড় হয়ে থাকা ছাড়া হিয়ার কোন ভূমিকা নেই।

শংকর ভেবে রেখেছিল সীমিত অবস্থায় জড়াজড়িতে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই নেবে সে, কিন্তু পেতে পেতে আরও কত বেশি পাওয়া যেতে পারে সেই ইচ্ছাটাই বড় হয়ে উঠেছে—তথ্যের সঙ্গে একটু রসের মিশেল।

শংকর কেমন হা করা পুরুষ হয়ে গেল—সংযমের মাত্রা ছাড়িয়ে।

বাসনা প্রকাশ করতেই হিয়া চমকে গেল—ওটা কি করে সম্ভব ? এই ব্যাপারে হিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত নয় মোটেই। কিন্তু প্রতিরোধই বা করে কি করে!

বড়ই কষ্টদায়ক। এমন করে নাড়াচাড়া শংকর এর আগে কোন দিনই করেনি। হিয়া হাফিয়ে উঠলেও নিশ্চল।

হাতের মধ্যে বিস্ময়ের সম্ভার, নিশ্চল প্রতিরোধহীন হিয়া শংকরের ভীষণ ইচ্ছে করল—চোখে অভিসান্ধির হাসি, আর ঠিক সময় হিয়ার প্রাণান্ত কণ্ঠস্বর "আমি কিন্তু ভীষণ আন্ ইজি ফিল্ করছি"—অমন কিচ্ মিচ্ করতেই তৎপর লজ্জায় নিজেকে ছেড়ে দিল হিয়া এমন ভঙ্গীতে বোঝা গেল সে আর অনিচ্ছুক নয় মোটেই। ওটাই ব্যক্ত করল শংকরের নাক কামড়ে. আর তখনি শংকর ভাবল আর বেশি তত্ব তল্লেশের দরকার কী? স্বাভাবিক ভাবেই ফুটে উঠল আনন্দ তাণ্ডব ভঙ্গিমা দাপা-দাপি।

হিয়ার চোখ দুটিতে আতংক বিস্ময় জ্বল জ্বল করে উঠতেই তৎপর লজ্জার সঙ্গে সব অনুভূতি উজার করে এক দমে নিয়ে গেল শংকরকে শেষ ধাপে। নিমেষে স্বস্তি আরাম। শংকরকে ঘিরে থাকল সাপের মত জড়িয়ে কিছুক্ষণ গাঢ় গভীর নিশ্বাস ফেলে যেন বহুদিনের একটা আকাঙ্খা পুরণ হয়েছে এমন তৃপ্তিতে ভরে গেছে তার মুখ। তারই প্রলেপ মাখিয়ে দিল শংকরের সারা অঙ্গে আদরের হাত বুলিয়ে। সত্যি আজকের অভিজ্ঞতাটা আশ্চর্য অবিস্মরণীয়—অতি সুন্দর।

এখন হিয়ার বুক পেট খোলা। পায়ের দিক থেকে কাপড় সায়া সব জড়ো হয়েছে কোমরে। পাশেই শংকর শুয়ে গায়ে গা লাগিয়ে একটা হাত হিয়ার বুকে।

হঠাৎ হিয়ার কানের কাছে শব্দ, "এখন তোমার আন্ ইজিনেশ্ গেছে?"

জীবনে প্রথম ঘটনা, যত অনুরাগ তত লজ্জা। এতৎসত্বেও স্বাভাবিক চিন্তাটা মনেতে দানা বাধতেই হিয়া ফিস্ ফিস্ করল—। "এর পরিণতি কী?"

শংকর আফ্শোষের স্বরে বলল, "আর কোন মধ্যপন্থা নেই।"

হিয়া বুঝল না, কি বলতে চায় শংকর "অর্থাৎ?"

শংকর বুঝিয়ে বলল, "অর্থাৎ ফেঁসে গেলাম, বিয়ে করতে চাইছিলাম না, এখন দেখছি ওটা সেরে ফেলতেই হবে কারণ এখন

তোমার সঙ্গে এসব না করলে আমার ঘুমই আসবে না।"

কথাটা কানে যেতেই হিয়া তড়াক করে উঠে বসে শংকরের চোখে চোখ রাখল, "সত্যি?"

প্রত্যুত্তরে শংকরের কণ্ঠ থেকে "সত্যি নয় তো কি মিথ্যে?" কথা কয়টি কানে যেতেই হিয়া চটপট নিজেকে গুছিয়ে নিতে নিতে দুচোখ ভরে দেখল শংকরকে তারপর ডিভান থেকে নেমে শংকর কিছু বুঝে ওঠবার আগেই গলায় আঁচল জড়িয়ে ঢিব্ করে একটা প্রণাম সেরে দৌড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

শংকর তার চলে যাওয়ার পানে তাকিয়ে থাকল। হিয়াকে নতুন লাগছে। ভালও লাগছে। মনে মনে স্থির করে আজই সে অবনীর মারফত প্রস্তাব দেবে · শুভস্য শীঘ্রম ☐

দুর্বোধ

বাসে করে যাচ্ছিল সুনীৎ। হঠাৎ কানে বাজল 'সুনীৎদা', তাকিয়ে দেখে লেডিজ্ সীটে বসে থেকেই রত্না চোখের ইশারায় সুনীৎকে তার পাশে গিয়ে বসতে ইঙ্গিত করছে।

ইঙ্গিত মত সুনীৎ রত্নার পাশে গিয়েই বসল।

রত্নার সঙ্গে সুনীতের সম্পর্কটা ছিল টুকিটাকি মজার, সময় অসময় মর্সাজিদ অব্দি এর বেশি না যদিও সুনীতের আকাঙ্খা ছিল শিথিল এবং স্খলিত। রত্নাও ছিল প্রতিশ্রুতিমান। সে কারণে সুনীৎ রত্নাকে যত অনুসরণ করেছে আর কাউকে ততখানি করেনি। কিন্তু রত্না তাকে নিরাশই করেছে বারবার—নানা ছলাকলায়।

অর্থাৎ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জানার আগেই ওদের হঠাৎ ছাড়াছাড়ি অর্থাৎ রত্নাকে ঘিরে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আগেই সুনীৎ অন্যত্র বদলী হয়ে গেল। একটা সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে গেল।

তারপর অনেকদিন বাদে আজ পুনরায় দেখা।

সে যা হউক অতীত যদি নতুন করে প্রকাশ পায় তার একটা আলাদা স্বাদ, মাদকতা।

রত্নার পাশে বসতেই সে ঠোঁটে এক টুকরো হাসির ঝিলিকের সঙ্গে তলার সারির দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁটকে চেপে ধরে এমন ভাবে তাকাল যেন অনেকদিন বাদে সুনীৎকে পেয়ে শুভদৃষ্টি করছে, "খবর কি, কোথায় চলেছেন?"

"এই আর কি, যাচ্ছি তোর মাসীর জন্য ঔষধ কিনতে।"

"মাসী আবার কে?"

"কেন আমার বৌ।"

"আমি আপনার বৌকে মাসি ডাকব, বলছেন কি ?

রত্নার চোখ ছানাবড়া, "তা না হয় ডাকলাম। কিন্তু আপনি বিয়ে করলেন কবে ?"

"তুই যখন আমার বৌ হতে রাজী হলি না তখন বিয়ে করব না তো কী !"

"মিথ্যে কথা, আমি বিশ্বাস করি না।"

"বিশ্বাস না করলে আমি কি করতে পারি, আমার আস্তানায় চল তা হলে দেখতে পাবি আমার বৌকে। মাসী না ডাকিস বৌদীই ডাকিস তোর যেমন ইচ্ছে।"

"আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলুন তো সত্যি সত্যি আপনি বিয়ে করেছেন কি না।"

এবার সুনীৎ হেসে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে রত্নাও তাকে ঠেলা দিল, 'বহুত বদমাস হো গিয়া মিঞা। কী মিথ্যুক ! কী মিথ্যুক !"

রত্নার চোখে মুখে আনন্দ আর স্বস্তি যেহেতু সুনীৎ এখনও অবিবাহিত। ফুলের হাসি যেন ছড়িয়ে পড়ল তার চোখে মুখে যেন ফ্লাওয়ার শো।

বাস একটা স্টপে থামতেই রত্না সুনীতের হাঁটুতে চিমটী কেটে ইঙ্গিত করল, "এখানে নামুন।"

রত্নাকে অনুসরণ করে সুনীৎও নামল।

পথ চলতে চলতে এবার তাদের কথপোকথন পুনরায় শুরু :–

"বিয়ে করবেন না ?"

"করব ?"

"আর কবে করবেন ?"

"সময় হলেই করব, বাছাবাছি চলছে।"

"আর কত বাছাবাছি করবেন ?"

"বাছাবাছিতে সময় লাগেই, ঐ কথায় আছে না লাখ্ কথা না হলে বিয়ে হয় না।"

"আচ্ছা, পদ্মা মেয়েটিকে তো চেনেন সে কেমন ?"

"দেখতে তো বেশ মিষ্টি চেহারার মেয়ে।"

শুধু চেহারায় নয় স্বভাবেও।"

"স্বভাব কেমন জানি না, মুখ না খুললে কোন মেয়েকেই জানা যায় না, আসল ভাবে জানতে হলে অন্দর মহলে প্রবেশ করতে হয় যেখানে সে স্বরূপে বিরাজমান।"

"আচ্ছা, পদ্মার কথা ছাড়ুন, ঐ যে মেয়েটি যাচ্ছে ওর নাম নন্দা। সে শুধু সুন্দরীই নয় ভালও, কথা বার্তায় নরম সরম ধীর স্থির সরল প্রকৃতির।"

"খালি চোখে ভাল আর সরল হলেই চলে না। সে যে ভাল তার প্রমাণ কি ? বাহ্য রূপের তলায় কি জিনিস লুকিয়ে থাকে সেটা স্পষ্ট ফোটে বিয়ের পরে। মনের মতন মেয়ে বিরল।"

"তাই বুঝি ?" অনুসন্ধানী চোখে কিছুটা কৌতুহলের ঝিলিক খেলে গেল রত্নার চাউনীতে, "আচ্ছা, আপনার মনের মতন মেয়ের একটা বিবরণ দিন তো, আমি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেব আপনার জন্য।"

"বিজ্ঞাপন দিলেই কি পাওয়া যায় ? মনের মানুষ পাওয়া যায় না ধরা দেয়। যাক্ অনেক হয়েছে এখন শোন আমার কথা। তুই যে আমাকে বিয়ের জন্য পদ্মা নন্দার জন্য ঘটকালি করছিস, সত্যি আমি যদি তোর কথা মতো ঐ পদ্মা বা নন্দাকে বিয়ে করেই ফেলি তুই মেনে নিতে পারবি ? তুই আমার চোখের দিকে চেয়ে বলত ?"

রত্না সুনীতের কথা শুনে গুম হয়ে গেল। অর্থাৎ তার আঁতে লাগল। অর্থাৎ রত্নার নিশ্চুপ ভাবটাই তার ভিতরের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দিল। যার স্পষ্ট মানে হল যতদিন সুনীৎ অবিবাহিত থাকে তার পক্ষে শ্রেয়।

"কী হল, চুপ মেরে গেলি কেন? ব্যাপারটা ওভাবে ভাবিস নি ত। একটু ভাব বুঝলি, তুই পদ্মার কথা বললি আর সুনেত্রা নন্দাকেও দেখালি, তোর সিলেক্শন্ মত আমি ওদের যে কোন একজনকে বিয়ে করে সংসারী হলাম। তুই যেমন বলছিস ওদের যে কোন একজনকে পেলে আমি সুখীই হবো। তারপর ক্রমশ দেখা গেল ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা, শিক্ষা ইত্যাদী আমার চাইতে তার অনেক কম। শুধু কমই নয় আমার বিদ্যা-জ্ঞান-মর্যাদাবোধ, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, জীবনের মূল্যবোধ কিছুই সম্মানের চোখে দেখল না, আমার প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগই অনুপস্থিত। আমার কোন কাজই সে উৎসাহের চোখে দেখল না। মায়া মমতা উদারতা এসব তার বিচারে কোন কাজের কথা নয়। আমার কোন ব্যাপারেই তার সহানুভূতি নেই শুধু নেই নয় বীতশ্রদ্ধ। ফলে আমার মর্যাদার দফারফা, আমি তার কাছে অবহেলার পাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। ওসব নিয়ে কিছু বলতে গেলেই তর্ক বিতর্ক খটাখটি বাকযুদ্ধ অথবা কথা বন্ধ কিংবা নাকে কাঁদা, উপোস আবহাওয়া খারাপ। ক্রমশঃ দেখা যাবে একটা কথা বলতে গেলে পাঁচটা কথা শুনতে হবে। কথার মধ্যে থাকবে রাজ-শর্মিষ্ঠ শৃঙ্খলা বিঘ্নিত। সংযমের পরিচয় দিতে গেলেও প্রহসন মূলক হয়ে যাবে। সম্পর্কটাই হয়ে যাবে লাভ অ্যাণ্ড হেট্ এর, অথচ আমার অন্য কোন গতিও থাকবে না ঐ লাভ অ্যাণ্ড হেট্ এর সঙ্গে সহবস্থান করা ছাড়া। পরিনামে আমার মধ্যে একটা উপলব্ধির দানা বাঁধবে, কষ্ট দেবে. টাল খাইয়ে দেবে মানসিক ভারসাম্য। মনেতে সততই প্রশ্ন জাগবে এই বিপরীত ধর্মী মহিলাকে সয়ে চলতে হবে নাকি সারাটা জীবন?

আমি পুরুষ মানুষ অত জো-হুজুর হয়ে কেন। গোলামের মত থাকবই বা কেন? সে কী সুখী? আমি কি সুখী? কেউই যখন সুখী নই এক সময় এমন অসুখী দাম্পত্য জীবন কাটানর থেকে বিচ্ছেদই শ্রেয়। অমন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কোন দিন ভিন্ন রকম অঘটনও ঘটে যেতে পারে আর তা যদি নাও ঘটে আমি ব্যক্তিত্বহীন রসকষহীন পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে যাব না? তুই তো বলতি এমন ফূর্তিবাজ মানুষ আপনি! বিয়ের পরে ওরকম অবস্থা যদি আমার হয়, তখন আমাকে দেখলে তোর কেমন লাগবে? পারবি তুই আমার তেমন অবস্থা দেখে সহ্য করতে? এই কারণেই তো বলে বিয়ে করা মানে ধোপার বোঝা বওয়া আর গাধার কাজ করা........"

সুনীতের বিশদ ব্যাখ্যায় রত্না স্তব্ধ বাক্য হারা। মনে মনে সে নিজের জীবনের হিসেবও করে ফেলেছে সুনীতের কথা শুনতে শুনতে। মুখ অসম্ভব থম থমে। কে বলবে এ মুখে কৌতুকের হাসি থাকে বারোমাস!

অনেকক্ষণ পর রত্না মুখ খুলল, "আপনি তো আরও কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করেছেন তাদের কাউকে সিলেক্ট করলেন না কেন?"

"ঐ একই ধারা প্রেমিকাও যদি বৌ হয়ে যায় ঐ একই অবস্থা। আঁশ মিটে গেলে প্রেম আর প্রেম থাকে না। বিবাহের পূর্বে মেয়েদের দেহে যে মাদকতার গন্ধ থাকে বিবাহের পরে তার অংশাংশও থাকে না।"

"অত হিসেব করলে বিবাহ হয় না, বিবাহটা ভাগ্য কিছুটা মানিয়েও নিতে হয়।"

"হ্যাঁ, ম্যারেজ ইজ এ লটারী ইন্ হুইচ ম্যান্ স্টেক্ হিজ ফ্রিডাম; ওম্যান্ হার হ্যাপিনেস্। মানিয়ে নিতে হলে অনেক

ভান্‌ ভনিতা। বাহ্যিকভাবে আচরণটাই এমন যেন সুখী দম্পতি এরকম ফরমূলাই চলে। কিন্তু মানিয়ে নেবারও একটা সীমা থাকে। সেই সীমা কতদিন বজায় রাখা সম্ভব? অনেককে তো দেখলাম! সেই কারণেই তো অনেকেই বলে বোকারাই বিয়ে করে, অনেক বোকারামকেই তো দেখলাম, সেই কারণেই তো বিয়ের ভাবনা এখন আর দুশ্চিন্তাতেও আসে না। বিয়ে করলে ফূর্তি যায়, যায় উদারতা, সহিষ্ণুতা। বিয়ে না করে এই বেশ আছি, দিব্যি খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি চাকরিও করছি যা খুশি তাই করছি।"

কিন্তু রত্না সুনীতের যা খুশী তাইতে একমত না। তাই তার উক্তি হয়, "জীবনে তো একটা কেন্দ্র বিন্দু থাকা দরকার, একটা বিশ্বাসের স্থল, বিবাহকেই তো বলা হয় জীবনের সূচনা।"

সুনীৎ ঃ "যারা পরনির্ভর, যাদের কোন উপায় নেই তাদেরই বিয়ে প্রয়োজন। কিন্তু বিয়ে ছাড়াও বাঁচা যায়। এই তো আমি বেঁচে আছি এবং বেশ আছি। মোট কথা বিবাহের চেয়ে সমভাবাপূর্ণ সখ্যতা ঢের ভাল, বোঝাপড়া ভাল হয়, না হলে চ্যাঞ্জ দ্যাট্‌—যার সাথে পটে না তাকে ছেড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু বিবাহ করলে ওটা সহজ নয়।"

রত্না ঃ "কিন্তু নিরুত্তাপ নিস্তরঙ্গ জীবনের আনন্দ কি?"

সুনীৎ ঃ "প্রাণ কেন্দ্র যেখানে পাওয়া যায় আনন্দও সেখানে বিবাহীত জীবনের চেয়ে অবিবাহীত জীবনই তো মজার--পড়াশুনা করে, ঘুরে বেরিয়েও জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। এ ছাড়া কত রকমে পাস্‌ টাইম আছে বেছে নাও।"

কথপোকথনের মাঝে রত্না এক সময় দাঁড়াল। সুনীতেরও হঠাৎ খেয়াল হলো অনেক কথা বলা হয়ে গেছে। রত্নার কোন কথাই শোনা হলো না কেবল সে-ই এক নাগাড়ে বলে গেল, "এইবার তুই বল, তোর বৃত্তান্ত কি ?"

রত্না বাঁয়ের বাড়ীর গেট্ খুলতে খুলতে বলল, "এত তাড়া কিসের ? আসুন একটু জিরিয়ে যান।"

রত্নার ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল সুনীৎ। ঘরটা গোছ গাছ হলেও সীমিত আসবাব। নৈরাশ্যজনক ভাবে কিছু বলার আগেই রত্নার প্রশ্ন "অবাক হচ্ছেন তো ?"

সুনীৎ ঃ "ব্যাপার কি, খুলে বলবি তো ?"

রত্না ঃ "বলব, বলব অপনাকে যখন এতদিন বাদে পেয়েছি সবই বলব, আমি চা তৈরী করে আনি, এ ফাঁকে আপনি একটু আরাম করুন বিছানায়।"

রত্না সুনীৎকে বিছানা দেখিয়ে দিয়ে ভিতরে গেল।

সুনীৎ ভাবতে থাকল রত্নার পূর্ব বৃত্তান্ত। বয়স যখন ছিল রত্নার ২০/২২ তখন সে বহু পুরুষের নায়িকা। আর আজ কিনা সে একলা ! কেন এমনটি হলো ? পরিষ্কার মনে আছে সুনীৎ যখন তাকে বিয়ের কথা বলেছিল রত্নার উত্তর হয়েছিল, "এমন প্রস্তাব আমাকে কতজন দিয়েছে, তাদের কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার, কেউ প্রফেসর, কেউ আবার আপনার মতই গেজেটেড্ অফিসার।"

রত্না কি ওদের মধ্য থেকে কাউকে বেছে নিতে পারেনি ? বেছে নিতে যদি না-ই পারল তবে কেন সে সুনীৎকে স্বামী হিসেবে বরণ করল না। রত্নার হৃদয় জয় করার জন্য সুনীৎ তো অনেক স্বপ্ন দেখেছিল। রত্না কেন রাজী হলো না ?

ওসব ভাবতে ভাবতে হয়ত একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সুনীৎ। ঘোরটা কেটে গেল রত্নার ডাকে, সে একটা ট্রেতে চা ও অল্প কিছু খাবার নিয়ে টি-পয়ের উপর রেখে নিজেও বসল সুনীতের মুখোমুখী।

আগের তুলনায় রত্না একটু ভারী হয়েছে এই যা, কিন্তু শরীরময় দ্যোতনা অটুট। আগে যেমন ছিল তেমনই আছে।

চা খেতে খেতে রত্নাকে ভাল করে দেখল সুনীৎ। রত্নাও সুনীৎকে দেখল, সে আগের মত আছে কিনা।

কি ছলে রত্নার একটা হাত সুনীতের হাতে আশ্রয় নিল। হাতটা ধরে কাছে টেনে সুনীৎ প্রশ্ন করল— আমি যখন তোকে বিয়ের কথা বলেছিলাম মনে আছে তুই আমাকে কি বলে ক্যান্‌সেল্‌ করেছিলি ?"

রত্না এক ঢোকে চা-টা শেষ করে জানাল, "সে সব গোপন কথা জমা আছে বুকের কোরকে। আমি যে তখন ভুল কাউন্টারে হাত বাড়িয়ে টিকিট কাটতে চেয়েছিলাম !"

সুনীৎ : "কি হয়েছিল বলত ?"

অমন প্রশ্নের জবাবে রত্না যা বলল তার মর্মার্থ হলো এই :—

অনেক পুরুষের চোখে নায়িকা হলেও নীলকৃষ্ণ নামে এক যুবককে রত্না বিবাহ করতে তৈরী হয়েছিল। কিন্তু নীল বড় লোভী, সে চেয়েছে তার বোনেদের বিয়েতে তার বাবা যেমন পন-যৌতুক ইত্যাদি নানা দান সামগ্রী দিয়ে পাত্রস্থ করেছেন তেমনই যেন রত্নার বাবাও করেন। নীল এর অমন দাবী যে হবে রত্নার ধারণাতেই ছিল না। তাই নীলকে আল্‌টিমেট্‌লি রিবিউজই করল। নীল নিজেকে ছোট করল রত্না একলা হল। রত্নার বাবা ভাইরা রাজী ছিল নীল এর দাবী মত সব কিছু দিয়ে থুয়ে শুভকার্য সম্পাদন করতে। কিন্তু রত্না একরোখা ভাবে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে নিজের মালিক নিজে থাকতেই প্রেফার করল এবং সবা কে অগ্রাহ্য করার ফলে নিজের আপন জনদের থেকেও বিচ্যুত হলো। তার মতে নীলের ভাল চাকরি গাড়ী বাড়ী ঠাট্‌ বাট্‌ সবই নিরতিশয় আরামের, কিন্তু এমন নিশ্চয় কিছু

নয় যার জন্য অধিকতর বিতৃষ্ণা, ঘৃণা আর অশ্রদ্ধা নিয়ে এক সঙ্গে বাস করা যায়। যেভাবে নীল রত্নার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে —তুলনা বিরল।

"নিষ্ফলতা সুখের নয় নিশ্চয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বস্তির। বিশ্বাস করুন সুনীতদা নীল আমাকে প্রায় পথে বসিয়ে দিয়েছিল। যেমন তাকে সব দিয়েছিলাম তেমনি সমূলে ফিরিয়ে দিয়েছি — ঐ বেইমানের কোন চিহ্ন আমি রাখিনি আমার শরীরে—অঙ্কুরেই বিনাশ। তার জন্য এখন আমার মনে প্রেম নেই, ভাল-বাসা নেই, আক্ষেপ নেই, যা আছে শুধু ঘৃণা। ওর সম্পর্কে কোন রিমার্ক করা মানে বাজে লোকের পাবলিসিটি, আর নাম নিলেও অযাত্রা।"

জমাট দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে মনে মনে হিসাবটা ঝালিয়ে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রত্না সুনীতের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুকরে ফোঁপাল। প্রেমিককে বিয়ে করে স্বামীত্বে বরণ করতে গিয়ে আত্মপ্রত্যয়ে ক্ষোভের কারণে এখন আর প্রেমিকের জন্য সামান্য সহানুভূতিটুকুও হারিয়েছে। সত্যি দুর্ভাগ্য বেচারার।

সুনীতের মনে হলো রত্নাকে কিছুক্ষণ কাঁদতে দেওয়াই উচিত। এখন সুনীতের মনে রত্নার জন্য একটা মাত্রই চিন্তা এই বিষন্ন হতভাগিনী রত্নাকে কি করে প্রসন্ন করা যায়? অমন ভাবনার সঙ্গে রত্নার কান্না ঝরা কাঁপান মাথায় হাত বুলিয়ে যেতে থাকল নিশ্চুপ ভাবে।

রত্নার শরীর ঝরে না গেলেও অসন্তোষ আর ব্যর্থতার কারণে মনটা ঝরে গেছে। ভিতরে ভিতরে শেষ, সেই চুলবুলে রত্নার ঝলমলে ভাবটাই ম্রিয়মান।

আবেগের ঘোরটা কাটিয়ে রত্না তাকাল সুনীতের বুকেতে যেখানটা ভিজে গেছে তার চোখের জলে। তাকিয়েই সুনীতকে বলল, "জামাটা খুলে দিন একটু পরিষ্কার করে শুকিয়ে দেই।"

"থাক্ তোকে ব্যাস্ত হতে হবে না, একটা কথা শুনবি?"

"বলুন, কি কথা?"

"তোর যা অবস্থা দেখছি তোর কেউ নেই, আমারও তো কেউ নেই আয় আমরা একে অপরের ভ্যাকুয়াম ফিল আপ্ করি।"

"ওটা কি করে সম্ভব ?" সি লুক্‌ড প্যাথেটিক্।

"শোন্ বাইরে আমরা স্বীকার করি বা না করি মনে মনে আমরা তো সমমনস্ক। এটা ঠিক কিনা বল ? বল হ্যাঁ কি না ?"

"তা হয়ত ঠিক।"

"তা হলে আয়, ওসব বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমরা নিজেদের বিচার করি। আমরা একে অপরের সহায়ক পরিপোষক হই।"

"সেটা কি ভাবে ?"

"আয়, আমরা হৃদয়ের রাখীবন্ধন নিয়ে এক সঙ্গে থাকি জাস্ট লিভিং টুগেদার। তুই তোর মতে চলবি আমি আমার মতে।"

"ওটা কেমনতর সম্পর্ক হবে ?"

"কেন একজন পুরুষ আর একজন মহিলা।"

"ওভাবে একসঙ্গে বাস করা বিদেশে রীতি থাকলেও এদেশে এখনও তেমন রীতি প্রচলিত নয়। এদেশে বিয়ে না করে ওভাবে থাকা গর্হিত অসামাজিকতা—নিষিদ্ধ।"

"কিন্তু বিয়ে জিনিষটা কি ? নারী পুরুষের প্রকৃতি জনিত অবাধ সম্পর্ক।"

"কিন্তু অবৈধ তো নয় !"

"ওটা তো সংস্কার। আমি সংস্কার মুক্ত সঙ্গিনী চাই।"

"আপনি যা চাইতে পারেন আমি কি তা পারি ? না পারা উচিত ? এই উচিতটা অর্জন করতে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে, যদি সাহস অর্জন করতে পারি···তাহলে তখন দেখা যাবে।"

"তাহলে চল আমরা রেজিস্ট্রি করে প্রকৃত অর্থে স্বামী স্ত্রী হয়ে যাই।"

"তা-ই-বা কি করে সম্ভব ? ব্যাপারটা আপনার পক্ষে যত সহজ আমার পক্ষে তত সহজ নয়।" বলেই রত্না হঠাৎ আবেগে সুনীতের গালে গাল রেখে

অনর্গল ভাবে কেঁদে যেতে লাগল, তারপর একসময় কান্না থামিয়ে শাড়ীর আঁচল দিয়ে গাল চোখ মুছতে মুছতে বলল. 'আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না, আসলে আমি আমাকেই বিশ্বাস করতে পারছি না।''

''বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপার নয়, তোরা কাঁদতেই জানিস সিদ্ধান্ত নিতে পারিস না। তাহলে ছাড়, আমি এখন যাব যদি কখনও আমি যা বললাম তেমন সিদ্ধান্ত নিতে পারিস তবে আমাকে জানাস।"

"সেই ভাল এখন আমার মাথায় কোন লজিকই কাজ করছে না। আপনার কথার ইঙ্গিতটা ভেবে দেখব। মন যদি সায় দেয় যথাসময়ে, যথা-স্থানে অথবা আপনার আস্তানায় হাজির হবো কিংবা চিরকুট পাঠাব, হ্যাঁ যে কোন দিন, যে কোন সময় টেলিফোনও করতে পারি।"

"তা হলে এই শেষ কথা, আমি এখন যাই।'' বলেই সুনীৎ বসা থেকে উঠে জুতোয় পা গলিয়ে দিতে গিয়েই টের পেল রত্না তার জামায় টান দিয়েছে, ফিরে তাকিয়েই সে বুঝল রত্না একটু স্পর্শ ছোঁয়া চায়। প্রকৃত অর্থেই সে চাইছে একটু ঠোঁটের স্পর্শ চুম্বন। তীব্র গভীর আকর্ষণের ইশারা, "নো মী দি ওয়ে ইউ অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু নো" প্রেমের সমুদয় লক্ষণ নিয়েই সে প্রস্তুত। কী উজ্জ্বলই না তার প্রত্যাশী ছবি!

সুনীৎ পরিষ্কার বুঝতে পারল শুধু চুম্বন কেন ইচ্ছা করলে প্রবৃত্তি জনিত কর্মাদিও সারা যায় এই মুহূর্তে রত্নাকে নিয়ে। কিন্তু উন্মত্ত আচরণ সুনীতের স্টাইল নয়। তাই তার জামাটা রত্নার হাত থেকে ছাড়াতে ছাড়াতে বলল,

> ''বুঝলি ভাললাগা ভালবাসা সুন্দর জীবনের উপাদান, তুই এখন ইনডিসিশনে ভুগছিস্, আগে মন ঠিক করে নে তারপর দেখিস্ তোকে আমি সমাদরে তৃপ্তি দিতে পারি কি না। গোপনে গোপনে নয়, পাপবোধ নিয়েও নয় সসম্মানেই তোকে আমি চাই প্রকাশ্যে।"

সুনীৎ রত্নার ঘর থেকে বেরিয়ে গেটটা খুলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওটা আবার বন্ধ করতে যেতেই দেখল রত্না তার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিষ্কম্প বিরহ ক্লিস্ট সব হারানোর শূন্যতা।

সুনীৎ আর পেছনে তাকাল না। না তাকিয়েও সে বুঝতে পারে দুটি প্রত্যাশী চোখ তার চলার গতির সঙ্গে তার পেছনে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সেরাতে ঘুমের মধ্যে সুনীৎ অনেক রকমের স্বপ্ন দেখল রত্নাকে ঘিরে অসংলগ্ন প্রলাপের মত কথাও বলল তার সাথে ঃ—

হঠাৎ টেলিফোন। "কে তুমি ?'

"গলার স্বরে বুঝতে পারছ না ?"

"আরে 'আপনি' ছেড়ে তুই যে আমাকে 'তুমি' বল্‌ছিস্‌ এতেই আমি খুশি, তাহলে তুই আসছিস্‌ তো ?"

"না আসলে তোমাকে টেলিফোন করলাম কেন ?"

"অভিভাবকদের জানাবি না ?"

"কে ধার ধারে। তুম্‌ নেহীতো কোঈ নেহী।"

"কখন আসছিস ? সময়টা বলবি ত ?"

উত্তরটা শোনার আগেই টেলিফোন স্তব্ধ হয়ে গেল। তার মানে সুনীতের চটকা টুটে গেল। টুটে গেলেও সুনীৎ মোটামুটি নিশ্চিত হল তাহলে রত্নাকে চিরদিনের মত সম্পূর্ণ আপন করে পাচ্ছে।

বাট্‌ ইট ওয়াজ এ ড্রিম। দুর্ভাগ্য, স্বপ্ন পূরণ হলো না।

রত্না, চিরকুট পাঠাল না, নিজেও আসল না। টেলিফোনও করল না। কোনটাই না করে রত্না হয়ত নিজের মতামত উহ্য রাখার সিদ্ধান্তেই অটল থাকল।

তবে কেন সে অমন স্বপ্ন দেখল ? অনেক কিছুর ব্যাখ্যাই সরল বুদ্ধিতে মেলে না। ফলম্‌, সুনীৎ রত্নার উপর অভিমানগ্রস্ত হলো নিজের উপর হলো হতাশ। হতাশ হলেও সুনীতের কাছে রত্না চিরজীবনের দুর্বোধ্য হেঁয়ালি হয়েই থাকল ☐

তপনের মাথায় হাত। সর্বনাশ হয়ে গেছে তার। প্রেমেতে যে মায়াবিনী কিছুটা রূপ দিয়েছিল সেই শম্পার হঠাৎ বিবাহ হয়ে গেল। এবং তপনের যাবতীয় অনুমান ওলোট পলট।

স্পষ্টতই তপন এখন হতাশায় ভুগছে। যাকে মনে ধরেছিল তাকে ভালবাসার অধিকার অর্জন করলেও চাওয়া পাওয়ায় মিল হল না।

যাকে পেল না কেন পেল না তার পোস্টমর্টেম করে কি লাভ?

নিজের ভবিতব্য মেনে নিয়ে হি স্যাল্ ওয়ার্ক ইন্ হিজ ওন্ স্টাইল অ্যাজ বিফোর।

কিন্তু অমন করে সব কিছু ঝেড়ে ফেলতে যে পারছে না তপন। শম্পা তার মধ্যে যে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে তার তাপে সে—ভুগছে বড়ই অসহনীয়। চোখের সামনে এখন শুধু সেই মোহিনী শম্পা। কোন কাজেই মন বসাতে পারছে না। রাতেও নিঘুম প্রহরের পর প্রহর। স্লিপিং পিল্ খেয়েও না ঘুম দীর্ঘ বিলম্বিত রাত!

শম্পাকে হারিয়ে তপনের মনের যা ক্ষতি হল, শরীরেরও তাই।

কিছু ভাল লাগে না। কাউকে যদি নিজের অসুবিধের কথা বলতে পারত! পশ্চাত্তাপ নিয়ে দিন রাত যে কাটে না। সে সে বড় একা। একা জীবন যাপন করা তার কাছে খুবই বিরক্তিকর এবং নৈরাশ্যময়।

এই অবস্থায় কি করবে তপন? শত চেষ্টাতেও বিষন্নতার আঁকি বুঁকি মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না।

আজ ছুটির দিন। এ বাড়ীর সবাই দিবা নিদ্রায় মগ্ন, বোবা নীরব স্তব্ধতায় ছেয়ে আছে সারা বাড়ীটা।

ছুটির দিনে তপনেরও দিবা নিদ্রা নিত্য কর্ম পদ্ধতির অঙ্গ। কিন্তু তার যে ঘুম আসছে না। একে তো গরম তদুপরি মনটাই যে তার বিভ্রান্ত। মনেতে একটা মাত্রই চিন্তা যাকে পেল না তার সদৃশ বিকল্প কোথায় পাবে সে? শরীরময় বয়সের ক্ষিদে।

আসলে শম্পাকে হারিয়ে তপনের ভিতরের কলকব্জা উল্টো পাল্টা। কবে কখন একটু খানি চাওয়া পাওয়ার জের নিয়ে স্বপ্ন দেখলে চলবে না। বাস্তব কাউকে চাই। কামনার তাপ শরীরে মনেতেও প্রাকৃতিক চাহিদা-প্রাইম টাইম। যৌবন তরঙ্গ রুধিবে কে?

দাওয়াই একটাই "নিজের বৌ নিজে বেছে নাও" বিশেষ যেখানে উদ্যোগী হয়ে তার বিয়ে দেওয়ার কেউ নেই।

শম্পা তার শরীরের ক্ষিদেটা উস্কে দিয়ে উধাও।

এখন হয় বিবাহ নয়ত কোন তাতানো যৌনবতীর সান্নিধ্য, যে টনিকের মত কাজ করে ভুলিয়ে দেবে শম্পার স্মৃতি। তার মানসিক অবস্থাটা এমন হাতের কাছে একজনকে চাই। সে বড় একা।

জানালার পাল্লাটা খুলতেই চোখ পড়ল শরিকের বারান্দায়। এই নির্জন দুপুরে চারিদিকে ঘোর লাগা অবাস্তব নিস্তব্ধতা। বাস্তব শুধু একমাত্র শরিকের মেয়ে নয়না, নিছক নির্জনতার পাহারাদার। একলা বসে কি যেন পড়ছে।

নয়নার বলয় দেখেই বোঝা যায় তার মধ্যে বল্লু আছে কিন্তু তাকে নিয়ে তপন কোন দিনই মাথা ঘামায়নি। কারণ শম্পাকে জড়িয়ে ঘটনাবলীর আগে তপনের টেম্পারামেন্টই ছিল— ভিন্নতর নীতি নিষ্ঠ যুবক। কিন্তু এখন তার মানসিকতা পাল্টে গেছে। তাই সে জানালায় দাঁড়িয়ে নয়নাকে খুটিয়ে দেখছে।

নয়নাকে ইতিপূর্বে দেখেনি তা নয়। নানা সময় নানা ভাবেই দেখেছে। কিন্তু তখন দৃষ্টিটাই ছিল সংযত, স্বভাবও ছিল সংযমী। এখন সেই দৃষ্টিও গেছে স্বভাবও পাল্টেছে।

চোখ দুটোই তৈরী হয়ে গেছে আবিষ্কারকের মত।

দেখতে নয়না সুশ্রী শান্ত সুভদ্রই। পোষাকে অনাড়ম্বর। পূজোয় আচায় নিষ্ঠাবতী চলনে বলনে গোপন চাহিদার দিশা বোধগম্য নয়।

ওসব নয়নার বাহ্যিক। গোপন খবর সে একটু ল্যুজ টাইপের। সে বড় ঘন ঘন প্রেমিক বদলায়।

মোট কথা তার অনেক কেচ্ছা যতটা প্রশংসাসূচক ততটাই নিন্দাসূচক অর্থাৎ নৈতিকতার খাচায় বন্ধ নয় তার চাল চলন। সবই শোনা কথা, গুজবও হতে পারে। এসবের পেছনে কি সত্য লুকিয়ে আছে তা নিয়ে তপন ভাবে না। সে জানে নজর কাড়া খুপরসতদের কিছু বদনাম রটে। কেচ্ছাই সুন্দরীদের ভূষণ। কেচ্ছা না থাকলে সুন্দরী কি? আবার কোন সুন্দরীকে দুশ্চরিত্রা আন্দাজেই নজর কাড়ে।

খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে তপনের নজর কাড়ল নয়না। নীতি নিষ্ঠ যুবকের অহঙ্কার তারও গেছে প্রাক্ দয়িতার কারণে। এখন তার এই নয়নাকে পেলেও চলবে। ঘরের সামনে বিকল্প থাকতে সে কেন ভুগছে শম্পা চিন্তায়? হোক্ না তৈরী নতুন করে কিছু মজা নয়নাকে জড়িয়ে।

এই মধ্যাহ্নে অলস অদ্ভুত একটা সুর চায় পাশে। বাড়ীর সবাই ঘুমোচ্ছে। নয়না কেন ঘুমোচ্ছে না? এত নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে কেন তাকে? তার কি প্রবলেম?

সাধারণ বুদ্ধি কি বলে? বয়সটাই বোধ হয় প্রধান সমস্যা। নাকি অতি গরম? পরিধানে শাড়ি আছে বটে, তবে যে ভাবে আছে সব আড়াল হয় না। ঢিলে ঢালা, ফানুসের মত ফুলে রয়েছে উরোজ পরাণ ধরে ফুঁঃ দিলে মুহূর্তে চিচিং ফাঁক।

নয়নার দিকে তাকাতে তাকাতে তপনের মনে একটা বিশেষ মনোভাব তৈরী হয়ে গেল। মানসিক প্রস্তুতির প্রথম ধাপ। এই নির্জন দুপুরের নগ্ন পরিবেশে নয়নার সান্নিধ্য যদি পায় মন্দ কি!

আন্দাজেই মাথায় চেপে বসল হঠাৎ খেয়ালের ভূত এবং আচমকাই বাতাসের উদ্দেশে তপন গলা খাঁকারি দিল। উদ্দেশ্য একটাই নয়না যদি খাঁকারির মর্মটা আন্দাজ করে উৎসুক হয় কিংবা সংকেত ভাবে।

অসম্ভব আকর্ষণ থেকেই হঠাৎ সংকেত।

নয়না উঠে যাচ্ছিল। তপনের গলা খাঁকারি শুনেই সে বাঁকা চোখে ঘুরে দাঁড়িয়ে অবাক মার্কা সচকিত দৃষ্টিতে কি ঠাওর করল সেই জানে তবে নয়নার চোখ প্রশ্ন সূচক, 'খাঁকারিটা কি স্বাভাবিক না কোন মতলব ?'

দৃষ্টিটা দেখে ঘাম ফুটে উঠেছে তপনের কপালে। কিন্তু ঢিল ছুঁড়ে দেওয়া হয়ে গেছে এখন আর পেছোবার উপায় নেই।

না, বেশি মাথা ঘামাতে হল না। নয়না চোখে সতত মৃদু হাসির ছোঁয়া নিয়ে জানালার কাছে এসে মুখোমুখি দাঁড়াতেই তপন জানতে চাইল, "বল তোমার খবর কি ?"

চড়া রোদের হলকাতেও চাঁদের মত সঞ্চরমান হাসি নিয়ে নয়না পাল্টা প্রশ্ন করল, "আপনার খবর কি ?"

তপনের নিজের ভিতরে এত কথা জমা, সেগুলু বলতে গেলে অনেক সময়ের ব্যাপার। অস্থিরতার কারণে ঠিক ব্যাখ্যাও করতে পারবে না। তাই সে আমতা আমতা করে বলল, "আমি জানতে চাইছি তোমার খবর তুমি জানতে চাইছ আমার, তাহলে এসো না আমার অবস্থাটা অনুধাবন করে যাবে, এসো প্লীজ।"

বলার ভঙ্গীটা যেন ব্যক্তিগত কথা বলবে তাই এ আহ্বান।

আহ্বান তো নয়, চোরের মত ফ্যাস্ ফ্যাসে আওয়াজ।

তা আওয়াজটা যেমনই হউক আবেগ স্পর্শ স্বরের মতই কাজ করল। নয়নারও তো ব্যক্তিগত কথা বলার আছে তবুও নয়নার চোখের তারা ওঠা পড়া-হীন। সম্ভবত সে তপনের মুখের লিখন পড়তে চাইছে—এত দিন তার দিকে তাকিয়ে যার দেখার সময় হয়নি হঠাৎ কেন এমন সুনজরের ডাক ? ডাকটা

আন্তরিক তো ? বড় বড় চোখের এপার ওপারে কৌতুহলের ছটা, টেপা ঠোঁটে মস্করার ভাঁজ ।

নয়নার টানা চোখের লোভানি মাধুরী তপনের মনে সৌন্দর্যের তল সৃষ্টি করল, হ্যাঁ, চাই এমনই রোশনাই—দুর্ণিবার আকর্ষণ, সঙ্গে সঙ্গে তপনের ফ্যাস্ ফ্যাসে আমতা আমতা আওয়াজ সরে গিয়ে ফুটে উঠল ষড়যন্ত্রের ইশারা বাক্য "দেখছ কি ? বুঝতে পারছ না ?" সতর্ক চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে নয়নার হাত ধরে টান দিল ।

প্রকৃতির ডাক । নয়নাকে নাড়া দিল । বিস্ময়ের সন্ধানী চোখ নিয়ে অসল কার্পণ্য মিশ্রিত ঢিলেমির সঙ্গে চার পাশে শ্যেন দৃষ্টি বুলিয়ে সে তপনের ঘরের পেছনের দরজার দিকে মোড় দেবার লক্ষনেই তপনের মনে উল্লাসের প্রতিফলন ।

ব্যাপারটা অত সহজ সাধ্য হবে ভাবতে পারে নি ।

প্রাক-দয়িতার কারণে তপন সঙ্গত ভাবেই সেক্স্ ওরিয়েন্টেড । তার অভিজ্ঞতায় প্রেম মানে একটা জটিল ভাব—শারিরীক তাগাদা । মূল বা আদি ব্যাপার হল সেক্স্, সেক্স্ই প্রেম—অসভ্যতারই নামান্তর ।

আগে তো সুখটান, তারপর প্লাশ অ্যাণ্ড প্লাশ, জানালাটা বন্ধ করে নয়নাকে অভ্যর্থনা করতে মনে মনে পায়তারা কষল তপন ।

ধীর চলা পদক্ষেপে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির সতর্কতা চারিদিকে নিক্ষেপ করে ঘরে ঢুকে দুয়ারটা ঠেলে তরল চোখে কিছু বলতে যাবার আগেই পলকের চেয়েও দ্রুত তপন নয়নাকে জড়িয়ে ওষ্ঠ টেনে মুখ গহ্বরে ভরে ভাল লাগার আতিথ্য বিতরণে নিবিষ্ট হতেই বিষন্ন মনের বিদায় বাঁশি বেজে উঠল ।

লম্বা এক টানে মজ্জা চুষে নিতেই তপন-তাপ-সুখ-লুব্ধা নয়নার চোখের পাতা জুড়ে যেতেই আরামের চাপে তপনের পিঠে আলতো করে হাতটা রেখে হিল হিলে ভঙ্গীতে বশ্যতার শিথিলতা—বড়ই ভ্যালুয়্যাবল ।

যার সৌন্দর্য মূল্যবান তার সৌন্দর্য মাপাটাও জরুরী, হ্যাঁ এখন নয়নার সব কিছু জানার অধিকার তপনের গ্রিপ-এ । আপ্লুত আমেজে নয়নার আঁচল ধরে টান দিতেই নয়নার ভ্রূ কুঞ্চন, "এই প্রকাশ্য দিবালোকে ?"

এখন তপনের ব্যক্তিত্বে নতুন মাত্রা, কোন কাজেই আর আমতা আমতা নেই যেন নয়না শরীরের ক খ গ'র সবগুলির পরীক্ষা দ্রুত সেরে ফেলতে হবে।

হ্যাঁ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিক দিয়ে নয়না সত্যি ডগমগে। লম্বা, তন্বী, ছিপ-ছিপে — শরীরে মেদ নেই। দেহশ্রী প্রকৃতিদত্ত। কোমরের উপরি ভাগ থেকে গলার অংশ লম্বাটে। রংটা ফর্সার দিকে।

মোট কথা যে রং-এরই হউক—ভয়ানক এবং ছকের বাইরে।

ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের সার্থক দ্রষ্টব্য—মায়াময় শরীর প্রাণ ভোলানো মন মাতানো। চিত্তাকর্ষক দৃষ্টি ভোগ। দৃষ্টিনন্দন নয় শুধু হৃদয় নন্দন।

পুরুষ মেয়েদের শরীরের কি কি দেখতে চায় সে ফিরিস্তি দিয়ে কি হবে? দেয়ার ইজ এনাফ এভরিথিং চমক জমক বাহারে সুপারল্যাটিভ।

এসব তপনের অদেখা নয়। তবু দর্শন অনুভূতিই, শ্রেষ্ঠ অনুভূতি দেখার মধ্যে ভিন্ন ধরণের সুখের স্বাদ।

সত্যি নয়না বড়ই সুনয়না। এ সৌন্দর্য তুলনাহীন। শরীরে কোন দাগ নেই। সিল্ক স্মুদ ঋদ্ধ বৈভব। দর্শককে পাগল করে দেবার মতই রম্ভক। সুন্দর, অতি সুন্দর, আরও সুন্দর একারণে তার হাব ভাবে এতটুকু উস্‌খুসানি নেই, লজ্জায় চোখও মুদ্রিত নয়। তালু বন্দীতে বিপর্যস্ত হয়েও মুস্‌করাচ্ছে আর থেকে থেকে তপনের রেখাঙ্কিত মুখের প্রতি অবলোকন করছে নিষ্পলক বড় বড় চোখে শুদ্ধ মণি, "পুওর ফেলো, তোমাকে বেচারি ছাড়া কি ভাবতে

পারি? এত চিড়বিড়ানি তড়পানি তোমার, আশ্চর্য! বিয়ে করোনি কেন?"

"তুমি কেবল বিয়ে করিনি কেন জানতে চাইছ, আর কিছু না?" বলার সঙ্গে তপনের উগ্রতা প্রতি অঙ্গ লাগি প্রতি অঙ্গ, পারলে এক্ষণি নয়নার গোপ-নীয়তা ভেদ করে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার। মানে ইচ্ছা করলে সবই করা যায় অবাধ আজাদ।

ভয়ঙ্কর বিস্ময়ে নয়নার চোখের পাতা ঘন হয়, যত ঘন হয় ততই তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল তারও অঙ্গ ভঙ্গীতে এবং মুহূর্তে আশ্লেষে নিজের মত করে

অনুভব করতে খুব প্যাশান নিয়ে আবেগের সঙ্গে তপনের ঠোঁট টেনে নিয়ে এমন একটা আবেশ সৃষ্টি করল, নীরব সরবরতায় ঘরটা ভরে গেল।

আরনায় বিম্ব প্রতিবিম্ব যুগ্ম উল্লাসের প্রতিফলন।

বাইরে রৌদ্র দগ্ধ হল্কা। ভিতরে গরম আরামের সখ্যতা।

এক বৈঠকেই তপনের শম্পাকে হারানর বেদনা, ক্ষোভ, অভিমান বিষন্নতার এক ঘেঁয়েমি উড়ে গেল। মন থেকেই মুছে গেল শম্পার সঙ্গে জড়িত সব ঘটনাবলী।

এক সময় নয়না ফিরে গেল। যাবার সময় জিভ ভেংচে চমৎকার দন্ত পঙক্তির রশ্মি বিলিয়ে সঙ্কেত রেখে গেল এই প্রথম এবং শেষ নয়—শুরু। ওয়ান হিণ্ট ওয়াজ এনাফ ফর তপন।

এক্সটেন্শন চলল। তপনের মনে হল ভাগ্যটা তার ভালই, শম্পাকে পায়নি তো কি হয়েছে, নয়নাই তাকে মেক্ আপে রাখবে। নয়নাই তার বেদনা নিরোধক—কনজারভেশন্ অব এনার্জি শক্তির নিত্যতা—স্ফূর্তির উৎস।

একে অপরের কাছে স্বতঃ ঘূর্ণায়মান বৃত্ত-কীর্তন-সংকীর্তন কৃষ্ণলীলা. যদিও বাইরে থেকে দেখে কারোরই মনে হবে না আপাত বিচ্ছিন্ন দুজনার মধ্যে কোন যোগাযোগ থাকতে পারে বা আছে।

দুজনেই দুজনার পুঙ্খ পুঙ্খতায় নেশুড়ে। নেশুড়ে হলেও সম্পর্ক এখনও সীমাবদ্ধতায়। রহস্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ তাই অসমাপ্ত।

তপনের কাছে নয়নার সঙ্গ সুখ ব্যাপারটাই মূল্যবান। কিন্তু নয়না রসের সত্যকে সীমাবদ্ধতায় আটকে রাখতে নারাজ। ইচ্ছা পূরণের ইচ্ছায় সে কায়াবাদী। সহজিয়া এবং শিশ্নোদর পরায়না।

আঙ্গুরলতা আঙ্গুলের মুদ্রায় ভূমিকাস্পর্শ। চোখের জোনাকিতে উপচে পড়া আদিরসের ভাবাবেগ-হিট্ দ্য মার্ক।

উচ্চারিত অনুচ্চারিত দাবী।

আত্ম সমর্পনের ভঙ্গীতে উদোম জীবনরস শুষে নেওয়ার তীব্র আকাঙ্খায় বুজে গিয়েছে তার চোখ।

এমন নয় যে তপনও অমন আনন্দ চায় না, কিন্তু ও ধরণের সাহসের প্রকাশ তার পক্ষে সম্ভব নয়। সাহসও পায়না। তার মুখ্য ভাবনা, প্রেম যখন হল, এখন বিবাহ তারপর রসের সত্য আহরণ রীতি সিদ্ধ ভাবে রতি সিদ্ধ দস্তুর মাফিক। তার মতে বাসর রাতই হল সুপ্রীম টেস্ট অব্ ম্যান্ অ্যাণ্ড উম্যান্ এবং যতদিন সে রাত না আসছে ততদিন যা চলছে চললেও কিছু স্বেচ্ছা বন্ধনা মেনে কৌমার্যের মর্যাদা রক্ষা করে চলা উচিত।

কিন্তু এই অর্ধাশনেই বা আনন্দ কি? সুতরাং বিবাহটা জরুরী কৃত্যক বিয়েই তার চুড়ান্ত লক্ষ্য।

বিবাহের কথা বলতেই নয়না সয়েস মুখে, "সো নাইস এ প্রপোজ্যাল" ফুটে উঠলেও গলার স্বরে চমক, "ও কথা আমাকে বলে কি হবে?"

তপন অস্থির, "তোমাকে বলব না তো কাকে বলব?

এবার নয়না আরও স্পষ্ট, "দেখ বাবু কপালে সিঁন্দুরের টিপ পড়ে স্বামী পূজো করা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, সংসারের মোহ টোপে জড়িয়ে পড়তে আমার ইচ্ছাও নেই, প্রবৃত্তি অনুযায়ী সহজাত চাহিদার স্বাভাবিক খেলতে হয়তো খেল।"

এই সেরেছে, প্রমাদ গুনল তপন, "এ জাতীয় খেলাতো নষ্ট কম-কাণ্ড চরিত্রহীনতার নামান্তর, এতে কি সুখ? কলঙ্ক মুক্ত সখের প্রেম।"

লজ্জার মাথা খেয়ে নয়নার বক্তব্য হল, "গুলি মার চরিত্রের। চরিত্রটা কি? চরিত্র বোধ না থাকাটাই চরিত্র। সুখের চেয়ে সখই বেস্ট, যারা পরস্পরকে ভালবাসে তারাই স্বামী-স্ত্রী। স্টপ গ্যাপ্ মেঝার্স নিলে সুখও নিজেদের কাছে বুঝেছে? সময়ের তালে চলতে শেখ।"

নয়না যা ইঙ্গিত করল লজ্জাহীনতা ছাড়া কিছু নয়। তা সম্পর্ক যেখানে লাজলজ্জার নয় অমন বলাতে দোষ নেই। স্বীকার করতেই হয় কথাগুলু তাৎপর্যে গভীর, অমন সম্পর্ক তো আকছার হচ্ছে অবাস্তবও নয়। হাজব্যাণ্ড ওয়াইফের কনসেপ্টই বদলে যাচ্ছে। যৌন সঙ্গী লিভিং টুগেদার। বৌ বা ভাতারের অভাবে অনেকে অমন গোপন বিহারে আগ্রহী। ছোট পরিবার সুখী পরিবারের কল্যাণ মূলক প্রচারের প্রাবল্যে মানুষের মানসিকতাও পাল্টে যাচ্ছে এবং সেটাই অগ্রগতি। প্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজারে অনেক আধুনিক এবং ডি-লুক্স্ জিনিস যেমন সুলভে প্রাপ্য তেমনি সহজ লভ্য—ইউজ্ অ্যাণ্ড থ্রো অর হিট অ্যাণ্ড রান। কলঙ্কে লিপ্ত হয়েও নো কলঙ্ক। ডিল্যুক্স নিরোধই হয়ে যাচ্ছে মডেল।

স্মিত হাস্যে নয়নার ইঙ্গিত হল, "ওসব বরাভয়দাতা পদ্ধতি নাও। নো কলঙ্ক সেভিয়ার অব ডেঞ্জার সংকট কো তলাক দেবার ইলাজ ভী হ্যায়।"

নয়নার ইঙ্গিত কি! কথার বাঁধুনী কি! হাও ফানি! কাফি ম্যাচিউরিটি।

তপনের বিদীর্ণ বিস্ময় চরমে। তার ভাবনা ভিন্নতর। দিনানুদিনের পরতে পরতে বিশ্বাস আর মর্যাদার উপর সম্পর্ক স্থাপিত না হলে বুক চিতিয়ে তো চলতে পারবে না। ব্যক্তিগত সম্মান—সন্তুষ্টি বলে কিস্‌ছু থাকবে না? এতে কি সুখ? মিথ্যার আরতি।

একের প্রতি অপরের ভরসা, নির্ভরশীলতা, বিশ্বস্ততা. দায়িত্ব বোধ অধিকার, নিয়ন্ত্রণ না থাকলে যে কোনও দিন সম্পর্ক পিছলে যাবে, হিট্ অ্যাণ্ড রানে তপন বিশ্বাসী নয়। যেখানে দুধ খেতে পারে সে কেন ঘোল খাবে?

"আমি বিবাহীত জীবনের পূর্ণ অধিকার চাই, আনন্দ চাই, চাই সফলতার উপহার, প্রেরণার উৎস। আমি তোমার নির্ভর-শীল সঙ্গী হতে প্রস্তুত। বিবাহটা একটা সামাজিক ব্যাপারও তো বটে! কলঙ্কে জড়িয়ে নিষ্কলঙ্ক শরীরের জয়গানে

তৃপ্তি যদি না মর্যাদা উপহার পেলাম !" অমন সম্পর্ক কে কি খাটি প্রেম বলে ?

তপনের বক্তব্য বিশ্বাস আর দর্শনের জবাবে নয়নার জবানী হল, "তোমার কথাগুলো শুনতে মন্দ লাগছে না তবে কি জান প্রেম কথাটাই নিছক আরোপিত, যতদিন রহস্য তত দিনই মোহ, মোহ গেল তো প্রেমও গতাসু অ্যাণ্ড আল্‌টিমেটলি সুপার ফ্লপ বিয়ে করলে। এই যে ভাল লাগা এটাই হারিয়ে যাবে, তার চেয়ে যতদিন ভাল লাগে সহজাত চাহিদাতে সম্পর্কটা চালু থাকুক এসো লেট্ আস্ সেলিব্রেট্।"

জিভ্ আলগা নয়নাকে তপন খুঁটিয়ে দেখল। যার পেটে এত বজ্জাতি সে মোটেই নির্ভরশীল সঙ্গিনী হবে না। যে কোনদিন পিছলে যাবে। মুড্‌টা তার খারাপই হয়ে গেল। বিস্বাদই লাগছে, এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদই যথার্থ।

তপন যা করবার সঠিক ব্যাকরণ মতই শিষ্টাচার সংগত ভাবে—বিবাহের পরে। সুতরাং আর মজা নয় নয়নাকে সে বাতিল করেই দিল। অর ভালও লাগছিল না। সুখদায়কও না তাকে না পেলে কি এমন ক্ষতি হবে ?

কিন্তু নেশার নাম প্রেম। প্রেমে ঢোকা একরকম, আর এ চক্কর থেকে বেরোন বড় কঠিন। সম্পর্ক বাতিল করলেই হল ! নয়নাই বা ছাড়বে কেন ?

কম্‌লি নেহি ছোড়তা। নয়না টের পাচ্ছে কয়দিন ধরে তপন ঘরেই থাকছে না, যখন তখন বেরিয়ে যাচ্ছে। নয়না সামনে পড়লেও চোখে চোখ মেলে না। এড়িয়ে চলার চেষ্টা।

কিন্তু নয়না তো আঠাল, তার মজাই লাগছিল। সে তপনের আসল মূর্তিটা যাচাই করতে চায় এবং চায় বলেই স্বভাবজাত কৌতূহলে নেপথ্য চারিনী হয়ে নিশুতি রাতে ঘনান্ধকারে তপনের ঘরে মিরাক্যালি উদয় হল সে বিনা নোটিশে।

"আরে কি সর্বনাশ ! কেউ যদি টের পায় ? খুব রিস্ক হয়ে গেল না ? ধরা পড়লে সেম্ সেম্। প্রচণ্ড লজ্জার কথা" তপন আতঙ্কিত বুক দুরু দুরু, মুখে উদ্বেগ, ভয়ার্ত ফিস্ ফিস্ স্বর।

"ভয় পেলে থাক্ আমি ফিরে যাচ্ছি" ফ্লাশ বাল্বের মত নয়নার চোখের আলো দর্শনেই তপনের মন চকিতে অভিভূত। আতঙ্ক সত্ত্বেও গলায় তার ভিন্ন সুর. "তা এসেই যখন পড়েছ, যেতে দিলে তো! গুলি মার রিস্ক এ রাত তোমার আমার।"

আচমকাই কলুষ ইচ্ছার মোচড়, পুরুষের পরিচয় পৌরুষে অনুখা-মওকা। ভোগ স্পৃহার শয্যায় টেনে নিল নয়নাকে তপন অত্যন্ত তৎপরতায়, যেন এক পেট খিদে তার ভিতরে নিষিদ্ধ ফল চাই। যুক্তি বুদ্ধি বিবেচনা সব বন্ধক।

সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা পাল্টে গেল। কারও মুখেই আর কোন কথা নয়, সবই শরীরের শব্দোচ্চারণ। ভগবানের দেওয়া ইন্দ্রিয়ের সদ্ব্যবহার। সঠিক অভিব্যক্তি-তেই হুবহু মেলবন্ধন।

দেহশ্রীর সঙ্গে যৌবনশ্রীর সখ্যতা অঙ্কের নিয়মে নির্দিষ্ট পথ। কথা বিনিময়ের প্রশ্ন নেই।

ঘরেতে ডিম আলো, সে আলোতে দেওয়ালের গায়ে আঁকা জোকা খেলার সঙ্গে এক যোগে দুহাত ছড়িয়ে শরীরের সর্ব শক্তি নিয়োজিত করে বিবাহের জন্য অপেক্ষা না করে টাঙ টায়েড্ হয়ে একের শ্বাসবায়ু অপরের শ্বাসবায়ুতে মিশে গেল—চমকপ্রদ রতি সিদ্ধ। একটা দুর্মূল্য বিলাস, দুর্লভ অভিজ্ঞতা বিনোদনের রস নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অন্তরণ। দুজনার কানের কাছে দুজনার মুখ।

এক টেকেই ও কে যেন এক উচ্চমানের শিল্পকর্ম। সুপার ডুপার হিট ফ্লুয়িডিটি ফ্লেক্সিবিলিটি—হেমরেজ।

নতুন ব্যাপারে নতুন ধরণের কবোষ্ণ আরাম-মরমী রসানুভূতি যার প্রতিটি পরতে পরতে। আবেগ, উচ্ছাস আর আন্তরিকতার ছোঁয়া। নিঃশব্দে শরীরের প্রতিটি রোমকূপ ভরে গেল। শরীরটাই হয়ে গেল সুখের কদম।

মানব মানবীর এই ছবিটাই তো স্বাভাবিক ধর্ম।

সবচেয়ে বড় কথা নিজেকে উজার করে দেওয়া।

চমৎকারীত্ব দেখাতে নয়নাও কসুর করেনি। আশ্চর্য ছন্দ তার শরীর দোলায়, কোমর দোলায়, সে যথেষ্ট তৈরী এবং লয়দার, গমকের সঙ্গে রূপ খুলে গেল—মহালাস্যময়ী।

এই প্রথম তপন বুঝল উপভোগ না হলে প্রেমে স্বার্থকতা নেই। এমনতর খুশির আমেজ আগে অনুভব করেনি। অদ্ভুত এক আবেশে মনকে আপ্লুত করল সীমাহীন আনন্দ। এতদিন বাদে নারীর আসল রং-রূপ-বর্ণ-গন্ধ ও স্বাদের আস্বাদন হল।

আসলে প্রেমটাই হল এ গেম অব বডি কনট্যাক্ট। এই আসগ অ্যাজেণ্ডা বাদ দিলে প্রেম ইজ নাথিং, প্রহসনের খেলা। সুরুর আগেই যত দ্বিধা। একবার আঁড় ভেঙ্গে গেলেই রিপ্লেবোনাস মধুর পারস্পরিকতার মটিভেশন, চটজলদি রেডিমিক্স শেষ নাহি যে শেষ কথা বলবে, বাকী অর্দ্ধরাত্রি ক্রমশঃ সাদা হয় হয়।

নৈশ বিনোদনের চিহ্ন থাকতে থাকতেই তপন নয়নাকে আহ্লাদে জড়িয়ে থেকেই বিবাহের কথা তুলল।

নয়না প্রথমে অরাজি। পরে নিমরাজি ভঙ্গীতে আর রা কাড়ল না-বোথ ইয়েস অর নো বোঝা যায়, "ঠিক আছে তোমার যেমন ইচ্ছে, তবে এখানে নয়, অন্যত্র গিয়ে চুপ চাপ, জানাজানি হলে কে কি ভাবে ভেটো দেবে ঠিক কি ?'

একটা আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং হল। যুগ্ম সম্মতি চুক্তি, গান্ধর্ব বিবাহ করে কখন, কোথায়, কিভাবে। অত্যন্ত সিক্রেট।

সবই ঠিক তবু তপনের মনে, "না আঁচালে বিশ্বাস নেই ঠিক্ ঠিক্ ···, শেষে না ······।

দিল খোলা গলায় দ্বিধাহীন আশ্বাস দিল নয়না, "দেখো, আমি ঠিক সময়ে বাস্ স্ট্যাণ্ডের ওয়েটিং রুমে উপস্থিত থাকব ঠিক ঠিক ঠিক।"

আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং মত রেশম ছোঁয়া মন নিয়ে তপন বাস স্ট্যাণ্ডে যথা সময়েই হাজির। নয়না তখনও আসেনি।

প্রতীক্ষা করতে করতে এই প্রথম তপনের মনে ভিন্ন সুরের ভাবনা। সঙ্গে কিছু অস্বস্তি। এমন করে পালিয়ে বিবাহের কথা না ভেবে সে যদি স্ট্রেট প্রস্তাব দিত নয়নার অভিভাবকদের কাছে, তাহলে কি এমন হতো? তার তো কোন খামতি নেই। স্বজাতেরই তো সে। প্রস্তাব দিলে স্বাভাবিক ভাবেই অভিভাবকরা প্রসন্ন চিত্তে সহর্ষেই মেনে নিত ওকে নয়নার বর হিসেবে। তা না করে এমন মতি হল কেন তার?

এখন আর ভেবে কি হবে? কত কি ভুল হয়ে গেল তার!

নতুন যোগ বিয়োগ করে কি আর লাভ!

কিন্তু নয়না কেন আসছে না? দেরী করছে কেন? তিন সত্যি দিয়েছে, অথচ এখনও আসছে না। এক সঙ্গে এলেই ঠিক হতো।

তপনের মনে চিন্তা ঢুকল। নয়না যদি না আসে? যদি মত পাল্টায়? ভয় পায়? কিংবা ধোঁকা দেয়?

পুরুষ মানুষকে বোকা বানান একটা সুন্দরীর পক্ষে কিছু না।

সুন্দরী-রা একটু শয়তান হয় এবং সুন্দরীদের অতি বিশ্বাস মোটেও ভাল নয়।

বাস ছাড়বে কয়টায়? নোটিশ বোর্ডে লেখা—ঠিক বারটায়।

তপন ঘড়িতে চোখ বোলাল। বারটা বাজতে আধ ঘণ্টার মত বাকী। তবে নয়নার এতক্ষণে আসা উচিত ছিল।

যদি না আসে? মনেতে প্রশ্নটা চাপা দিতেই তপনের মনে সংশয়। পেটে মোচড়—সন্দেহ বেড়ে গেল।

এখন সে অস্থির চঞ্চল। মন মানে না। বাস স্ট্যাণ্ডের আয়নায় চোখ পড়তেই সে চমকে গেল। নিজের মুখটা কেমন বোকাটে মার্কা দেখাচ্ছে।

প্রেমে পড়লে পুরুষ মানুষ বোকা বনে যায় আয়নাতেই তার প্রতিফলন। যে স্বপ্ন নিয়ে বেরিয়েছে তা কি তবে অলীক হয়ে যাবে? ভুল ঘোড়ার পেছনে বাজী!

না তেমনটি হতেই পারে না। তপন শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

ঐ দিকে কি হচ্ছে কে জানে। জানাজানি হয়ে গেলে বাড়ীতে যদি প্রবেশ নিষেধ হয়ে যায়? আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আবার উল্টোটাও হতে পারে। নয়নার ঠাকুরমাই হয়ত এগিয়ে এসে বলবে, "নাত জামাই হবে এমন চুরি করে কেন গো জাদু"?

তা যদি হয় হবে সম্মানও বাঁচল স্বপ্নও পূরণ–মধুরতম সমাপ্তি। সবই সম্ভব, আবার জল ঘোলাও হতে পারে।

কোনটা যে হবে কিছুই আন্দাদ করা সম্ভব নয়।

কি ফেরেই না পড়ল তপন।

আদৌ কিছু হবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ। কারণ সমগ্র ব্যাপারটাই তো সঙ্গোপনের চুক্তি, কারও জানার কথা নয়।

অস্থিরভাব কারণে তপন অত সব ভাবছে। শেষটা এখনও বাকি।

এখন কথা হল চুক্তি মত নয়না আসবে তো না চুক্তি লঙ্ঘন।

ঘড়িব কাটা এগিয়ে চলছে। ভাগ্যে কি আছে কে জানে।

বারটা বাজবার আর মাত্র পনর মিনিট, তার মানে নয়নাকে নিয়ে তপনের স্বপ্নের আয়ু আর মাত্র .... ❑

বর্ণচোরা

সব লণ্ড ভণ্ড, তুমুল কাণ্ড, উৎসব পণ্ড।

বাসর ছত্র ভঙ্গ, সানাই স্তব্ধ।

খানিক আগের আলো ঝিলমিল উৎসব আনন্দের কলরবের বাড়ী হয়ে গেল নিরানন্দ পুরী—অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

ব্যাপার কি?

ব্যাপার ঘোরতর।

রায় আর চৌধুরীদের ব্যাপার।

রায়েদের মেয়ে পাত্রী, চৌধুরীদের ছেলে পাত্র। দুই পরিবারই পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু। বর্তমানে শক্তিশালী।

চৌধুরীমশায় রায়বাড়ীর মেয়ে সুমিত্রাকে দেখেই পুত্রবধূ রূপে বরণ করতে বড় আগ্রহী হলেন।

রায়মশায় পাত্রীর বাবা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন—অর্ণবের মত ছেলে হয় না—সুপাত্র। পাত্রপক্ষ চৌধুরীমশায়-এর কোন দাবী নেই। রায়মশায় যেমন দেবেন থোবেন তার উপর কথা নেই। দাবী নেই তা বলে পাত্রীপক্ষও খরচে কৃপনতা করবে না—কারণ একমাত্র মেয়ে—সুপাত্রী।

একদিকে দাবী-দাওয়ার চাপ নেই। অপরদিকে খরচে কৃপনতা নেই।

দু'পক্ষই উদার। ফলে পাকা কথার সময় অনেক খুটিনাটিই তোলা হল না।

পাকা কথা হলো। দিন ধার্য্য হলো! সব ঠিকঠাক।

কিন্তু বিবাহ বাসরেই ব্যাপারটা দাঁড়াল ভিন্নরূপ। ভিন্নতর, ঘোরতর।

ভদ্রতার মুখোশ খান্ খান্।

বিয়ের আসরেই যেন হঠাৎ আচম্বিতে বোমা ফাটল। পাত্রপক্ষ গোত্র বলতে পারে না। গোত্র বলতে কিছু আছে বা থাকতে পারে জানেই না। চৌধুরীর খোলসে ফাটল দেখা দিল—মানে স্বরূপ ধরা পড়ল।

রায়মশায় তক্ষুনি জানলেন পাত্রপক্ষ ভিন্ন সম্প্রদায়ের, ভিন্ন তাদের বর্ণ, ভিন্ন তাদের শ্রেণী। অর্থাৎ এক জাতের নয়।

সুতরাং এ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান হয় না। চেঁচিয়ে উঠলেন রায়মশায়, বন্ধ কর সানাই।

জোচ্চোর, মিথোবাদী, ছোটলোক।

মেয়ের হাত ধরে চিৎকার করতে করতে টেনে হেঁছড়ে আসর থেকে তুলে নিয়ে উঠে গেলেন রায় মহাশয়।

অর্থাৎ অপাত্রে মেয়েকে পাত্রস্থ করার চাইতে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবেন, ছোট জাতে দেবেন না।

লাগল গোলমাল, প্রথমে বাক্‌বিতণ্ডা, তারপরেই হল্লাচিৎকার, ক্রমশ আস্তিন গোটানো। প্রায় মারামারি হবে হবে।

কিন্তু কিছুই হলো না। তার আগেই কে বা কাহারা মেইন সুইচ্ অফ করে দিল। অন্ধকারে ছেয়ে গেল চারিদিক।

এই ফাঁকে যে যেদিকে পারল পালাল।

ইতিমধ্যে পুলিশও এসে গেল।

বর পক্ষ উধাও। পাত্রও বেপাত্তা।

সমূহ কিছু করা গেল না এ আক্ষেপে অনেক খেদোক্তি হলো। এখানে সেখানে জটলা বসল।

বিবাহ উৎসব এমনভাবে পণ্ড হবে কেউ শোনেনি ইতিপূর্বে। জানতই না যে এমন হতে পারে।

এমনটি হবে ভাবতেই পারেনি। সবাই হতভম্ব। বুঝবার উপায় নেই।

ব্রাহ্মন, কায়স্থ. বৈদ্য. ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এখন আর উপাধি দেখে বুঝবার উপায় নেই। বাড়োয়ারি সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিকতার বিভিন্নতাকে হটাবার জন্যে না কৌলিন্যতার উচ্চতর ধাপে ওঠবার প্রয়াসে কোনটা বলা কঠিন। তবে হচ্ছে, হবেও।

দেশ ভাগাভাগির পর থেকে অর্থনৈতিক চাপে অনেক পরিবর্তন এসে গেছে সমাজ ব্যবস্থায়। হুড়মুড় করে দেশ ছেড়ে এসেছে, এত ভেবে তো আসেনি।

কিছু করে খেতে তো হবে। বাঁচতে তো হবে। ভাগাভাগির আগে কি করতাম ওসব ভাবলে চলবে না। নতুন পরিস্থিতির সাথে দরকার হলে পেশাও পাল্টাতে হবে। হয়েছেও তাই।

ব্রাহ্মণ পুরোহিত ঢুকেছে অফিসের পিয়ন বা অর্ডালি হয়ে।

পরমানিক হয়েছে কোয়াক ডাক্তার।

কর্মকার হয়েছে ডিড্‌রাইটার।

তাঁতী হয়েছে সোসাইটির সেক্রেটারী।

ধোপা খুলছে খাবারের দোকান।

হোটেল খুলেছে গনক ঠাকুর।

দালালি করে কুলগুরু।

ভদ্রলোক হয়েছে টাউট।

বাকীরা নানাভাবে নানা ধাঁধায় ঘুরে ঘুরে ধরেছে নানা পেশা, ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের নানা স্তরে। কেউ মেম্বর, কেউ মাস্টার, কেউ সর্দার, কেউ গোসাঁই।

আরও আরও কত কি!

মোটকথা যে যেভাবে কিছু করে খাবার সুযোগ পেয়েছে, তাই আকড়ে ধরেছে।

পেশার সাথে পাল্টে গেল ভোল।

মানে যে পেশার যে রেওয়াজ। একটু ভদ্রস্থ হয়ে না চললে তো চলে না। তাই আগের ডাক ভুলে সমাজও জানল উনি ডাক্তারবাবু ইনি রাইটার বাবু, ইনি সেক্রেটারী বাবু, তিনি গোঁসাই, ঐ দালাল, উনি মাস্টার বাবু।

বর্ডার ক্রশ করবার সময় এমনিতেও রাতারাতি অনেকে পদবি পাল্টাছে।

যারা পারেনি ঐ সময় তারা এফিডেভিট দিয়ে করেছে বদল।

তাই দেবনাথ হয়েছে দেব, ভৌমিক, শর্মা।

ছুতার হয়েছে ধর আগে লিখিত সূত্রধর।

ক্ষৌরকার, কর্মকার, স্বর্ণকার শুধু কর।

নমদাস, ঋষিদাস, শুক্লদাস শুধু দাস।

বিবর্তনে লেখে দাসগুপ্ত পরে হবে শুধু গুপ্ত।

ক্রমশ ঃ

সাহা হয় রায় পরে রায় চৌধুরী।

গোপ হয় ঘোষ বা বোস।

বারোজীবি হয় সেন, মিত্র, দত্ত।

এমনি নানা বিবর্তন বড়ই লক্ষনীয়।

সবাই জাতে উঠতে করে প্রতিযোগিতা। ক্রমশ পদবি হয়ে যায়— রায়, চৌধুরী, ভৌমিক, সরকার, বিশ্বাস, মল্লিক, মুন্সী, বক্সী খাঁ, মোস্তাফি, মজুমদার, তালুকদার, তরফদার, মহলানবীশ, খাসনবীশ, তলাপাত্র ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমন অনেক কিছু।

কে কবে কখন উপাধি পেয়েছিলেন—বিদ্যাভুষন, ন্যায়লঙ্কার, বিদ্যারত্ন, ন্যায়রত্ন হয়েছিলেন নিজগুনে সমাজপতি, ঋষি মনীষি সেই সব উপাধি এখন পদবি হয়ে বহাল হয়েছে উত্তরাধিকার বলে নিগুর্ন মহলে।

তাই এখন আর পদবি দেখে কি জাত, কোন সম্প্রদায় কিছু বুঝে ওঠবার উপায় নেই।

রায়ের মেয়ে চৌধুরীর ছেলে, বিয়ের সব ঠিকঠাক।

কিন্তু মামলা বাঁধল বিয়ের ঠিক শুভ মুহূর্তে আচম্বিতে।

কি করেই বা আগে ভাগে জানবে। কিছু কি জানবার উপায় আছে ঐ রায় চৌধুরী ইত্যাদি পদবি থেকে?

অর্থাৎ শুধু বিত্তবান, ক্ষমতাবান হলেই চলবে না সামাজিকতায় কৌলিন্যতার জৌলুষও পেতে হবে ।

এবং সেই কারণেই তো হঠাৎ সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হয় ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন "সর্বসাধারণের জ্ঞাতব্যের জন্য আমি শ্রী শিবনাথ দাস এই ঘোষণা করছি যে আজ থেকে আমি শিবনাথ দাসের পরিবর্তে শিবনাথ রায় চৌধুরী বলে পরিচিত হবো" ।

একের দেখাদেখি আরও দশজন এবং দশের পরেও সংখ্যা বৃদ্ধি অসংখ্যে । প্রথম প্রথম খটকা লাগে, লাগতে পারে । কিন্তু সে আর বেশীদিন মোটেই নয় এরপরে আর খাটকাও লাগবে না, ধরাও পরবে না, সব একাকার ।

সামাজিকতার বিভিন্নতা ছুটে যাবেই যাবে ।

ঐ সব বর্ণচোরা পদবি দেখে বা শুধু নাম শুনে কেউ পদবিধারীর কি জাত, কি বর্ণ, কি সম্প্রদায় তা আর কেউ সহজে ঠাওর করে উঠতে পারবে না ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়,বৈশ্য না শূদ্র কিছুই বোঝা যাবে না ঐ সব পদবি থেকে ।

সবাই যখন এমন করে কৌলিন্যতার উচ্চতর ধাপে উঠবার প্রয়াসে সচেষ্ট, এমন দিনও আগত প্রায় কেউ আর ওনিয়ে মাথাও ঘামাবে না, কারণ সবাই ততদিনে আত্মীয়তার জগাখিচুড়ি বন্ধনে কমবেশী বর্ণচোরা ☐

পরম্পরা

বিবাহ একটা কঠিন সমস্যা, সামাজিক সমস্যা। দাবী মেটানর সমস্যা, সঙ্গে আরও কত কি অনুষঙ্গ।

পাত্র পক্ষের দাবী, পণ যৌতুক আরও নানা সব সংস্কার মেনে নিয়ে কয়জন গৃহস্থ তাদের অনূঢ়া মেয়ের জন্য সৎপাত্র যোগাড় করতে পারে? অহরহ দেখা যায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কালঘাম ছুটে যাচ্ছে।

কিন্তু এ দায় বড় দায়। অথচ নির্দিষ্ট ছকের মতো পাত্র জোটানোও সহজ সাধ্য নয়। যাও বা জুটল একজন না আছে জীবিকার কোন নির্দিষ্ট সংস্থান, না আছে বাসস্থানের নিশ্চিত আশ্বাস।

এতৎসত্বেও প্রাথমিক আলাপেই পাত্র পক্ষের নানা সব দাবীর প্রস্তাবনা —এ চাই, ও চাই, আবাহ বিবাহের আয়োজন চাই।

আরও কত না কি!

অর্থাৎ কণ্যা সম্প্রদান মানেই খরচ। সামর্থ্য থাকুক আর না থাকুক। এই অসামর্থ্যের দরুণই অনেক বিবাহযোগ্যা পাত্রী অনূঢ়া থেকে যাচ্ছে।

বাঙ্গালীর প্রায় ঘরেই অমন অনূঢ়া অনেক।

যারা তরে যাচ্ছে, কপাল জোরেই যাচ্ছে।

যাদের অর্থ আছে, বিত্ত আছে এবং দাবী মেটাতে সক্ষম তারা ভাগ্যবান, কিন্তু বেশির ভাগ বাঙ্গালীই তো দারিদ্র্য সীমায় আবদ্ধ—নুন আনতে পান্তা শেষ। তারা উপায়হীন।

সচ্ছল বাঙ্গালী কতজন ? অন্ন-বস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থাতেই হিম্‌সিম্। সে কারণেই তো বাঙ্গালী সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা সোচ্চার পণপ্রথা বা যৌতুক ইত্যাদীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রচার। কিন্তু অতসব সোচ্চার ধ্বনি সত্বেও অবস্থা যে-কে সেই।

পণপ্রথার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের মুখে বা লেখার যে সব কথা শুনেছি বা পড়েছি সেগুলু একযোগ করে বাস্তবতার সঙ্গে তুলনা করলে একটা কথাই বলত হয়--অকেজো।

পরিচিত গোষ্ঠীর মধ্যেও গলা ফাটানো বক্তৃতা দেওয়ার ব্যাপারে যতটা উৎসাহ ততটা বাস্তবে মোটেও নয়।

মুখে মুখেই বড় বড় কথা কাজের বেলায় ঢু ঢু।

সত্যি যা দেখা যাচ্ছে সবাই কাগুজে প্রগতিবাদী বিবৃতি সর্বস্ব। যথার্থ সময়ে উদারতার প্রতিফলন নেই। দৃষ্ট হচ্ছে না।

কয়জন বাঙ্গালী পিতামাতা যারা প্রগতির ধ্বজা বয়ে বেড়ায় সঙ্গত ব্যাকরণ মেনে চলছে ? নজীর নেই।

অপর দিকে পাত্রী পক্ষেরও সংস্কার সমর্থনযোগ্য নয়। তাদের অনেককে বলতে শোনা যায়, "মেয়েকে যা তা ভাবে সম্প্রদান করতে বললেই হলো! রীতি নিয়ম অনুসরণ করব না ? নিজেদের সাধ আহ্লাদ নেই ? ওঠ্ ছেম্‌ড়ি তোর বিয়ে বললেই হলো! যে যা বলুক পারিবারিক ঐতিহ্য মেনে যে করেই হোক যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গেই শুভ কার্য সম্পাদন করতে হবে, সে কারণে দরকার হলে ভিটে বাটী বন্ধক রাখব। প্রয়োজনে যদি না খেয়ে আধা খেয়েও থাকতে হয় থাকব, মেয়েকে দিয়ে থুয়েই পাত্রস্থ করব।"

করেও তারা তাই, সামর্থ্যের অতিরিক্ত খরচ। ফলতঃ দেখা যায় একটা মেয়েকে পাত্রস্থ করতে গিয়ে পিতা সর্বস্বান্ত, ঋণগ্রস্ত, দেউলিয়া। বাস্তবের সন্মুখে এক করুণ দৃশ্য, নিজেরই রচিত যন্ত্রনা।

যাদের একাধিক সন্তান তাদের অবস্থা অবর্ণনীয়।

শুধু খেয়ে পড়ে বাঁচার ধান্দায় যারা ব্যতিব্যস্ত তারাও নিছক সামাজিক রীতি পদ্ধতি, লৌকিকতা মেনেই সাধ্যের বাইরে খরচান্ত হয়েই মেয়ের বিবাহ দিতে ব্যাকুল এমনই তাদের সংস্কার।

তথাকথিত শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত মানুষেরাও কি এ ধরণের সংস্কার থেকে নিজেদের মুক্ত করে উদার হয়ে উদাহরণ সৃষ্টি করতে পেরেছে ?

অসাধারণ ভাবে কদাচিৎ দু'একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা যে না ঘটেছে তা নয়। শুধু মাত্র পাত্রী নির্বাচন করে পাত্রপক্ষ পাত্রী উঠিয়ে নিয়ে পুত্রবধূ করে সংসারে মর্যাদার আসনে স্থান দিয়েছে।

কিন্তু তেমন ঘটনা কয়টি ? সে গুলু রীতি নিয়ম বহির্ভূত ঘটনা —একসেপ্‌শন্। হাতের আঙুলেও গণনা চলে না, হিসেব করলে পাঁচ সাত বছরে একটা কি দুটো, শতাংশের হিসাবে পড়ে না। না পড়লেও নিঃসন্দেহে ঐ জাতীয় ব্যতিক্রমমূলক দৃষ্টান্ত অভিনন্দন যোগ্য এবং ধন্যবাদার্হ। কিন্তু বড় আপশোস অমন মানসিকতা সাধারণ মানুষের মধ্যে মোটেও বিস্তার লাভ করল না।

সামাজিক ধরণ ধারণ, ধ্যান ধারণা বা সংস্কার যা শুধুমাত্র পাত্র পক্ষ উদার হলেই চলে না। পাত্রী পক্ষের প্রেস্টীজ্ জ্ঞান টনটনে ঐ সংস্কারকে ঘিরেই। ওটা যে ওদের মণিকোঠায় উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে !

পাল্টানর সাধ্য কি ! বংশ পরম্পরা বলে একটা কথা আছে না। যুক্তি নেই মুক্তিও নেই।

এমন কিছু ঘটনা আমার জানা আছে, অন্ততঃ আমার এক আত্মজনের পাত্রী নির্বাচন ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা তা উল্লেখনীয়।

পরিবারের প্রধান বন্ধু সদৃশ্য গুরুভাই-এর মেয়েকে যোগ্য ছেলের জন্য পাত্রী নির্বাচন করলেন, প্রস্তাবও দিলেন।

গুরুভাইও সাগ্রহে রাজী।

পাত্রের পিতৃদেব শুধু সদবংশজাত পাত্রী চেয়েছেন, কোন দাবী নেই। অতি সত্বর শুভকাজ সম্পাদন করতে আগ্রহী।

গুরুভাই-এর আগ্রহ থাকলেও সময় নেন। বৈশাখ গেল। জ্যৈষ্ঠ গেল। এমনি করে মাসের পর মাস যেতে যেতে বছরও গেল। শেষে পাত্রের পিতৃদেব বুঝে ফেললেন আকাঙ্খিত কনেকে উনি পুত্রবধূ হিসেবে পাবেন না।

যা বুঝলেন ঠিকই বুঝলেন। গুরুভাই-এর এক ঘনিষ্ঠ জন সব পরিষ্কার লিখে জানালেন।

কী জানালেন ?

গুরুভাই-এর আত্মম্ভরিতা। মেয়েকে তো আর যেমন তেমনভাবে সম্প্রদান করতে পারেন না—গুরুভাই সহৃদয় হলে কি হবে! যথাযোগ্য আয়োজন সংগ্রহ করতে সময় নিয়েছিলেন। কিন্তু সময় নিয়েও আনুষঙ্গিক সংগ্রহ করতে পারলেন না এবং পারবেন না বুঝেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মারফত জানিয়ে দিলেন অত উঁচু ঘরে মেয়েকে সম্প্রদান করার ভাগ্য ওনার নেই।

পরিণতি ?

দুর্ভাগ্যজনক। সেই সুপাত্রী অনূঢ়াই থেকে গেল—নির্দিষ্ট ছকের মত ঈশ্বর নামক এক অদৃশ্য শক্তির কাছে সমর্পণ করে এক অসীম শূন্যতা নিয়ে পরিপূর্ণ অর্থহীনভাবে জীবন ধারণ গলগ্রহবৎ-নিয়তি নির্ভর।

সুতরাং একপক্ষের উদারতা থাকলেই চলে না। সংস্কারকে ভেঙ্গে দিতে না পারলে কিছু হবার নয়। সংস্কারই বিরাট প্রতিবন্ধক।

অমন নিয়তির বোঝা ছাড়াতে বিকল্প কী ?

চট্‌জল্‌দি জবাব নেই।

এসব কারণে হঠাৎ হঠাৎ যখন শোনা যায় অমুক মেয়ে অমুক ছেলের প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছে পিতামাতা বা গুরুজনদের অমতে—গান্ধর্ব বিবাহ, আমার খুব খারাপও লাগে না। পরম্পরাগত সংস্কারের প্রতিবন্ধকতার বেড়াজালে

জড়িয়ে সংসারে অনূঢ়া হয়ে থাকার চাইতে অনেক শ্রেয়। অসবর্ণে হলেই বা ক্ষতি কি! পাত্র দায়িত্বপূর্ণ হলেই হল।

অনূঢ়া হয়ে গরীব পিতামাতার সংসারে থেকে গঞ্জনা সহ্য করার চাইতে তেমন কিছু হলে আপত্তির কি কারন থাকতে পারে।

একটা মেয়ের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার চেয়ে প্রেম করে বিয়ে হয়েছে শুনলে আমার ভালই লাগে।

ভাল তো লাগে ঐই বলে ভরসা করে কোন আত্মীয়া বা পরিচিত অনূঢ়া পাত্রীকে "প্রেম করে বাঞ্ছিত কারও সঙ্গে জোট বেঁধে লট্‌কে পড়তে পারিস না?"—এমন উপদেশ থাকাও দুঃসাহসে ভর করে দিতে পারি না।

কারণ? দেয়ার আর ম্যানি স্লিপ্‌স্ বিটউইন্ দ্য কাপ অ্যাণ্ড দ্য লিপ্‌স্।

প্রেমেতে লুকিয়ে থাকে বড় একটা কিন্তু। পরিণতি ভাল হতে পারে খারাপও হতে পারে—প্রবল ঝুঁকি। কার কপালে কি হবে আগাম বলা কঠিন।

আসলে প্রেম আচমকাই হয়, "আমি তোমাকে বিয়ে করব"—এমন পূর্ব-শর্তে প্রেম আসে না। অবৈধ ইচ্ছার তাড়নাতেই হঠাৎ প্রেম হয় তার পর বোঝা যায় কে কতটা বরণীয় বা বর্জনয়ী।

"মেড্ ফর ইচ্ আদার"—ব্রেওদেরও মতিগতি বা খেয়াল খুশিও কহতব্য নয়। বিবাহের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে আমতা আমতা?—হ্যাঁ না এর ভাগাভাগিও পরিষ্কার না—'ঠিক এই মূহুর্তে নয় আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে ইতিমধ্যে নিজেকে একটু গুছিয়ে নেই'। "ভাবছি, দেখব, এখনও ঠিক করিনি। গুরুজনেরা কে কি ভাবে নেবে একটু বুঝে নেই"···ইত্যাদী বিপজ্জনক কথা যার দুটো মানে হয়ঃ এক [illegible] এবং না। কখনও না।

দুই ঃ—প্রেম হয়েছে বলে কি পরিজনদের আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা,
স্নেহ-মমতার বন্ধন ছিন্ন করতে হবে ?

তার মানে সুউচ্চ খোয়াব দেখলেও ক্রমাগত খাবি খেতে খেতে এক সময় মন বিষিয়ে ছাড়াছাড়ি।

প্রেম হল হাইড্ অ্যাণ্ড সিক্ এর ব্যাপার এবং তা শরীর নির্ভর, নানা উঁসিবিসি ফিসিফিসির টিমওয়ার্ক। সেই আলোড়নে ছুৎমার্গ পরিহার করে প্রেমিকের অসংযমী আচরণের উদ্দামতায় প্রেমিকা যদি নিজেকে উজার করে দেয় তবে তো শুধু অসাফল্যের ঘটনাই নয় বড় ধরনের কেলেঙ্কারী—অধিকতর ধিক্কার জনক। ন্যক্কারজনকভাবে সাড়ে সর্বনাশ।

অর্থাৎ প্রেম হল জিন্দাকি কা জুয়া-বড় জটিল গণিত।

যদি অঙ্কে গরমিল হয় ?

সুতরাং এ আলোচনা থাক।

তাহলে বিকল্প চিন্তা কি ? সর্বসম্মত উপায় কি ?

অনেকের মতে পাত্রী নির্বাচিত হলে রেজিস্ট্রি বিবাহ-ই একমাত্র বিকল্প বৈধ-পন্থা বা চ্যালেঞ্জ।

কিন্তু এ-ও কার্যকরী করা সহজ সাধ্য নয়।

কেউ যদি রেজিস্ট্রি মতে শুভ বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে অমনি আত্মীয় পরিজনদের আপত্তি, "তা কি করে হয়! রীতি নিয়ম আছে, আছে সামাজিক
আচার আচরণ, লৌকিকতা, আত্মীয় পরিজনদের আশীর্বাদ
শুভেচ্ছা, এসব বাদ দিয়ে কি করে শুধু মাত্র রেজিস্ট্রি ...."

বাকীটা অনুলেখ্য। অর্থাৎ প্রস্তাব নাকচ।

ওদের বিশ্বাস সনাতন রীতি পদ্ধতি মেনে শ্রী শ্রী প্রজাপতয়ে নমঃ না করে শুধু মাত্র সই-সাবুদে বিবাহ করালে ওটা শুভ পরিণয় হবে না। অর্থাৎ রেজিস্ট্রে-শনে আস্থা নেই। রীতি পদ্ধতি বাদ দিয়ে শুভ বিবাহ হয় না এটাই তাদের বিশ্বাস। অথচ এরাই আবার আধুনিক মনস্ক বলে গর্ব করে। একবিংশ

শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্ব সময়ে পোঁছেও অনেক প্রখ্যাত তক্‌মাধারী ডিগ্রিধারী সোসাইটি সার্কেলের লোকেদের টিপ্পনি হয়, "প্রেমের ব্যাপার হলে না হয় রেজিস্ট্রি ছাড়া গতি নেই। কিন্তু সম্বন্ধবাদ বিবাহের ক্ষেত্রে কেন, রেজিস্ট্রে-শনের কথা আসবে?"

"ষাট্ ষাট্" বলে কন্যা সন্তানের অমঙ্গল বারণার্থ ষষ্ঠীদেবীর নাম উচ্চা-রণের সঙ্গে সম্বন্ধটাই বাতিল। সত্যি বলতে কি এরপরে আর কোন কথা এগোয় না।

দোটানায় যারা তাদের অভিমতে কিছুটা মেনে নেবার প্রবণতা থাকলেও শর্তমূলক। অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশনে আপত্তি নেই তবে তৎসঙ্গে ধর্মবিহিত অনুষ্ঠান তৎসহ মন্ত্রাদি দ্বারা শোধন! লৌকিকতা-আপ্যায়ণ থাকলে আপত্তির কি! কন্যা-সন্তানের ইষ্ট সাধনে তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অত্যাবশ্যক—এমনই অভিগ্রস্ত।

অর্থাৎ আধুনিক মনস্কতার খাতিরে সামান্য পরিবর্তনে অগত্যা করলেও সেই চিরকালীন সংস্কারেরই উক্তি বা প্রতিধ্বনি।

তার মানে আধুনিক মনস্ক হলেও বিবাহের ক্ষেত্রে সংস্কারের সঙ্গে আধুনিক মনস্কতার সমন্বয় নেই।

তা হলে এত যে পণ প্রথার বিরুদ্ধে এত সব তত্ত্ব কথা আন্দোলন বাস্তবে সার্থক প্রয়োগ না হলে সংস্কারের জাঁতাকলে হাজার হাজার কন্যাদায় গ্রস্থ যেসব পরিবার বিপন্নতার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে তা থেকে যদি ওরা উদ্ধারই না পেল অত সব ভারী ভারী তত্ত্ব কথা বলে লাভ কী?

এমনই যদি চলতে থাকে পরিবর্তন আসবে কি ভাবে?

এসব নিয়ে ভাবার বা করার মূল দায়িত্ব নতুন প্রজন্মের তরুণ সম্প্রদায়ের নিশ্চয় আছে। কিন্তু আশ্চর্য, হাই-আই-কিউ-ওয়ালা নব্য যুবকদের বড় একটা অংশ বাহ্যিকভাবে আইডিয়্যালিস্টিক মনে হলেও কাজের বেলায় প্র্যাগ্‌ম্যে-টিক্। নিজেদের জীবনের সুরক্ষাটাই তাদের এক মাত্র বাঞ্ছা। আসল চেহারাটা ধরা পড়ে পাত্রী-নির্বাচনের সময়—পাওনা -গণ্ডার হিসেব। ঐ তো সময় স্কুয়ীজ করার। চক্ষুলজ্জার খাতিরে নিজে না পারলে অন্যকে দিয়ে বলায়।

ওরা মনে করে বিবাহটা আখের গোছানোর সুযোগ। তাই নিজ স্বার্থে পণ নিতে আপত্তি তো করেই না অধিকন্তু কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মাতাকে নিংড়ে নিজেদের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যের আধুনিকতম প্রকরণে সাজিয়ে তোলাটাই তাদের একমাত্র কাম্য-এটাই আত্মোন্নকামী নির্লজ্জ অর্থগৃধ্নু।

ঘরে বিবাহযোগ্যা পাত্রী থাকলে এমনিতেই পাত্রীপক্ষ হীনমন্যতায় ভোগে। অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে যথাসাধ্য দাবীও মেটায়। উপযুক্ত পাত্র বিচারে সম্প্রদানও করে তবুও পাত্রীর পিতামাতা ভয়ে ভয়ে থাকে আবার কি দাবী হবে কে জানে!

সম্প্রদানের পরেও এটা দেওয়া হয়নি, ওটা দিলে ভাল হতো —এ জাতীয় আব্দার নিয়ে কত না মন কষাকষি, চাপ অত্যাচার-নির্যাতনের ঘটনা-অনিবার্য পরিণতি হয় ডাইভোর্স, নয়ত হত্যা বা আত্মহত্যা বিয়োগান্ত নানা সব দুর্ভাগ্য-জনক ঘটনা, লিখতে গেলে শেষ নেই।

সুতরাং ওসব উল্লেখ নিস্প্রয়োজন।

তারিফ যোগ্য কি কেউ নেই? কেন থাকবে না! তবে বিরল ব্যতিক্রম—পরিসংখ্যানে আসে না। পরম্পরাগত রেওয়াজ যখন আছে এই তো সময় যা নেই তা আদায় করার। বিবাহটাই যেন তাদের কাছে বিজনেস্ কণ্ট্রাক্ট।

অষ্টম শ্রেনী-পর্যন্ত পড়েছে কি পড়েনি। একজন পিয়ন বা আর্ডালীর যে মানসিকতা তেমনই মানসিকতা গাদা গাদা বই পড়ুয়া ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, উকিল, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক প্রশাসকদের। যেসব জিনিস দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে প্রয়োজন এবং আছেও তবু চাই বিবাহের সময়ে আরেক প্রস্থ—অধিকন্তু নঃ দোষায়।

পাওনা-গণ্ডার হিসেবের তোয়াক্কা না করে পানি গ্রহণে ইচ্ছা থাকলেও স্বউদ্যোগে কার্যকরী করারও উপায় নেই।

ঘনিষ্ঠ নয়, প্রত্যক্ষ পরিচিত জনৈক যুবকের অভিজ্ঞতা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে।

ধরা যাক তার নাম সুগোপাল। মেধা তার যেমনই হউক, কথাবার্তায় মার প্যাঁচ নেই। ব্যক্তিত্বের কাঠামো বড় শক্ত এবং অনমনীয় এবং একটু জেদী

একগুয়ে টাইপের। তার জীবন ধারার মূল তত্ত্ব হলো ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর ভোগের দ্বারা নয় এবং লোভ করো না—কখনও না—নেভার। এন্তার টাকা থাকলে সৎকাজে ব্যয় কর, দান ধর্ম কর। সাধ্যমত অপরের সাহায্য কর।

পাত্র হিসাবে সে মোটেও অগ্রাহ্যের নয়। তার অবয়র, নাক, দাঁত, চোখ, ফিগার হয়ত একেবারে নিখুঁত নয় কিন্তু সব মিলিয়ে সে অত খুঁত খুঁতেও নয়। বন্ধু বান্ধবদের সাথে কোথায়ও গেছে তো মেয়েদের নজর তার দিকেই পড়েছে তবু তার বিবাহ হয়নি যথা সময়ে, কারণ তার যে বিবাহের বয়স হয়েছে একথাটা বিবেচনা করার কেউ কাছে পিঠেও ছিলনা অথবা যারা ছিল তারা আত্মকেন্দ্রিক কিংবা নিজ নিজ সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত এক কথায় তার কেউ নেই। যারা আছে তারও তার কেউ না। নিজেই নিজের পরিচয়।

সুতরাং আত্ম প্রবঞ্চনার ছাপ স্পষ্ট হবার আগেই সুগোপাল নিজেই সচেষ্ট হল পাত্রী নির্বাচনে। বিবাহ তার প্রয়োজন এবং বিবাহ সে করবেই তবে তদ্দরুণ নো বেপারোয়া খরচ, না তার, না কনে পক্ষের।

খচরটাই তো বিবাহের ব্যাপারে একটা বিরাট সমস্যা! এবং এ কারণেই তো যোগ্য পাত্রীর যোগ্য বর জুটছে না। সুগোপাল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে চায় কত সহজ ও অল্প খরচে শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হতে পারে।

শুভ-পরিনয়নে বর কনের মঙ্গলা-মঙ্গলই যদি আকাঙ্ক্ষিত অভিলাষ হয় তবে কেন খরচ প্রতিবন্ধক হবে? আশীর্বাদই যথেষ্ট এবং তা ধান দুর্বায়। সবাই দেখে শিখুক এবং অমনটি করুক। তবেই পরম্পরাগত ঐতিহ্যের শেকড় ছিড়বে।

পাত্রী নির্বাচনান্তে সুগোপালের একটা মাত্রই শর্ত বা প্রতিজ্ঞা একটা বাক্যে "নো-খরচ, নো যৌতুক—রেজিস্ট্রি বিবাহ।'

পাত্রী পক্ষের অবস্থা স্বচ্ছল না হলেও কিছু খরচ করতে প্রস্তুত কিন্তু সুগোপালের একরোখা শর্তে অগত্যা রাজী-রেজিস্ট্রি প্রথায়। পাকা কথা হয়ে গেল, তারিখও নির্ধারিত। শেষাংশটা সুগোপালের জবানিতেই শোনা যাকঃ-

"আমার অমন ধারা একগুঁয়েমির শর্তে আমার স্বজনদেরা কেউ কেউ ধরে নিয়েছিল আমি একটা ক্রিস্ট্যালাইজ্ ইডিয়ট্ কিংবা মাথা খারাপ টাইপের স্যাম্পেল। কারও কারও মন্তব্য হয়েছে অমন শিভাল্‌রি দেখাবার কোন অর্থ নেই, বোকারা ছাড়া অমন একগুঁয়ে কেউ হয় না. আবার কেউ মন্তব্য ছুড়েছে অযথা আদর্শের বাগাড়াম্বর! টের পাবে বিবাহের পরে কত ধানে কত চাল! কেউ হুল্ ছুড়েছে এমন সব বাক্যে যেন আমার বয়সই হয়েছে বুদ্ধি পাকেনি—অ্যাডলেসেন্ট বাহাদুরি।"

"আমি কিন্তু অত সব খোঁচা মারা কথায়ও অটল। কিন্তু আমার অটলতায় ফাটল ধরে গেল নির্দিষ্ট দিনের চব্বিশ ঘণ্টা আগে হঠাৎ টেলিফোনে জরুরী ডাক আমার এক অগ্রজের যিনি ভক্তিতে, শ্রদ্ধায়, ভালবাসায়, সহৃদয়তায় দায়িত্বশীলতায় আমার মনে এক বিশাল স্থান দখল করে আছেন. যদিও ওনার কর্মস্থল থেকে আমার কর্মস্থল বহু যোজন দূরে কিন্তু মানসিক ভাবে উনি আমার কাছের মানুষই ছিলেন বাস্তুহারা হবার আগে।"

"কি করে উনি খবর পেলেন আমি বিবাহ করতে যাচ্ছি, শুনেই উনি ছুটে এলেন কলকাতায় এবং গাড়ী থেকে নেমেই টেলিফোনে জরুরী তলব ট্যাক্সিতে বসে থেকেই ছয়ফুট লম্বা অগ্রজকে দেখতে পেলাম লোকের ভীড়ে দাঁড়িয়ে, উদগ্রীব অপেক্ষমান যেন এক অন্য মানুষ, বয়স বেড়েছে চুলও কাঁচা পাকা, চোখে চশমা, দৃষ্টিতে দুশ্চিন্তার ছাপ সব মিলিয়ে সুপুরুষ ব্যক্তিত্বের চেহারাটাই পাল্টে গেছে যেন এক পীড়িত ব্যক্তিত্ব।"

"সামনে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতেই অগ্রজের প্রথম কথাঃ তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস খুব ভাল কথা, তোর কোন দাবী নেই আরও ভাল। কিন্তু রেজিস্ট্রি কেন? সাধাসিদে ভাবে আনুষ্ঠানিক শাস্ত্র বিধি সম্মত বিয়ে করতে আপত্তি করছিস্ কেন? লোকে কি ভাববে? আমাদের মেয়েদেরও তো বিয়ে দিতে হবে! তুই ভেবে দেখ··· দেখবি না?"

"অগ্রজের কণ্ঠস্বরে সকরুণ প্রার্থণা, যেন ঘাবড়ে গেছেন উৎকণ্ঠিত, যেন আমি রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করলে ওনার মেয়েদের বিবাহের সম্বন্ধ বাদই এগোবে না, এগোলেও অনেক জটিলতা সৃষ্টি হবে! তাই দুশ্চিন্তায় তড়ি ঘড়ি করে এসেছেন হাই প্রেসার টেন্‌শন নিয়ে আমার গো ফেরাতে। কর্তব্যের কী তাগিদ! বিস্ময়কর যার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না।"

"এক কালের দীর্ঘদেহী সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রাণবন্ত সেই অগ্রজের স্বাস্থ্যের অবনতি, উদ্বেগজনিত সকরুণ চাহনী লক্ষ করে আমার মনের মধ্যে দ্বৈতশাসন কী বলি, কী করি। ওনার আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা প্রীতির বন্ধন স্নেহ মমতা অবহেলা করি কি করে! বুঝে ফেললাম আমার জেদের মাত্রা সীমাবদ্ধ। অগ্রজকে অবজ্ঞা করার আমার সাহসই হলো না। ওনার সকরুণ চাহনীর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেই ফেললাম। এবং আল্‌টিমেট্‌লি ওনার নির্দেশ মত রেজিস্ট্রির পরিবর্তে অতি অনাড়ম্বর ভাবে অন্য সব শর্ত মেনে যথা সাধ্য কম খরচে শুভ বিবাহ সম্পাদিত হল, ওঁ নমঃ নমঃ রীতিতে-কোন প্রকারে?"

সুগোপাল যা করল তা-ও যদি আজকের যুবকরা করে দেখায় কিছু সুফল তো নিশ্চয় আসবে।

দেশ ভাগের সময় যেসব মেয়ে বলপূর্বক অপহৃত, নির্যাতীত হয়েছিল এবং পরে উদ্ধার হয়েছিল আর্য সমাজের সক্রিয় উদ্যোগে-আহ্বানে তরুণ সমাজ সাড়াও দিয়েছিল স্পষ্টতর ভাবে। তৎকালীন তরুণদের আচরণে সারা দেশ শ্লাঘা অনুভব করেছে। সে এক অনন্য ব্যাপার—"সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—তারই প্রত্যক্ষ প্রকাশ।

সে এক অত্যুজ্জ্বল মানবিক ঘটনা—আবেগপূর্ণ আগ্রহ উদ্দীপনা। সময়ের তালে মহৎ দৃষ্টান্ত। দাবী-দাওয়ার কথা ভুলে পছন্দ মত একজনকে বেছে নিয়ে যারা সংসার পেতেছে তার জন্য কেউ অনুশোচনা করেছে বলে শোনা যায়নি।

প্রায় অর্ধশতাব্দী হয়ে গেল। অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত ভাবে কিছু বিকাশ সাধন হলেও বিবাহ শাদি ব্যাপারে সমাজ সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অতীত প্রথারই অনুসারী, সময়ের তালে মিলছে না। সব সুচেষ্টাই, সমাজের এক কোণে পড়ে রয়েছে অথচ সবাই দাবী করে—কেউ কূপমণ্ডূক না। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ধর্ম সংস্কৃতি কৃষ্টি দর্শনের বিভিন্ন দিকগুলু মিলে মিশে সৃষ্টি হতে চলেছে অদ্ভুত এক সিন্থেটিক্ ভাবধারা।

বিবাহটাই যেন দৌলতের প্রচার—আর্থিক দরকষাকষির দেখনেপনা।

এ ধারা যদি অব্যাহত থাকে তা হলে নতুন শতাব্দীতে কি নিয়ে প্রবেশ করব? এটাই একটা বিশাল প্রশ্ন।

এ সমস্যা সমাধানে ধর্ম বিহিত অনুষ্ঠানকে বাতিল করার কথা বলছি না, দাবী-দাওরাটা কাট্ছাট্ করলেই তো চলবে বিবাহের পূর্বশর্তে দাবী-দাওয়ার বোঝা চাপিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ীকে দুস্থতায় ঠেলে দিয়ে কয়জন সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করছে?

সংসারে বিবাহের স্থায়ীত্বই আসল, না ব্যবসা কোনটা দামী?

এমন অভিচারী প্রক্রিয়ার প্রশ্রয় দিলে মানবিক সম্পর্কের আকালই দেখা দেবে পরিবারে পরিবারে।

পরিত্রানের উপায় কি ?

ইচ্ছা ও আদর্শের জোর থাকলে সবই সম্ভব।

একটা অভিনব রীসেন্ট্ যুগান্তকারী ঘটনা উল্লেখনীয় ঃ—

নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তা মাদার টেরিজার ৮৫তম জন্মদিনে হঠাৎই এক তরুণ তরুণী মাদারের কাছে গিয়ে হাজির হয়ে ওনার হাতে নগদ দশ হাজার টাকা তুলে দিল।

মাদার প্রশ্ন করলেন, "দেখে তো মনে হয় তোমরা বড় লোক নও, এতগুলো টাকা আমায় দিচ্ছ কেন ?"

তরুণীটি প্রণাম করে বলল, "আমরা সদ্য বিয়ে করেছি, বিয়েতে আমি আমার মা-বাবার কাছ থেকে কিছুই নিইনি। গয়নাগাটি তো দুরের কথা, একটা নতুন শাড়িও নয়। দেখুন আমার কানে দুল নেই, হাতে চুড়ি মাত্র একটি। আমার স্বামীর একই অবস্থা। তবে উপার্জনের দশ হাজার টাকা আমরা জমিয়েছি। বিয়ে উপলক্ষটাকে স্মরণীয় করে রাখতে সেই টাকাটাই আজ আপনার হাতে তুলে দিলাম।"

নতুন দিশার প্রবর্তক এই দম্পতি মহৎ দৃষ্টান্ত।

মানবিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে এটা একটা প্রেরণা হতে পারে। গোটা তরুণ সমাজ এর থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে তবেই তারা নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করবার যথার্থ অধিকার অর্জন করবে।

প্রত্যেক তরুণ তরুণীর মধ্যে এমন ইচ্ছা এবং আদর্শের জোর দেখতে ইচ্ছা করে তবেই এই চলছে চলবের পরম্পরা বদল হবে ☐

ঠেকে শেখা

দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ ঘটনা দিয়েই সুরু করছি।

ট্রাম চড়ে বালিগঞ্জ থেকে এস্প্লেনেডে আসছি। ভীষণ ভীড় এই ভীড়ের মধ্যেই কত লোক নামল, কত লোক উঠল, নামল আর উঠল। পথে পথে এই স্টপে সেই স্টপে। কনডাক্টর সেই যে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়েই রইল। আশে পাশে দু'একজন ছাড়া কারও কাছে টিকিট চাইতেই পারল না, প্যাসেঞ্জের মধ্যেও যাত্রী।

শেষে একসময় ট্রাম এসপ্লেনেডে এসে থামল, যাত্রীরা সবাই হুড়মুড় করে নেমে যে যার পথে চলে গেল।

কেউ টিকিট কাটল না, কনডাক্টরও চাইল না।

ভীড়ের শেষে আমিও নামলাম।

কনডাক্টর নীচেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বালিগঞ্জ থেকে এসপ্লেনেড পর্যন্ত আসতে তো দেখলাম অনেকেই টিকিট কাটল না। ভীড়ের দরুন কনডাক্টরও দাম আদায় করতে পারল না।

কিন্তু এখন তো আর ভীড় নেই আমি নেমেই পকেট থেকে পয়সা বের করে কনডাক্টরকে পয়সা দিতে গেলাম: পয়সা না দিয়ে অমন করে সরে পড়াটা কেমন যেন লাগল।

কনডাক্টর আমার পয়সা দেওয়া দেখে এমন ভাবে তাকাল যার অর্থ মুখ খুলে বললে বোঝায় :—

"দেখলেন তো নিজের চোখেই ওদের মত চলে গেলেই তো পারতেন। তা একান্তই যখন আপনি না দিয়ে ছাড়বেন না তখন দিন।'

এমন গাড়িমসির ভঙ্গীতে হাতটা পাতল কনডাক্টর যেন অতি অনিচ্ছা সত্বেই পয়সা নিচ্ছে।

আমি পয়সা দিলাম, কিন্তু মনে হলো কনডাক্টার যেন মনে মনে আমাকে "মূর্খ" "অপদার্থ" বলে গালিগালাজ দিতে দিতে পয়সা গুলো নিল।

যারা আমার এই পয়সা দেওয়াটা লক্ষ্য করল তাদের চাহনী আরও মারাত্মক যেন। নির্বাক হলেও ভাষাময় ঠোঁট বেঁকানি। ওরা যেন টিপ্পনি দিয়ে বলতে চাইছে,—ভদ্রলোকের দেখছি অনেষ্টির ভ্যানিটি আছে। আরে মশাই অমন ভ্যানিটির কি কোন বাস্তব মূল্য আছে ? শুধু শুধু হাস্যস্পদ হলেন ! বোকারাই এমন হয়। এমন অবস্থায় পয়সা না দিয়ে চুপ-চাপ চলে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বুঝলেন !

ওরা যদি মুখ খুলে কিছু বলত তাহলে একবার দেখে নিতাম। কিন্তু ওরা যে নির্বাক, সুতরাং বোবা রাগ নিয়ে মনে মনে নিজের বিবেকের উপরই ঘুষি মারলাম।

বুঝলাম আমার সততার আভিজাত্য বোধটাই ওদের চোখে হাস্যস্পদ ঠেকেছে তাই না আমি পরিহাসের পাত্র হলাম।

অর্থাৎ *Strict sense of honesty* নিয়ে চলবার উপায় নেই। লোকেরা হাসে, টিটকারি দেয়, ভাবে ভঙ্গীতে বোঝায় দশজনকে দেখেও শিখলেন না ! এত অপদার্থ আপনি ! 'হাসালেন মশাই, হাসালেন।"

অদ্ভুত ! অদ্ভুত !

স্নায়ু শিরা গরম হয়ে উঠতে চায় অমন দৃষ্টি ভঙ্গী দেখলে, বিতৃষ্ণায় ভরে যায় মন।

এমনি বারে বারে। নানা ভাবে।

এই তো সেদিন হাস্যাস্পদ হলাম যাদবপুর থেকে শেয়ালদা আসতে।

যাদবপুর যক্ষা হাসপাতালে আমার এক আত্মীয়কে দেখে ফেরার পথে বাস ষ্টপেজে অপেক্ষা করছি হঠাৎ রেলগাড়ীর শব্দ কানে আসতেই ভাবলাম রেলেই চলে যাই, অনেক সময় বাঁচবে। তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকারও।

গাড়ী হুইসেল দিতে দিতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। আমিও তাড়ঘড়ি করে কাউন্টারে পয়সা দিয়ে বুকিং ক্লার্ক ভদ্রলোককে বললাম "আমাকে একখানা শেয়ালদহের টিকিট দিন তো।"

বুকিং ক্লার্ক ভদ্রলোক টিকিট না দিয়ে পয়সাগুলো না নিয়েই বলেন, "প্ল্যাটফর্মে গাড়ী ঢুকে গেলে টিকিট দেবার নিয়ম নেই।"

নিয়ম তো নাই বুঝলাম কিন্তু আমি যাব কি করে? মাত্র দুদিন আগে রেলের বিজ্ঞপ্তি দেখেছি। বিজ্ঞপ্তিটা এই রকম ঃ—"বিনা টিকিটের যাত্রীকে এখন থেকে আরও বেশী জরিমানা দিতে হবে।"

মূলকথা ঃ— যদি কোন যাত্রী বিনা টিকিটে রেলে চাপেন তবে আদালত ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে। সবচেয়ে কম জরিমানা হলো ১০ টাকা।

সুতরাং টিকিট না কাটতে পারলে রেলে না চাপাই ভাল।

আমি ইতস্তত করছি দেখে বুকিং ক্লার্ক পরামর্শ দিলেন "চলে যান এমনি। শেয়ালদা গেইটে জিজ্ঞেস করলে বললেন যাদবপুর থেকে উঠেছেন। সত্য কথা বললে কিছু বলবে না।"

এদিকে ট্রেন প্রায় ছাড়ে। অত ভাবতে গেলে মিস্-ই হবে, তাৎক্ষণিক ভাবনার "সত্যি কথা বললে কি আর টিকিট চেকার আমাকে বিশ্বাস করবেন না?"

আমি চলতি ট্রেনেই লাফিয়ে উঠলাম একটা কামড়ায়।

কিন্তু বিশ্বাস না ছাই! ব্যাপার ঘটল বিপরীত ইচ্ছা করলে আমি ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের মত *monthly* আছে ভঙ্গীতে শেয়ালদা গেইট পার হয়ে যেতে পারতাম।

অনেকে অমন করে আমায় জানা আছে। শুনেছি, দেখেছিও।

কিন্তু আমার স্বভাব যে অন্য ধাঁচের। আমি পারলাম না তা করতে। পারলাম না বলেই আমি গেইটে দাঁড়ান কালো কোট পরা চেকারকে বললাম সত্যি কথা, "টিকিটটা করতে পারিনি, যাদবপুর থেকে উঠেছি," যেই না বলা অমনি চেকার ভদ্রলোক এমনভাবে হাত দিয়ে আমাকে একপাশে দাঁড় করালেন বুঝি এক বিনা টিকিটধারি আসামী ধরা পড়ল।

ঐ দেখে যাত্রীরা গেইট পেরিয়ে যেতে যেতে আমার দিকে এমনভাবে নজর ফেলে গেল যার অর্থ দাঁড়ায়, "কাপড়ে চোপড়ে তো ভদ্রলোক তবু বিনা টিকিটে রেল চড়েন! দিনে দিনে দেশটা কি হচ্ছে! অথচ ওদের এক এক করে চ্যালেঞ্জ করলে দেখা যেত অনেকেরই মান্থলি নেই, অনেকেই বিনা টিকিটধারি। কিন্তু যে ধরা পড়ে সে পড়েই।

কারও কারও দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা আরও মারাত্মক। সেই ট্রামের ব্যাপারে যা দেখেছি অমন। অর্থাৎ "ঘাড় নেড়ে সরে পড়তে পারলেন না? বোকার মত ধরা পড়লেন কেন?"

ওদের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় আমার লজ্জায় মাথা কাটা যাবার ব্যাপার।

বড়ই দুর্বল ভাবতে লাগলাম নিজেকে। যাত্রীদের চলাচল শেষ হতেই চেকার ভদ্রলোক কি একটা হিসেব করে কোটের পকেট থেকে রসিদ বই পেন্সিল বের করতে করতে বললেন, "আপনাকে ক্যানিং থেকে ভাড়া আর জরিমানা দিতে হবে?"

তার মানে? ভঙ্গীতে হতবাক হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলতে গেলাম, "বিশ্বাস করুন, আমি তো"...আর বলতে হলো না, মাঝ পথেই ধমকে থামিয়ে বলে উঠলেন, "অমন অনেকেই বিশ্বাস করতে বলে, ধরা পড়লেই সবাই বলে থাকে, দিন বের করুন ভাড়া আর জরিমানা।"

বলতে বলতে রসিদ বইতে কার্বন ঠিক করতে লাগলেন। রসিদ দিতে হবে তো।

ততক্ষণে আমার মাথায় রক্ত চড়তে সুরু করেছে। এতক্ষণ ধরে তো দেখলাম চেকার ভদ্রলোকের কাণ্ডটা, কৈ, কাউকে তিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন "টিকিট দেখান" বলে ?

স্বইচ্ছায় যারা টিকিট দিয়ে গেছেন তাদের গুলিই উনি কলেক্ট করেছেন, নিজে থেকে একজনকেও চেলেঞ্জ করেননি।

আমি স্বইচ্ছায় সত্য কথা বলতে গেলাম বলেই না এমন বিপত্তি।

ততক্ষণে বেশ কিছু লোক জমায়েত হয়েছে আমাদের ঘিরে। মজা দেখছে ধরা পড়া বিনা টিকেট যাত্রীর।

প্রায় পনর মিনিট ধরে সৌকি কথা কাটাকাটি। ধমক পাল্টা ধমক।

টিকিট চেকার ভদ্রলোক কিছুতেই আমার সত্যভাষণ বিশ্বাস করবেন না। বিশ্বাস করবেন না বলেই কিছুতেই আমার কাছ থেকে জরিমানা সহ ক্যানিং থেকে শিয়ালদ'র টিকিটের দাম না নিয়ে ছাড়বেন না আমাকে।

আমিও নাছোড়। দেবনা অতিরিক্ত একটি পয়সাও।

রক্ত জল করা পয়সা, প্রয়োজন হলে সত্যভাষণের জন্য একমাস জেল খাটব, তবু অন্যায় ভাবে জরিমানা দেবনা।

জেল অনেক খেটেছি। দেশোদ্ধারের কাজে যোগ দিয়ে কি কম দিন কয়েদ জীবন কাটিয়েছি ? ওসবে ভয় পাই না।

চেকারের চাপ যত বাড়তে লাগল আমার সংকল্পও তত অটুট হলো। এক চুলও এদিক সেদিক না। আমার বুনো গো।

এদিকে উনিও ভাড়া আর জরিমানা আদায় না করে ছাড়বেন না আমাকে।

আমি ন্যায্য ভাড়া দিতে প্রস্তুত।

কিন্তু জরিমানাও চান উনি।

কাণ্ট হেল্পের ভঙ্গি ওনার।

ইতিমধ্যে জমায়েতের গলায় অস্ফুট আওয়াজ বেরোতে লাগল। মৃদু থেকে সরব আওয়াজ।

সে আওয়াজ আমার পক্ষে! মানে ছেড়ে দিন! ছেড়ে দিন মশায়। ছোড় দিজিয়ে চেকার সাব।

টিকিটে চেকার অভিজ্ঞ লোক, এ জমায়েতকে উনি চেনেন, গলার আওয়াজও বোঝেন।

বোঝেন বলেই কাণ্ট হেল্পের ভঙ্গী সরে গেল, এই নাছোড়কে নিয়ে কি ই বা করবেন! বিশেষ জমায়েত যখন ওনার বিপক্ষে!

অভিজ্ঞ বিচারকের মত শেষে রায় দিলেন, "যান যান সরে পড়ুন আপনাকে কিছু দিতে হবে না। যান এখানে আর ভীড় বাড়াবেন না।"

রায় দিতে দিতে উনি রসিদ বই আর পেন্সিল পুনরায় পকেটস্থ করেন।

অমন দয়ায় আমি সরি না। নায্য ভাড়া দিতে আমি প্রস্তুত, দয়ার প্রার্থী তো আমি নই! অনুকম্পা তো চাই না! "নিন রসিদ কাটুন নায্য ভাড়া নিন।"

কিন্তু বিচারক চেকার মহোদয়ের সেই কাণ্ট হেল্পের ভঙ্গী। মানে ভাড়া দিতে হলে জরিমানাও দিতে হবে। তা না হলে কিছুই নেওয়া যাবে না। ওটা নাকি আইনে পড়ে না।

এবার আমি যত চাপ দেই উনি ততই হতভম্ভ।

কি লোকের পাল্লায় পড়েছি রে বাবা!

ইতিমধ্যে জমায়েত সরে গেছে।

ওটা লক্ষ্য করেই হাত পেতে নিলেন ভাড়াটা।

নিয়েই পা বাড়ালেন পয়সাগুলো নিজের পকেটস্থ করে। কিন্তু রসিদ? রসিদ দিন! আচ্ছা মুস্কিল তো!

মুস্কিল আসান পেতে উনি আমাকে বলেছে।, ভাড়া দিচ্ছেন বলেই নিয়েছি, রসিদ দেওয়া যাবে না। তার চেয়ে বরং চলুন ওটা চায়ের দোকানে খরচ করি।

যে লোক আমাকে বিশ্বাস করল না, আইন দেখিয়ে চাপ দিতে পারে অথচ

বে-আইনী চা খেতে এতটুকু বাধে না সে লোকের সাথে আমি চা খাব ? অসম্ভব।

সত্য ভাষণের উপর যার বিশ্বাস করার ক্ষমতা নেই ন্যায্য কাজ করবার সাহস নেই তার অন্যায় কাজের সহায়ক হব অসম্ভব। অন্তত আমি না।

তার চাইতে ঐ পয়সাগুলো ওর পকেট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কোন ভিখিরীকে দিয়ে দেব।

"দিন বের করুন পয়সা, ফেরত দিন ভাড়া" শেষ পর্যন্ত কি হতো বলা মুস্কিল, পরিচিত আর এক ভদ্রলোক টিকিট চেকার 'কি হয়েছে কি হয়েছে ?' বলে দৃশ্যে অবতীর্ণ হলেন।

সেই উনিই মধ্যস্থতা করে পয়সাগুলো আমার হাতে ফেরৎ দিয়ে আমাকে শান্ত করতে গেইটের বাইরে নিয়ে এলেন।

বাইরে এসেই প্রথম নজরে যে ভিখিরীকে দেখলাম তার টিনের বাক্সে ফেলে দিলাম ভাড়ার পয়সাগুলো।

তা এসব তো করেছি যখন গায়ে শক্তি ছিল। শক্তি ছিল বলে মনেতে জোরও ছিল।

অন্যায় কাজও করিনি অন্যায় কাজে প্রশ্রয়ও দেইনি।

কিন্তু ক্রমে যে দুর্বল হয়ে পড়ছি নানা কিছু দেখে শুনে। অর্থাৎ ভদ্রলোক হয়ে গেছি, অর্থাৎ অন্যায় ব্যাপার অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা বেড়েছে, সত্যি সত্যি দুর্বল যে হয়েছি, শক্তি যে গেছে টের পেলাম সেদিন একটা পাজি ছোকড়াকে সায়েস্তা করতে গিয়ে।

আচম্বিতেই ব্যাপারটা বোধগম্য হলো যেন। যাচ্ছিলাম বাসে করে।

বাসের গায়ে বড় বড় হরফে লেখা, "ধূমপান নিষিদ্ধ" "আইনত দণ্ডনীয়।" ইংরেজীতে "*No Smoking*" কিন্তু চালক নিজেই ধূমপান করছে। সাব্যস্তের লোকও দু'চারজন সিগারেট টানছে।

বুঝে উঠতে পারছি না অমন লেখার অর্থ কি ? যারা সিগারেট টানছে তাদের খোঁচা দিয়ে বলতে ইচ্ছা করছিল, আরে মশায়রা চোখের মাথাটি খেয়ে বসে আছেন ? দেখছেন না কি লেখা রয়েছে ?

ঠিক সময় ঠিক কথাটা বলে ফেলাইতো ঠিক।

বলব বলব করে আর বলা হলো না।

ইতিপূর্বে অনেক অভিজ্ঞতাই তো হয়েছে। সে কারণে মনেতে আড়ষ্টতা জমে গেছে।

ইতিমধ্যে দেখাদেখি পাশের একটি ছোকড়া সিগারেট ধরিয়ে নাকের উপর ধোঁয়া ছাড়তে লাগল, বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে গেল।

হাঁটুর বয়সী ছেলে ছোকড়া সেও কিনা অমন বেয়াদপী করে চোখের উপর।

গা-সওয়া ভাবেই বেয়াদপীটা সহ্য করতে বাইরের দৃশ্যে মন সংযোগ করলাম নিষ্ক্রিয় ভঙ্গীতে।

কিন্তু মন-সংযোগ করবার উপায় আছে! কি তড়বড়ে স্বভাবের ছোকড়ারে বাবা!

ছাই ফেলতে গিয়ে দিয়েছে আমার হাতে জ্বলন্ত সিগারেটের স্যাকা, অথচ এতটুকু ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত করল না।

স্বভাবতই আরও এক ডিগ্রী উত্যক্ত হলো মনটা। আর নিষ্ক্রিয় থাকা অসম্ভব, অসহ্য।

তবু নিজের মনকে প্রবোধ দেওয়ার অস্থির চেষ্টা করলাম কিন্তু সজাগ মনের অস্তিত্ব নিয়ে অন্যায় অশোভন আচরণের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাথা স্থির রাখা যে অসম্ভব, বয়স হলেও রক্ত যে ঠাণ্ডা হয়নি। রক্তের সহজাত গতি চেপে রাখা যে দুঃসাধ্য।

সেই গতিতে একটা বিরাশি দশ আনার থাপ্পর পাকিয়ে যেই না হাতটা উঠাতে গেলাম অমনি টের পেলাম আমি শেষ হয়ে গেছি।

উঃ! কি যন্ত্রনা! কি যন্ত্রনা! ধর, ধর, ধর, সে এক জ্ঞানহারা বিপর্যয়। শনির দশা, হুস গেল হারিয়ে। যমের মুখে ছাই দিয়ে চোখ খুলতেই প্রথমে দেখলাম সেই পাজিটাকে।

যাকে থাপ্পর দিতে গিয়ে এমন বিপর্যয় সেই কিনা আমার মাথায় হাওয়া দিচ্ছে। মালিস করছে হাতটা।

স্পষ্ট পরিহাস আর কি হতে পারে ?

ছোকড়ার চোখে মুখে তরল প্রশ্ন, "আরে দাদু এই দুর্বল শরীর নিয়ে এই বয়সেও আপনি এমন মেজাজ দেখান ?"

ঠোঁটের কোণে একটুকরো অনুকম্পার হাসি। ঐ হাসি দেখে ডাক্তারের কাছে না গিয়েও প্রেস্‌ক্রিপশন পেয়ে গেলাম অর্থাৎ মেজাজ ঠাণ্ডা করে না চললে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাবে। আর বৃদ্ধি পেলেই জীবনের শেষ অঙ্ক অবধারিত। এই প্রথম অঙ্কই যে শেষ পরিণতির ইঙ্গিত দিল।

সুতরাং হুঁশিয়ার।

এই হুঁশিয়ারি মন নিয়েই এখন আমি আমার মেজাজের ভাবসাম্যতা রক্ষা করতে সচেস্ট থাকি। দেখেশুনে, না দেখার ভান করি আত্মসংযম যত না করি তার চাইতে বেশী দেখাই উপেক্ষা অথবা এড়িয়ে চলি। এবং এই চলতে চলতে আমার স্বভাবটা অনেকগুলো বিশেষত্বে পুষ্ট হয়েছে, পুষ্ট হযেছে বলে এখন আর আমি কথায় কথায় রেগে উঠিনা। একটুতেই ক্ষুদ্ধ হইনা বা বিগলিত হই না। ঠেকে শিখেছি যে অনেক □

গীতিকাব্যের গৌরচন্দ্রিকা

মনে পড়ে সেই আমি যখন ক্লাশ নাইনে পড়তাম তখন একটা কবিতা লিখেছিলাম। আমার এক সহপাঠী ও বন্ধুর সাথে দিন কয়েক আগে অল্প কিছু বাক্‌বিতণ্ডার দরুণ কথা বন্ধ হয়ে গেল। এমন হামেসাই হতো। দু'চারদিন গেলে পরে অন্য সহপাঠীরা অমন "বয়কট" করে থাকতে দিত না। তাদেরই কেউ আমাদের দুজনার মাঝে এসে নির্দেশ দিত, "আমি রেডি ওয়ান-টু-থ্রি বলব, তোমরা হ্যাণ্ডসেক্ করবে, না করলে আমরাও বয়কট্ করব।"

ঐ বয়কটের ভয়ে অথবা নিজেদের আগ্রহে আমরা হ্যাণ্ডসেক্ করে স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরে পেতাম, সব ঝগড়া মীমাংসা হয়ে যেত। সাক্ষী হিসেবে অপরাপর সহপাঠীরা "হিপ্ হিপ্ হুররে" বলে চিৎকার করে উঠত।

কিন্তু সেবার গোলমালটা একটু বেশীই হয়েছিল। মানে আমাদের দুজনায় কথা তো বন্ধ হলোই অধিকন্তু সহপাঠীরাও নানা দলে বিভক্ত হয়ে গেল। কেউ আমার দলে, কেউ তার দলে, বাকীরা নিরপেক্ষ। কেউ মধ্যস্থতার ভূমিকায় নেই।

আমি কিন্তু মনে মনে বড়ই উদ্বিগ্ন-চিত্ত হয়ে উঠলাম — কবে আমার সেই বন্ধুর সাথে কথা বলব। এমনি অস্থির যখন আমার মনের অবস্থা আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম নাম দিয়েছিলাম "বাক্‌রুদ্ধ" কিন্তু তার একটি পঙ্‌ক্তিও আমার মনে নেই। এখন হাতের কাছে ঐ কবিতাটি থাকলে কাউকে দেখিয়ে বুঝাতে পারতাম কেমনটি লিখেছিলাম ঐ কবিতা। মাত্রা, ঝোঁক, পর্ব কোনটি জানি ছিল।

তার অনেক পরে চাকুরির ইণ্টারভিউ দিতে গিয়ে বড় মুস্কিলেই পড়লাম। বরাবরই জানি ইণ্টারভিউটা বিদ্যার পরিমাপ নেবার জন্যে নয়, উপস্থিত বুদ্ধির বিচার শক্তিরও না, বাস্তব বোধের লোকের সঙ্গে ব্যবহার কৌশলের। আদব কায়দায়, চেহারায় চৌকষ ব্যক্তিত্বের পরিচয় নেবার জন্যে। সে ভাবেই তৈরী হয়ে ইণ্টারভিউতে হাজির হয়েছিলাম। কিন্তু গিয়েই মুস্কিলে পড়লাম প্রশ্ন পেয়ে "নেরেট ইওর স্টুডেণ্ট কেরিয়ার উইথ্ রেফারেন্স টু দ্য টিচার ইউ লাইকড্।"

উত্তরটা কেমন লিখেছিলাম সে একমাত্র সিলেকশন বোর্ডই বলতে পারে। আমি শুধু জানি আমি চাকুরি পেয়েছি। ঐ প্রশ্নের উত্তরে ঠিক কত দিয়েছে বা কি গ্রেড্ এ ফেলেছে জানি না।

কিন্তু সে তো ইংরেজী, বাংলাতে আমি কোন কিছু লিখতে চেষ্টাও করিনি।

কিন্তু কি জানি কি হলো আমি এখন একজন লেখক এবং যা লিখি বাংলাতেই লিখি এবং যত লিখি তার সবগুলো যে সুখপাঠ্য তাও না অথচ না লিখলেও নয়। এখন লেখা ছাড়া আমার গত্যন্তরও নেই।

প্রত্যেক মানুষের ভেতরেই একজন স্রষ্টা লুকিয়ে থাকে। সৃষ্টি করবার প্রেরণা কার কবে কি কারণে জাগবে কে জানে? প্রেরণা জাগলে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সৃষ্টি করে। কিছু না কিছু অরিজিন্যালিটি প্রত্যেকেরই থাকে।

সেই কবে কখন, কোন কালে—প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমার যখন কামনা বাসনা বড় উদগ্র ছিল যার কারণে একটা ফচ্‌কে মেয়েকে কিছু বলতে ক্ষুর স্পর্ধা মাথা চাড়া দিয়েছিল "তুই বড় সুন্দর, তোকে আমার ভাল লাগে, তোকে আমি ভালবাসি, তুই বাসিস্ কিনা বল?"

অমন স্পর্ধার মধ্যে আমার কোন দোষ ছিল না। দোষ হলো দর্শনীয় বস্তুর। আর সত্যি বলতে কী শহরে দর্শনীয় বস্তু বলতে ঐ একজনই—বড়ই

রাঙ্গিলা। তবে ভগবানের দোহাই দিয়ে বলতে পারি তার জন্য বিন্দু মাত্রও দায়ী সে নয়। দায়ী হলো তার সৃষ্টি কর্তা। কাজল বিহীন কাজলা চোখ, কুন্দশুভ্র দাঁত, গায়ে আগত যৌবনের মাদকতা যৌন অভিলাষ উৎপাদক।

তার সম্বন্ধে আমার অনুরাগও ছিল না, বিরাগও না। আমি সম্পূর্ণ উদাসীনই ছিলাম। দুচারটে ছুট্‌কো ছাটকা কথা কশ্চিত হয়েছে কি হয়নি। এবং যেভাবে ছিলাম বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কেন আমার মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি হলো তাকে ঘিরে—একটা অব্যক্ত আকাঙ্খা বেড়ে উঠল—বেড়েই চলল। ঐ কথা গুলো বলতে সুযোগ খুঁজতে ব্যস্ত হলাম।

কত সহজ কথা। অথচ কী ভয়, কী লজ্জা আর কী কঠিনই না বলা। এত স্বল্প আলাপে বলতে যাওয়া কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকত। ইতস্ততঃ করছিলাম মতলব বের করবার জন্যে।

ধুত্তোরি। বলতেই পারিনি, শুধু বলব বলব করে তার কাছাকাছি ঘুর ঘুর করেছিলাম মাত্র আকাঙ্খার দৃষ্টি নিয়ে বেশ কিছু দিন।

সে বুঝেছিল সকলের সামনে থেকে সরে গিয়ে ওর প্রতি অতটা মনোযোগ স্বাভাবিক নয়। তাই তার ডাট্ বাড়ল এবং আমার অন্তরঙ্গ হবার ভঙ্গিতে সে খাপ্পা হলো। কোন দিন সামনা সামনি পরে গেলে নিয়ম মাফিক অবহেলার সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিত। এমন শাণিত দৃষ্টি ছুড়ে যেন ছোঁয়াছুঁয়ি হলেই রক্তপাত হবে। এবং যখনি তার কাছে এগিয়ে যেতে মন চাইত একটা কোপ্ পেতাম মন খুলতে গেলেই মুখের কথা জড়িয়ে যেতো ঐ কোপ্ দেখে। বস্তুতঃ ঐ বয়সে আমার আই কিউ কম থাকায় হঠাৎ অমন কোপ্ দেখালে আমি ঘাবড়ে যেতাম বুকের মধ্যে যান্ত্রিক দুরু দুরু। অর্থাৎ এসব বিষয়ে আমি একেবারেই আনাড়ী, কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই মনের কথা বলা আর হলো না।

কিন্তু না বললেও যেটুকু বোঝা উচিত ঐ রাঙ্গিলা তা ঠিকই বুঝেছিল, কিন্তু সব জেনেও না জানার ভান করল।

ভয়ানক চালাকরা যেমন ভয়ানক বোকা সেজে থাকে তেমনি ভঙ্গি নিয়েছিল সে। আমি নির্বাক হলাম। বেহাল হলাম।

মনে মনে কী নাকালই না হয়েছিলাম আমি!

কিন্তু মন যে আমার তখন বড়ই রঙ্গিন ছিল। তাই ওর চালাকিটাই আমার স্বপ্ন হয়ে দাঁড়াল। যে মুখোসটা ভয়ঙ্কর মনে হয়েছিল সেটাই মনোরম হয়ে দেখা দিতে লাগল স্বপ্নে। আমার অন্যায় মতলবে বা আচরণে সে যে মোটেই রাগ করেনি তার প্রমাণ পেতে লাগলাম স্বপ্নের ভিতর দিয়ে। স্বপ্নে সে আমার সব কথা শুনত, সব অত্যাচার সহ্য করতো হাসি আর চঞ্চল আবেগে। গলিত লাভার ন্যায় গরম বাষ্পের এক স্রোত বইতে থাকত সারা শরীর জুড়ে স্বপ্নেতে।

অমন স্বপ্নের কোন অর্থ হয় কিনা জানি না তবে মনে হতো আমি যে তাকে আমার মনের কথা বলতে না পেরে কষ্ট পাচ্ছি এজন্য তার আত্মাও কষ্ট পাচ্ছে। তাই স্বপ্নের ভিতর দিয়ে সে আমার অপূর্ণ আকাঙ্খাকে পূর্তি দিতে উদয় হতো। আমাকে সে পাত্তা দেয়নি, দিলে এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হতো না — এখন দুজনেই ফল ভোগ করছি।

বলা যায় এসবই আমার অতীন্দ্রিয় অনুমান। সে যাক্ স্বপ্নের ঘোরে আমি নানা কল্পনা করতাম সেই রঙ্গিলাকে নিয়ে যা প্রকাশ হয়ে পড়ত কলমের আঁচড়ে কাগজের উপর।

ওগুলো সাহিত্য নয়। ওসবই ছিল ভাব বিলাস। মনোবিলাস কিংবা প্রেম বিলাস অথবা মরসুমি পাগলামি। অর্থাৎ স্বাভাবিক থেকেও কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেছি—তারই প্রকাশ ওগুলো।

স্বপ্নের রং ও রূপ বদলায়।

দেখতে দেখতে রং বদলে গেল। বদলে গেল চোখের দৃষ্টি-মনের ভাবধারা-কল্পনা। বড় বড় সাহিত্যিক পণ্ডিতদের কে কিভাবে লিখেছেন জানতে জানতে আমার লেখার পদ্ধতি শোধিত, শীলিত মার্জিত হয়ে উঠল এবং আমার কলমের

আঁচরের ধরণও বদলাল। কল্পনা বাস্তব থেকেও সত্য। এবং ক্রমে এ লেখা লেখিই আমার কাছে ফুটে উঠল অসীম আনন্দের উৎস। শুধু মাত্র একটা নেশা নয় দুর্মূল্য বিলাস।

অদৃশ্য বাঁক দিয়ে আমি পরম আশ্চর্য পথ পেয়ে গেলাম। পেয়ে গেলাম আত্মপ্রত্যয়। সঠিক চিন্তা আত্মশক্তি, অন্তর্বেদনা থেকে মুক্তি।

বেশ মজা লাগতে লাগল এক এক করে শব্দ জুড়ে ঘটনার যোগ সাজাতে কলমের আঁচরে এবং বাক্য যোগ সাজনের নেশার ভেতর দিয়ে যখন এক একটা লেখা শেষ হতে লাগল কী আনন্দই না হতো।

তখন একমাত্র চিন্তা এর পরে কি নিয়ে লিখব।

লেখার কথা এত ভাবি বলে আমার ভেতরের সেই অতৃপ্ত আকাঙ্খা কামনা-বাসনা লোপ পেয়ে গেল এবং লোপ পেল বলেই এখন আর কোন কিছুর জন্যই বড় হা-পিত্যেশ নেই। যে দেখবে সেই বলবে আমার মনে কোন অস্থিরতা নেই, আমার চিত্ত শান্ত সমাহিত এবং স্বাভাবিক নিয়মেই আমি লেখার চর্চা করে যাচ্ছি। অপাঠ্যকে পাঠযোগ্য করার প্রয়াসে ব্যস্ত থাকি। বছর ঘোড়ে, বয়স বাড়ে লেখার উন্নতিও ঘটে।

তাই তো ভাবি কী থেকে কী হয়! আজ যদি সেই রঙ্গিলা আমার চোখের সামনে এসে স্ব-শরীরে দাঁড়ায় তার রূপের ডাট্ নিয়ে লাস্যের ভঙ্গিতে কামার্ত চোখ মেলে কোন আপোস করব না আমি। আড় চোখে তীব্র-তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হেনে প্রথমেই একবার তার আপাদ মস্তক দেখে নেব, কারণ আমার যখন ভীষণ আকাঙ্খা ছিল অমন কটাক্ষই হেনেছিল সে যার ভিতরে ফুটে উঠেছিল এমন একটা অবজ্ঞা যার অর্থ করলে দাঁড়ায়, "আপনার ওরকম দৃষ্টি দেখার আর যা বলতে চান ওসব কথা শোনার অভ্যেস আমার আছে বুঝেছেন?"

আনাড়ী অনভিজ্ঞ-সরল পেয়ে সে যেমন নাকাল করেছিল আমাকে তেমনি নাকাল করে দেব তাকে পাল্টা কটাক্ষ হেনে যার ভেতরের কথা হবে, রঙ্গ দেখাবার জায়গা পাস নি? যা ভাগ—ভফাৎ যা। ইয়ার্কী মারবি তো এক চড় মেরে মুখ গুড়ো করে দেব।'

তার কামার্ত মুখ ভেঙে চুন কালি মেখে দেব। বুঝিয়ে দেব আকৃতিতে আমি ছোটখাট মানুষ হলেও প্রকৃতিতে হিংস্র জন্তু বিশেষ। সেই মন এতদিনে আমি ফিরে পেয়েছি। এখন আমি অন্য ধাঁচের মানুষ।

না, তেমন অভদ্র হওয়াটা আমার পক্ষে মোটেও উচিত হবে না। কারণ তাকে ঘিরে প্রেম অনুভবই আমার লেখালেখির উৎস। আবার তাকে না পাবার দুঃখ বোধটাই লেখালেখির উৎপত্তি। এবং স্বাভাবিক কারণেই তাকে সামনে পেলে আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলব, "আমার ভিতরে যে সাহিত্য প্রতিভা লুকিয়ে

> ছিল, তোর ঐ অবজ্ঞার কটাক্ষই আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে কাগজ কলম নিয়ে বসতে। আমার এই চর্চার পেছনে তোর অমন অবজ্ঞা অবহেলার প্রয়োজন ছিল। তাই না আজ আমি লেখক। পড়ে দেখবি দু'একটা কেমন আমি লিখি?"

না, তেমন মাথা ব্যথা আমার নেই, আমার লেখালেখিতে আর কি? কেউ পড়লেই বা আমার কি! এখন আমার স্ত্রী আছে, আছে লেখালেখি, আমি এখন অন্য গ্রহের মানুষ।

সে আমার কাছে পাস্ট টেন্স। তাছাড়া তার সঙ্গে তো আমার কোন রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চার হয়নি। যা কিছু হয়েছে এক কথায় রিডিকিউলাস্ পওশ্রম পরিণতিহীন ভাবে শেষ।

এতখানি বয়স হলো পরিতাপ বা আত্মাভিমান শোভা পায় না, তবু স্বীকার করতে বাধ্য তাকে না পাওয়ার অস্ফুট যন্ত্রনাই একাকীত্বকে কি করে বহন করতে হয় এই লেখালেখির ভিতর দিয়েই পেরেছি। নিজেকে নিজে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি।

সুতরাং তাকে ধন্যবাদ। □

আত্মবীক্ষণ

যে কথাটা বার বার বলতে হয় তা দিয়েই শুরু করছি।

সে কথাটা কী? বহুবছর ধরে বহু কিছু করে বর্তমানে আমি একজন পেনসনার। অর্থাৎ আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এটাই আমার বর্তমান পরিচয়। নতুন পরিচয়ে পরিচায়িতে।

চাকুরিতে যখন ছিলাম কত লোকের আনাগোনা ছিল আমার কাছে। তখন ক্ষমতা ছিল না ছিল না করেও কমও ছিল না। যে চেয়ারে বসতাম গদি থাকলেও না থাকারই মত। তবু ঐ চেয়ারের দৌলতে কিছু মর্যাদা পেয়েছি, পেয়েছি সম্মান। এতো মন্তব্য বা সই এর জন্য কত লোকজনের আনাগোনা ছিল আমার কাছে।

তখন আমার মন্তব্যের, সই এর দাম ছিল।

এখন আমি নো বডি, বিশাল কর্মকাণ্ডের কেউ না।

এই যে আমি আমার নিজস্ব বাড়িতে মূল্যবান মোটা গদি যুক্ত ইজিচেয়ারে বসে আছি, তবু আমার মন্তব্যের কোন দাম নেই—সই এরও না—আমারও না।

সুতরাং বড় কেউ আমার কাছে আসেও না।

প্রয়োজনই নেই।

এখন আমি বলতে গেলে গৃহবন্দী, নিঃসঙ্গ, একাকী।

ঐ ইজিচেয়ারে শুয়ে বসে যা কিছু ভাব, লেখ, পড়, ঘুম পেলে ঘুমোও।

তা বলে আমি কি একেবারে অলস হয়ে গেছি? মোটেই না।

সমাজেই তো আছি, সামাজিকতা আছে। দৈনন্দিন হাট-বাজার আছে। সান্ধ্য বা প্রাতঃভ্রমণ আমার স্বাস্থ্যের কারণেই অত্যাবশ্যক। তা আমি রীতিমতই করি।

নিয়মিত না হলেও কালে ভদ্রে আড্ডায় যাই। যাই মানে, আমি এখনও যে আছি ওটাই জানান দিতে যাই। অর্থাৎ সম্পর্কটা একটু ঝালাই করা আর কি।

কালে ভদ্রে সান্ধ্য বা প্রাতঃভ্রমণ কালে ২/৪ জন আমার মত অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষ্যাতও হয়। এবং সাক্ষ্যাত হলে কথাও হয়। মামুলী

> সব কথা। গতানুগতিক প্রশ্ন "কেমন আছেন? ভাল আছেন ত?"

উত্তরে প্রায় সবাই রকম ফেরে যা বলনে তা এরূপ :—

> "এই বেঁচে আছি আর কি, যত দিন না উপর থেকে ডাক আসছে, অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্যই বেঁচে থাকা যতদিন না প্রাণটা যাচ্ছে। অন্য কথায় যত দিন না মরছি, বেঁচে থাকতেই হবে। মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষ এখন করুণা করলেই হয়...."

এমন প্রার্থনায় অদৃশ্য মঙ্গলময়কে উদ্দেশ্য করে কপালে হাত ছুঁইয়ে প্রণাম জানান এমন ভঙ্গিতে ঈশ্বর কেন করুণা করছে না—যার ভিতরে অভিমান। বেদনা ও ক্ষোভের সব রকম অভিব্যক্তিরই স্পষ্ট প্রকাশ।

প্রত্যেক মানুষেরই মনে নিজস্ব অশান্তি থাকে, থাকে নানা অভাব বোধ। জীবন বা বয়স তাকে যত শিক্ষাই দিক, সে মনে করে তার সমস্যা কেউ বুঝতে পারবে না, তাই সে নিজেকে সমর্পন করে ঈশ্বর ভাবনায় যদি কিছু শান্তি জোটে এই ভরসায়।

এই যে সমর্পন এর মধ্যে সে হয়ত এক ধরণের সুখ খুঁজে পায়। তাই বোধহয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের জন্যও করুণা ভিক্ষা করে ঈশ্বরের কাছে।

অমন প্রার্থনা বা ভিক্ষাটাই যেন সিম্বলিক।

এ জাতীয় লোকেদের সাথে মোলাকাতটা আমার খুব জমে না। কারণ আমি একটু গল্প প্রিয় এবং ট্যাক্‌টিভ্ টাইপের।

তাছাড়া ঐসব টিপিক্যাল প্রার্থনার মধ্যে কী গভীর গোপন অজানা রহস্য আছে আমি বুঝি না।

অমন প্রার্থনায় আমি নেই।

নেই মানে একদম না।

হ্যাঁ: আমার মধ্যেও নানা অভাববোধ, নানা কষ্ট আছে। আছে মৃত্যু জনিত ভাবনা।

কিন্তু মৃত্যু তো জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—এই আছি, এই নেই।

ম্যান ইজ মর্ট্যাল। জন্মিলে মরিতে হয় এ তো স্বতঃসিদ্ধ!

কেউ অনন্ত কাল বে'চে থাকতে পারে না।

প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষ জন্মায় প্রাকৃতিক নিয়মেই মরে।

এর মধ্যে ঈশ্বরকে ডাকলেই যে মৃত্যু এসে গ্রাস করবে বা করেছে এমন দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই।

অমন প্রার্থনায় কী সুখ আমি বুঝি না। ওসব প্রার্থনা এবং আচরণ ব্যক্তিগত মানসিকতার ব্যাপার।

অনেকে বলে, "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর," এমন দুরূহ কথায় আমার বিশ্বাস হয় না।

আর বস্তু? সে আমার হয়েছে। কিন্তু কিভাবে? কী টিপে টিপে আমি চলেছি, সে আমি জানি। পায়ের তলায় মাটি যখন সরে সরে যাচ্ছিল বারে বারে তখন ঈশ্বর কোথায় ছিল? তখন ঈশ্বরকে কি কম ডেকেছি! সাড়া দেয়নি। জীবনে সদাচারের ভূমিকা নিয়ে স্বউদ্যোগে আমি যা কিছু করেছি এবং এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি গত চল্লিশ বছরের পরিশ্রম আর অধ্যাবসায়ের

ফলে। কারও করুণার নয়, ধান্দাবাজী করেও না। মাথা উঁচু করে চলতে যা করায়, তা আমি করেছি। স্বীয় সততা বা সুনাম সম্বন্ধে সন্দেহ করতে পারে এমন কোন কাজই করিনি, কাউকে করতেও দেইনি।

এমন অনেককে জানি, চিনি, দেখি যাদের একমাত্র ভাবনা বস্তু আহরণ। ভাবটা দেশ বাড়ী ছেড়ে এত দুর দেশে যখন জীবিকার সন্ধানে এসেই পড়েছি তখন বস্তুটা ডান হাতে আসছে না বাঁ হাতে অত চিন্তার দরকার কী? এমন আনস্ক্রুপিউলাস্! তাদেরই তো ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা অপরিসীম—"ঈশ্বর দুহাতে দিচ্ছেন বলেই আমরা বৈভবের সন্ধান পেয়েছি ওনাকে স্মরণ করব না তো কাকে করব?"

ঈশ্বর যদি মহাশক্তিশালীই হবে তবে কেন তত দুর্জ্ঞেয়?

দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন না করলে কী ঈশ্বর!

এই কারণেই তো ঈশ্বর আছে কি নেই আমার যত সন্দেহ এবং আমার ঈশ্বরভক্তিও তলানিতে।

ঈশ্বর আছেন এই ধারণাকে অঙ্গীকার করেই তো আমাদের পরিবারটা চলছিল। সেই ছোটবেলায় দেখেছি যত রকমের পূজো পার্বন একটাও বাদ যায়নি আমাদের পরিবারে। তবু কেন আমাদের পরিবারে নানাসব দুর্ভাগ্য জনক ঘটনা একের পর এক ঘটল, ঈশ্বর থাকতে? হঠাৎ মৃত্যু, অকাল মৃত্যু, অপমৃত্যু দিয়ে কেন ঘায়েল করল ঈশ্বর? যত রকম মার দেওয়া সম্ভব সবই নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ঈশ্বর আমাকে দিয়ে আসছে। ফলে ঈশ্বর যে আছে এ ধারণাটাই আমার কাছে ইলুসিভ্।

ঈশ্বর আমাকে তার দিকে টানার জন্য কিছুই করেনি। কিছু করেছে তেমন ক্ষীণ কিছু ইঙ্গিত যদি পেতাম কিংবা কেউ যদি আমাকে দেখাত " ঐ তো ঈশ্বর" তাহলে এত সব ঘটনা দুর্ঘটনা সত্বেও ঈশ্বর আছে এ বিশ্বাসটা নিয়েই আমি থাকতাম।

কিছু দেখলাম না, জানলাম না, চোখের উপর এতসব অবিচার অনাচার। তবু স্বীকার করতে হবে ঈশ্বর আছে!

শুধু শূন্যের উপর দাঁড়িয়ে অন্ধের মত ঈশ্বর ঈশ্বর করার প্রভাব কেন সেই অদৃশ্যশক্তি আমার উপর বিস্তার করল না ?

জগতের সব ঘটনাতেই নাকি ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছে লুকিয়ে থাকে এমন কথা শুনে আসছি সেই ছোটবেলা থেকে। কিন্তু বড় আফশোষ প্রমাণ পাইনি একটা ঘটনাতেও আজ এত বয়স পর্যন্ত। তাহলে ধরে নিতে হবে যে মানুষ যেমন সেটাও সেই ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তাই বোধহয় আমার ওয়ে অব লাইফটা পূজো আর্চা ছাড়া সেটাও সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরেরই ইচ্ছায়। ঈশ্বর কেন এই কথায় কথায় "ঠাকুর ঠাকুর" জাতীয় ব্যাপারগুলির সঙ্গে মানানসই করে গড়েননি আমাকে, রহস্য তো সেখানেই।

তা হলে শেষ কথা কি দাঁড়াল, আমি নাস্তিক ?

আরে দুর ! নাস্তিক হওয়াও অত সহজ নয়।

তা হতে হলেও মনোবল চাই।

এই যে সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত এত সব কথা বললাম এই আমার গলায়ও চরম সঙ্কট মূহূর্তে সেই অদৃশ্য দুর্জ্ঞেয় শক্তিমানের নামটাই নানা শব্দে সত্যিকারের আর্তনাদ আকারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঐ আর্তনাদটা জ্ঞানের না নির্জ্ঞানের, না, নানা যন্ত্রনার বেদনার কারণে সহনশীলতার শক্তি সঞ্চয়ের অবলম্বন অথবা দুর্বল অবচেতন মনে ঈশ্বর প্রাপ্তির অভিলাষ, না মুদ্রাদোষ বা সংস্কার কোনটা ? নিজেই বুঝি না।

এমনই জটিল মন।

অর্থাৎ বহু যুগ ব্যাপী সংস্কার নিয়ে গড়ে উঠেছে যে সমাজ সেই পরিবেশে মনটাকে পুরোপুরি ছেঁটে ফেলা সহজ নয়। অনেক অনেক কালের সাংস্কৃতিক মগজ ধোলাই।

সহজ না হলেও এটা সঠিক যে শব্দেই আর্তনাদ করি না কেন মাথা খুঁড়ে মরলেও ঈশ্বর ভর করে। মনোবল ভেঙ্গে পড়লেই ঈশ্বর ঈশ্বর-দেবস্থান ধর্ণা।

অর্থাৎ মনই ঈশ্বর সৃষ্টি কর্তা।

উপায় দিয়ে পাব কি তারে শুধু আপন ফাঁদে মরা।

এই ফাঁদে পা দেই—মাথা খারাপ!

ঈশ্বরকে আমি নিজের মত করেই ভাবি।

বেঁচে থাকার সর্বোচ্চ আদর্শের নামই ঈশ্বর।

কর্তব্য পরায়ণতার নামই ঈশ্বর। পরিশ্রম, আদর্শ আর সততার সম্মিলিত শক্তি হল ঈশ্বর।

যা করার, যতটুকু করার, তা আত্ম সচেতন হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে করা এ বোধ টুকুই আসল।

ঈশ্বর একটা অনুভূতি, চেতনা, শুধু মাত্র প্রার্থনায় সীমাবদ্ধ নয়, "বী·গুড্, থিঙ্ক গুড্, ডু গুড্"—এই সংক্ষিপ্ত নীতিবাক্য মেনে চললেই ঈশ্বরও নিজের গ্রিপ্-এ।

মূল কথা হল বিশ্বাস করি বা না করি নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে।

বড় বেশী বলা হয়ে গেল। অনেকে বলবে এসব কথা লেখাও পাপ। শোনাও পাপ—এ প্রসঙ্গ থাক।

এই আত্মবীক্ষণে আমার আরও কথা বলা আছে।

যারা আমাকে ঘনিষ্ট ভাবে কর্ম জীবনে দেখেছে হঠাৎ তাদের কারও মুখোমুখি পড়ে গেলে স্বাভাবিক প্রশ্নই হয়, "কী স্যার, কেমন আছেন?"

উত্তর দেই, "এই আছি, ভাল ভাবলে ভাল, খারাপ ভাবলে খারাপ।"

প্রশ্ন—"তা স্যার আপনি তো নানা কর্ম কাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে ভীষণ ব্যস্ত মানুষ ছিলেন। ঐ ব্যস্ততার মধ্যেও আপনাকে হাস্য পরিহাস মজলিসি টাইপের দেখেছি, এখন কেমন কাটছে? আড্ডায় যান? পূজো আর্চা করেন?"

উত্তর—"আড্ডায় যাই আবার যাইও না, তবে ছেদ টানিনি। পূজো আর্চায় আমার মন বসে না।"

প্রশ্ন—"তা আপনার ছেলে পুলেও নেই, স্ত্রী থাকেন স্কুলে

আড্ডায়ও যান না, পূজো পার্টিরও মন নেই। তাহলে একক ভাবে কি করে দিন কাটান? ভাল লাগে? সময় কাটে?

কেন কাটবে না? কিন্তু কিছু ছবি চিরকাল থেকে যায় মনের মধ্যে। সে সব ছবি নীরবে নির্জনে বসে বা শুয়ে নেড়ে চেড়ে সাদরলীকতেও তো সময় কাটান যায়।

বৃদ্ধের ভাণ্ডারে অভাব কি! ফেলে আসা জীবনের হিসেব নিকেশ করা। ভাগ্যের দয়ায় আমি একক, একা থাকা, একা বসে ভাবা বা লেখা যার ভাগ্যে জুটে না সে জানে না জীবনে সব চেয়ে বড় আনন্দ কী! আড্ডা মেরে সময় কাটানর চেয়ে অনেক বেশী স্বাদু এবং মজার।

আড্ডায় কি হয়? হয় রাজনীতি, নয়ত পরচর্চা এর ওর ত্রুটি ধরা। তার মানে একমত না হলে হয় কম্প্রোমাইজের ভঙ্গীতে চুপ মেরে থাকা, অন্যথায় কন্‌ফ্রণ্টেশন—বাক-বিতণ্ডা।

ওতে মনকে কতটা শান্ত রাখে?

তার চেয়ে আমার কাছে এই নিঃসঙ্গতাই শ্রেষ্ঠ।

মনকে শান্ত এবং নির্মল রাখতে নিঃসঙ্গচারী জীবনটা তো আমার মনপসন্দ। এ অভ্যেসের মধ্যে পরতের পর পরত বেঁচে থাকার রসদ।

এটা আমি লালন করি এবং করে যাব জীবনের শেষ প্রহর পর্যন্ত। বিস্তর নাকানি চোবানি খেয়েও এ অভ্যেসটি ধরে রেখেছি। এবং এ অভ্যেসটা আছে বলেই বেঁচে আছি।

আমি সাহিত্যিক নই। কিন্তু সাহিত্যিক হবার বাতিক-শূন্য নই। পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আমি সাহিত্যিকের কিছু খ্যাতি অর্জন করতে পারতাম।

পৃষ্ঠপোষকতা পাইনি। কিন্তু পাইনি বলে আমার মনে কোন ব্যর্থতা বোধ নেই। কারণ আকাঙ্খার পরিবর্তে আমি যে অভ্যেস আয়ত্ব করেছি তার মূল্যও কম নয়। এ সলিড জিনিস।

এই অভ্যেসটাই বর্তমানে আমার অবসর সঙ্গী।

এই অভ্যেসে আমি মগ্ন থাকতে পারি ঘণ্টায় পর ঘণ্টা। যাকে বলে এক ধরণের ডিভোশন্ বা মেডিটেশন্ অথবা জীবনের শেষ অপরাহ্নের মনাষ্টিসিজম্ বা সন্তোষ। সন্তোষের সমান ধন নেই।

প্রহর গুনতে হয় না। দিনগুলিকে দিনগত পাপক্ষয় মনে হয় না।

সময় বয়ে যায়, টেরও পাই না। আমি ভাল থাকি এবং আছি শারিরীক নানা হি হি পি পি সত্বেও।

এখন আমার মন অন্যত্র। অন্যত্র মানে বহু বিচিত্র বিসদৃশ ভাবনার জগা-খিচুড়ি। অনেক কিছুর জট মাথার মধ্যে অবসেশন্।

প্রধান ইস্যুটা কি? কোন চিন্তাকে প্রাধান্য দেব?

বৃদ্ধের যা স্বভাব সেটাই আগে। অর্থাৎ চোখের উপর যা দেখছি তারই তুলনামূলক একটা চিত্র অতীতের সঙ্গে বর্তমানের।

তখন জীবন যাত্রাটা কত সহজ সরল ছিল। কী নির্মল স্বভাবেরই ছিল মানুষ জন নিষ্ঠা ছিল, নিয়মানুবর্তিতা ছিল। যাদের প্রাচুর্য ছিল তো ছিল। তারা চোখ বন্ধ করে রাখত না দরিদ্র শ্রেণীর দুঃখ দুর্দশায়। অভাব অনটন আছে তো আছে, প্রাচুর্যের জন্য হাহাকার হুটোপুটি ছিল না একে অপরের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করলে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠত চোখে মুখে। কারো সঙ্গে কারো অসদ্ভাব দেখিনি। অপরের দুঃখে কেউ উদাসীন থাকত না-সমব্যথী। এক কথায় শুধু নিজের সুখ নিয়ে আত্মবিস্মৃত থাকতে দেখিনি বড় কাউকে। নৈতিক বোধটাই ছিল টনটনে।

আমার সমবয়সী যারা পেছনের দিকে তাকালে নিশ্চয় এক মত হবেন।

আর এখন? ক্রম বিকাশে এখন মানুষ ভিন্নরকম। এখন সম্পর্ক তৈরী করতে হয় মেপে মেপে। জেনে বুঝে। তাহলেও কি তেমন সম্পর্ক হয়! ধর্মের খুটি, নেতৃত্বে বিশ্বাস, গুরুজনে ভক্তি একে একে সব হারিয়ে দিশাহারা। খুব কম করবে হলেও ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক।

একটা দোকানে ঢুকে ছিলাম কিছুদিন আগে, বর্তমান কালের মানুষ সম্পর্কে একটা রচনা বিন্যাস চোখে পড়ল। সেটার অনুলিপি নিম্নরূপঃ-

মানুষ

প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে,
সমাদর করলে খোসামোদ ভাবে,
সদুপদেশ দিলে ঘুরে বসে,
উপকার করলে অস্বীকার করে,
দুঃখের কথায় সুযোগ খোঁজে।
ভালবাসলে আঘাত করে।
স্বার্থ ফুরালে কেটে পড়ে।

এটাই কি মানুষের চরিত্র হওয়া উচিত? পাশের ব্যক্তির পানে তাকাতেই মৃদু হাস্যে তাচ্ছিল্য, "এসব নিয়ে ভাবাটাই অনুচিত।"

"অথচ আমাদের দিনে…"

"রাখুন মশায় আমাদের দিনে -দিন বদলায়।"

পরিবর্তনশীল সমাজে বদলাবেই, তা বলে এত ব্যতিক্রম!

কাগজ খুলে দৃষ্টিপাত মাত্রই চোখ ছানাবড়া। এমন একটা দিন নেই যে দুর্ঘটনা নেই, হত, নিহত, নানা মর্মান্তিক ঘটনা, এমন এমন সব ঘটনা যার ফলে রাস্তা রোখ আন্দোলন, সড়ক অবরোধ, বিধানসভা অভিযান, ধর্মঘটের ডাক জেল ভরো এর উপর আছে বোমা বিস্ফোরণ, উগ্রপন্থী বিচ্ছিন্নতা বাদীর হামলা অস্থির চালচিত্র। সরকারী বক্তব্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অথচ সামাজিক নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা চোখে পড়ে না। পুলিশ আসে ঘটনা ঘটে গেলে।

আরও কত ঘটনা! ভাবতে পারা যায় নতুন বহুতল বাড়ী তৈরী হল, কিন্তু দখলের আগেই ধূলিসাৎ ভূমিশয়ন। আগুনে নয়, বোমায় নয়—নির্মাণ ত্রুটি। এমন অপকর্মের অংশীদার কারা? সরকারী বক্তব্য তদন্ত হচ্ছে। ঠিকাদার বা গৃহনির্মাণের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের শাস্তি হবে। তদন্ত যে কবে পর্যন্ত শেষ হবে সেটা আর সংবাদ হয় না অথবা অপ্রকাশিতবাই থাকবে। কারণ বোঝা সাধ্যের বাইরে। এই চেপে রাখাটাই নাকি জন স্বার্থ। অথবা ঐ

একটা বয়ান, দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সব মহলকে সতর্ক করে দেওয়া
হয়েছে। গাফিলতি ধরা পড়লে কড়া ব্যবস্থা। কড়া
হাতে মোকাবিলা করা হবে।

লুট তহবিল তছরূপের ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট যদি বেরও হয় চারটা শব্দ "ঘটনা সত্য প্রমাণ অভাব। অথবা গুরুপাপে লঘুদণ্ড।"

রহস্যজনক ডাকাতি বা খুনের ঘটনায় প্রেস রিলিজ, "অজ্ঞাত পরিচয় কিছু
দুষ্কৃতীকারীর কাণ্ড, চিরুনি তল্লাস চলছে।" ফলং দুষ্কৃতকারীর
হদিস নেই রহস্যজনক ভাবে।

তদন্ত কমিশনও নিযুক্ত হয়। উদ্দেশ্য জন রোষ প্রশমিত করা।

এরপরেও আছে নানা উৎপাত। চাঁদা, জুলুম জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি আরও কত ভেজাল। তেলে ভেজাল পেট্রলে ভেজাল মানুষের ব্যবহারেও ভেজাল- আরও কত কি! প্রশাসন যন্ত্র মাথা ভারী হয়েও যে যার তালে। কেউ প্রমোশনের ফিকিরে, কেউ ভাল পোস্টিং এর জন্য, কেউ এক্সটেনশন কিংবা রি এমপ্লয়মেন্টের তালে পিল্যার টু পোস্ট।

অফিস হল কর্মভূমি। চাকুরী মানে কৃতিত্ব দেখাবার জায়গা দলবাজী নয়, রাজনীতি নয়, দায়িত্ব পালনই কর্তব্য।

দাবি? তা থাকতে পারে, সেটা কর্তব্য পালন করতে করতেও পেশ করা যায়, এই তো নিয়ম।

কিন্তু না, "আগে দাবি মেটাও তারপর দায়িত্বের কথা বল, এই আমরা
পেনডাউন স্ট্রাইক করলাম। এর পরেই কিন্তু ঘেরাও
তার পরে বৃহত্তর আন্দোলন"।

অফিস এ্যাটমসফিয়ারটাই নষ্ট।

কাগজে কলমে খুব কড়াকড়ি কিন্তু বজ্র আঁটুনির মধ্যেই ফস্কাগেরো। এখন অফিসের কাজ চলবে কি চলবে না তার বুনিয়াদই হল কর্মচারী সংগঠন। এক নয়—একাধিক. ফলে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব! এই তো বাস্তব অস্বাস্তিকর বৈ কি!

এমন অহরহ দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা নষ্ট কর্মচারীদের আচরণে সেই নমনীয়তা বিলুপ্ত—একেবারে আলাদা আদল। হাজার রকমের দুর্নীতির অভিযোগে একাকার প্রশাসন অতীত—বর্তমান।

পদাধিকার বলের যোগ্য সৎ ব্যবহার হয় না, হচ্ছে না। পারেও না। সেই গাটস্ই নেই। টপ্ গাইরা চাকুরির স্বার্থে শাসকদলের অনুকূলে কাজ করে। আবার বিরোধীদেরও চটাতে সাহস পায় না—কী জানি যদি আগামী নির্বাচনে ওরা যদি দখল করে! অর্থাৎ দু-নৌকোয় পা রেখে সীমাবদ্ধতার পেক্ষপটেই যা কিছু। এতে কাজের গতি যেমন দ্রুততর হয় না তেমনি নিরপেক্ষও না। ফলে নিজস্ব জায়গায় কেউ নিজেকে সুখী ভাবতে পারছে না। আইনের শাসনের জায়গা নিয়েছে দলের শাসন। অর্থাৎ অফিসের ছোট বড় সবাই পলিটিকেলাইজড। এ কী হাল! কে কখন অফিসে আসেন যান তা দেখার কেউ নেই। অথবা থেকেও নেই।

এসব প্রশ্রয় দেয় কারা? যে শর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়াবার কথা, সে শর্ষতেই ভূত! সব ব্যাপারে রাশ আলগা। যা হচ্ছে স্বাভাবিক বৈ কি!

গণতন্ত্রের প্রহরী যারা তারা নানান সমস্যা সঙ্কটে জড়িয়ে ধীর-স্থির অবিচল। সময়ে এর পিঠে চাপড়াচ্ছে আবার ওকেও সামলাচ্ছে—যাকে বলে পাওয়ার পলিটিক্স। ক্ষমতার মিউজিক্যাল চেয়ারকে ঘিরেই ক্ষমতা আকড়ে রাখতে হবে ত! সে কারণে প্রয়োজন হলে দলছুট—একটা খোলস ছেড়ে আর একটা খোলস।

এই কি গণতন্ত্র? গণতন্ত্র কথাটার অর্থ কি?

কোন এক মনীষী এক একটা সংজ্ঞা দিয়ে ছিলেন "*Democracy is The Government of the People for the People by the People.*"

উপলব্ধি যদি জ্ঞান হয়, "সেই জ্ঞানের দৌলতে এই সংজ্ঞাটিকে বিকৃত করলেন আর এক নিন্দুক : *Democracy is the government OFF*

the People, FAR the People, BUY the People"

অন্য এক দার্শনিকের সংজ্ঞা, *"It is the Government of the Hydra headed mass,"*

এমন যে মাস্, এদের ভোটে ক্ষমতায় আসীন হওয়া সহজ সাধ্য ব্যাপার মোটেই নয়। এরা কখন কার পক্ষে আবার কখন কার বিপক্ষে বোঝা সাধ্যের বাইরে। অথচ এই *Mass* এর অধিকার খর্ব করার অধিকার কারও নেই। তবে রাজনীতি বিদদের প্রধান সুবিধা হল এই মাস এর অধিকাংশ তেমন শিক্ষিত নয় নয়ত একেবারে নিরক্ষর। তাদের কাছে মুক্তি বিচার মননের সবল ক্রিয়া দুর্জ্ঞেয়। তার অন্য সুবিধা হল এদের বহুলাংশ এখনও দরিদ্র সীমার নীচে। পান্তা ভাতে নুন্ জুটলেই এরা বর্তে যায়। সে হেতু এদের লোভ দেখিয়ে টোপে গাঁথা কিছুটা সহজও বটে।

তা হলেও নির্বাচনের সময় নেতাদের বুকের তলায় যতটা ভরসা ততটাই সংশয়। নির্বাচনে জিতে ক্ষমতা দখল করতে পারব ত? মনে মনে হেড অর টেল চলতে থাকে "জিতব কি জিতব না"। প্রায় সবারই মনের গতি রকম ফের এক।

শুরু হয়ে যায় নির্বাচনী ক্যাম্পেন। ঘোষিত হয় নানা দলের ম্যানিফেস্টো। অর্থাৎ ক্ষমতা পেলে আমরা এ করব, সে করব যা এতকাল করা হয়নি তাও করব। আমাদের লক্ষ্য সুষ্ঠ সমৃদ্ধ জাতিকে এক বিংশ শতাব্দীতে নিয়ে যাওয়া। অনেক প্রতিশ্রুতি।

প্রতিশ্রুতি পালন? শে পরের কথা। আগে তো ভোট–গদি–প্রয়োজনে কারচুপি, দুর্নীতি, টাকার ছড়াছড়ি, স্বপক্ষে টানতে হবে ভোটারদের। এই তো মরশুম।

নেতারা আবির্ভূত হয় প্রতি ভোটারের বাড়ীর দরজায় দরজায় নকল বিনয়ের খোলস ধরে। বাড়ী বাড়ী প্রচার অভিযানের সঙ্গে চলে মিছিল, শ্লোগান, জনসভা পথসভা-উৎসবের বাতাবরণ।

আমার বয়সটা জনসভা বা মিছিল স্লোগানে গলা ফাটাবার বয়স নয়। কিন্তু হাটে বাজারে যাতায়াতের পথে পথসভার কারণে থমকে দাঁড়াতে হয়। এবং যতক্ষণ পথ খোলা না পাচ্ছি এদের ওদের বক্তব্যও শুনতে হয়। এবং শুনতে শুনতে কিছু কৌতুহলও জাগে।

এমন অনেকেরই হয় আশে পাশে পরিচিত, অর্ধপরিচিত অতি পরিচিত ২/১০ জনকে দেখতেও পাই। তবে কে কোন দলের সমর্থক বোধগম্য না। কে কি মন নিয়ে শোনে কিংবা কে কতক্ষণ শুনতে থাকবে তা নির্ভর করে তার নিজস্ব দৃষ্টি কোণের বিচারে—ভাললাগা মন্দলাগার উপর।

হাতে ঘুষি পাকান ভঙ্গিতে বক্তার মুখে অনর্গল সুভাষিত।

বক্তা যে দলেরই হউক অকাট্য যুক্তি খুবই প্রাসঙ্গিক।

ভিন্ন দলের বক্তা যা বলল তাও যথার্থ-খুবই তাৎপর্যপূর্ণ

কিন্তু দুজনারই বক্তব্যে বিপরীত ধারা যদিও দলগত দিক দিয়ে সঠিক। এটাই প্রকাশিত।

সব বক্তাদেরই বাক চাতুরির সর্বালঙ্কৃত বক্তব্যে বেশ ফাঁক।

এই ফাঁকের কারণেই শ্রোতাদের কাউকে কাউকে সরে যেতে দেখা গেল। যারা সরে গেল না তাদের নিজেদের মধ্যে মদু কথপোকথন শোনা গেল ঃ—

প্রথম শ্রোতা, "দুর ভাল্লাগে না, এসব একঘেঁয়ে কথা অনেক শুনেছি এদের বলা আর করার মধ্যে ফাঁক।"

দ্বিতীয় শ্রোতা, "ঠিক বলেছেন, গতবারের ভোটের আগেও এসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, অবস্থা যে-কে-সেই।"

তৃতীয় শ্রোতা, "চুপ, কথা বলবেন না। শুনতে ইচ্ছা হয় শুনুন, না হলে বেড়িয়ে যান, ' গলার স্বরে উত্তেজনা।

১ম ও ২য় শ্রোতা একযোগে হুঙ্কার তুলল, "হু আর ইউ, আমাদের বেরিয়ে যেতে বলছেন? আমরা ভোটার না! "

তৃতীয় শ্রোতা, "যান যান, বেশি ভোটার ভোটার করবেন না। আপনাদের মত প্রতিক্রিয়াশীল দু দশ জন ভোট না দিলেও নির্বাচন হবে '।'

চতুর্থ শ্রোতা, "কী, কাদের আপনি প্রতিক্রিয়াশীল বলছেন ?"

তৃতীয় শ্রোতা, "বাঃ আপনি তো দেখছি আরও বড় সমঝদার !"

চতুর্থ শ্রোতা, "কী, কী বলতে চান আপনি ? মুখ সামলে কথা বলবেন।"

গলার স্বর রাফ্ টাফ্।

ঐসব কথা কাটাকাটি থেকে গুঞ্জন উঠল আশে পাশে। এরই মধ্যে কার গলা থেকে 'লাগ ভেল্কি লাগ' উচ্চ রব শোনা গেল। আর তখনি পথসভা সংগঠনের মস্তান জাতীয় কিছু স্বেচ্ছা সেবক 'অর্ডার' 'অর্ডার' ভঙ্গীতে যেখানে ঐসব অবাঞ্ছিত কথা কাটাকাটি হচ্ছিল সেখানে ঘিরে দাঁড়ান মূর্তিমান বিভীষিকার মত, "কেউ উচ্চবাচ্য করেছ তো এমন ধোলাই খাবে চেহারা পালটে যাবে।"

অন্য দলের ছেলেরাও তৈরী পাল্টা দেবার জন্যে। থলেতে মারাত্মক কিছু অস্ত্র-সস্ত্র-বোমা। ধুম ধাড়াক্কা কিছু হবে নির্ঘাত।

আমার বয়স যত বাড়ছে শক্তি ততই কমছে কিন্তু মারামারি দেখার প্রবৃত্তিটা বাড়ছে। শেষটা কি হয় দেখতে চাই।

হাঙ্গামা হতে পারে ভয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হাড় জিরজিরে চেহারার এক হিতৈষী বন্ধু কোমরে খোঁচা দিয়ে আমাকে ইঙ্গিত করলেন, "চলুন দাদা, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা আর মোটেই নিরাপদ নয়। কি থেকে কি হবে

কে জানে। এর পরে হয়ত হাতাহাতি, লাঠালাঠি বোমবাজী

শুরু হবে সভা ভণ্ডুল হল বলে ···

আমার মনেতে কিছু প্রশ্ন খেলে যাচ্ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রোতার মন্তব্য আদৌ অপ্রত্যাশিত নয় অযৌক্তিকও না। এত বয়স হল প্রতি নির্বাচনের সময় কত কি শুনেছি। মানুষের খেদ ক্ষোভ হতেই পারে। হিতৈষীকে প্রশ্ন করলাম, "কী উপায় লোকের বক্তব্যই শুনলেন। ওদের বাক চাতুরীর মধ্যে সুসংহত কিছু পেলেন ? সত্যটা আসলে কি ? পরিশ্রম, সততা আন্তরিকতা আর নিষ্ঠার সঙ্গে রাজ্যশাসন প্রজা পালন না ক্ষমতা দখল—কোনটা উদ্দেশ্য ? কিসের অভাবে নেতারা তেমন শ্রদ্ধা পাচ্ছে না ? সত্য জানতে চেয়েছি তো !

হিতৈষী বন্ধু ভদ্রলোক নীরব নিশ্চুপ—আতঙ্কগ্রস্থ।

এই মূহূর্তে আমাকে নিয়েই যেন ওনার যত ভয় কি কথার উত্তরে কি বলব ঠিক কি !

বয়সের দিক দিয়ে উনি আমার চাইতে ২/১ বছরের বড়ই হবেন। এখন কে আগে যাবে কে পরে এমনই বয়স, অথচ ওনার আচরণ রক্ত চাপ বৃদ্ধির সহায়ক ছাড়া কিছু নয়, "যদি চুপই থাকবেন, আমাকে ডেকে নিয়ে এলেন কেন ? এমন সিঁটিয়েই বা টানছেন কেন ?"

একটু নিরাপদ দুরুত্বে এসে ভয়ে ভয়ে এদিক সেদিক সুতীক্ষ্ণ শ্যেন দৃষ্টি ফেলে অবশেষে হিতৈষী মুখ খুললেন, "মশায় সত্য আবার কি। আমাকে মুখ ফুটে বলাচ্ছেন কেন ? নিজে বোঝেন না ? দল ভারী দলই সত্য। সে আপনার পছন্দ হউক বা না হউক। আসল কথা হল সব শুনে চুপ থাকা চুপ থাকলে কি এমন ক্ষতি ? বেশি ক্ষতি হতে পারে মুখ খুলেছেন মাত্রই। মতে না মিললে প্রতিক্রিয়াশীল শত্রু, হামলা, আঘাত, খতম চেহাবা বদল, কে বাঁচাবে আপনাকে ? দলের তক্‌মা থাকলে পুলিশ ও কিছু করতে সাহস পায়না। নেতারাই অপরাধীদের আড়াল করে। চলুন আর এক মূহূর্তও নয় এখানে। দেখছেন না বাতাস গরম !

এমন হাড় জিরজিরে মানুষ মৃত্যু ভয়টাই ওনাকে পেয়ে বসেছে, "যাবেন তো চলুন, তা না হলে আমি যাচ্ছি, মরতে ইচ্ছা হয়ত আপনি মরুন।"

আরে দুর ! আমি থোড়াই কেয়াব কবি। আমার ক্ষোভ, ক্রোধ বা মন্তব্য প্রকাশের কারণে কোন দল যদি আমাকে খতমের তালিকা ভুক্ত করে করুক না ! তিন কাল গিয়ে জীবনটা শেষ কালে এসে ঠেকেছে. অত ভয় কিসের ? এখন আমার শরীরে যত সব ব্যাধি জমা হয়েছে এমনিতেই আমি ফুড়ুৎ হয়ে যেতে পারি। রাজনৈতিক দুষ্কৃতকারীদের হাতে খতম হলে অন্তত

মনের গভীরে প্রশান্তি অনুভব করব। অপ্রতিবাদে অপশক্তির কাছে নতজানু হয়ে নিরাপদ চতুর আপোস ধর্মী জীবন যাপনের মধ্যে যে গ্লানি আছে, সেই গ্লানি থেকে তো মুক্তি পাব!

অমন অঘটন যদি ঘটেই আমার হিতৈষীদের কেউ কেউ শুনেই হয়ত প্রশ্ন তুলবে, "এনাকে এমন করে মারা হল কেন? ইনি তো রাজনীতি করতেন না। কেন উনি বলির পাঠা হলেন।"

তৎক্ষনাৎ বিরোধী রাজনীতির প্রভুপাদরা ফয়দা তুলতে, "কে বলেছে উনি রাজনীতি করতেন না, উনি আমাদের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। আমরা এ খুনের তদন্ত চাই। পুলিশ কেন নিষ্ক্রিয় ছিল?"

সরকারী প্রভুদের বক্তব্য। ওসব বিরোধীদের ফয়দা তোলার রাজনীতি। ঘটনা যা ঘটেছে তা হল সাধারণ মানুষের ঘৃণা ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ স্বাভাবিক পরিনতি····

বিরোধীরা অমন ব্যাখ্যায় তুষ্ট হবে না আলোড়ন তুলবে। এবং প্রায় অকারণেই আমার মৃতদেহকে ফুলে মান্যে গরিমা ভূষিত করে শোভা যাত্রা সহকারে সারা শহর ঘুরিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাবে দাহ করতে।

আজ বাদে কাল নির্বাচন অনেক ঘটনার মতই এ ঘটনাও দ্রুত মিলিয়ে যাবে ভোটা ভোটির স্রোতে।

একটা মানুষ ছিল, এখন নেই, বড় সামান্য তফাৎ।

এসব অবশ্য অবান্তর কথা। বাস্তব কথা হল একজন বয়ঃক্লিষ্ট মানুষ যদি নিজস্ব ভাবনা চিন্তা স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ করতে সাহস না পায়, নাতির বয়সী ছেলে ছোকড়াদের কাণ্ড কারখানা দেখে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে সিঁটিয়ে থাকতে হয়, তাহলে এটা কী জাতীয় তন্ত্র?

এ তন্ত্র কিসের দিশারী, না স্থায়ী-অভিসম্পাত?

এটা তো সত্যি বা প্রমাণ হয়ে গেছে বা যাচ্ছে যাদের জনপ্রতিনিধি বলা হয় তাদের কর্মকাণ্ড এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে সমগ্র সৎ চিন্তাশীল মানুষদের মধ্যে ভিন্নমুখী প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। কেউ আর এই জনপ্রতিনিধিদের উপর আস্থাশীল নয় কারণ এমন একজনও জনপ্রতিনিধি নেই যিনি কোন না কোন অপরাধে অপরাধী এবং এদেরই দাপট আর দাবড়ানিতে সরকারী আমলা কর্মীরাও বলে যাচ্ছে শয়তানের শিষ্য যারা হয় অশিষ্ট নয়ত সুবিধাবাদী কিংবা শঙ্কাগ্রস্থ বশংবাদ।

এমতবস্থায় কে রক্ষা করবে নিরীহ শান্তিপ্রিয় সাধারণ জনগুষ্টিকে ?

এর বিকল্প কি ?

চিন্তাশীল সমাজপতিদের আন্তরিক ভাবে ভাববার সময় হয়েছে এই টেরিফিক্ তন্ত্রের পরিবর্তক খোঁজার এবং অগোনে টু রেস্টোর রীয়েল ডেমোক্র্যাটিক্ ভ্যালু।

আন্তরিক হলে পরিবর্তন ঘটান অসম্ভব কিছু নয় ☐

অভিজ্ঞান লিপি

অবসর নিয়েছি প্রায় পনর বছর হতে চলল। অবসরান্তে আমার পৃথিবীই অনেকটা লেখালেখি, আমার *Pastime. Entertainment Recreation.*

জোড়াতালি মারা স্বাস্থ্য এখন আমার, ক্রমশ অচল হয়ে যাচ্ছি। ডাক্তাররা কে কিরূপ চিকিৎসা করেছে, কে কি দাওয়াই দিয়েছে—নানা চিকিৎসার নানা সব দাওয়াই খেয়ে হজম করে, জেনে বুঝে আমি এখন নিশ্চিত আমার আধি-ব্যাধির দায়িত্ব আমার নিজস্ব। ওরা আমার কোন উপকারে আসেনি।

বর্তমানে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হলেও অসুখের ব্যতিক নেই। বুড়ো হয়েছি, শ্যারিরীক ভাবে হয়ে পড়েছি দুর্বল এসব মেনে নিলেও আমি এখনও আছি, এবং যতদিন থাকব আমি আমার এই লেখালেখি নিয়েই থাকব। এবং এই লেখালেখিই আমার জীবনের ছন্দ—স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গী। আমার রোগ শোকের মহৌষধ—বার্ধক্যের যৌবন।

যা লেখ্য তা সাহিত্য নাও হতে পারে অথবা বলা চলে আমার সাহিত্যিক হবার বাসনা স্পর্ধা মাত্র। তবু আমি লিখি এবং মনে হয় আমাকে আরও অনেক কিছু লিখতে হবে। আবার মনে হয় যে লেখাটা আমি মাত্র কিছুদিন আগে শেষ করেছি সেই লেখাটাই পুনরায় ভিন্নভাবে লেখার বা নতুন করে সাজানো বিশেষ প্রয়োজন।

পুরণো লেখাগুলু সম্পর্কেও ঐ একই কথা। সেই কবে থেকে লেখালেখি শুরু করেছি। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর। এত বছর যা যা লিখেছি লিখে লিখে যা অভিজ্ঞতা জমেছে তাতে প্রতিদিন পাল্টে গেছে চিন্তার ধারা, ভাষার ধরণ, স্টাইল, সাথে সাথে লেখার ধারাও, কিছুটা পরিণত।

প্রথম দিকে আমার প্রায় সব লেখায় ভবাবেগের আধিক্যই ছিল *Significant factor*। বয়স আর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হওয়ার মনটা পেরিয়ে এসেছি, তাই ওসব ভাবাবেগের লেখা সব বাতিলের তালিকায় ফেলে রেখেছি এই ভেবে যদি সময় পাই তাহলে পরিশীলিত পরিমার্জিত করে পাঠকদের উপঢৌকন দেব। সেটা কতটা সম্ভব হবে ভবিতব্যই প্রমান দেবে। প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে এক কালের অফুরন্ত জীবনী শক্তি নিজেই এখন খরচের খাতায়। থাক্ সেসব কথা। আসল কথায় আসা যাক্।

ক্রিয়েটিভ্ লেখালেখি কি জিনিষ আমি ঠিকমত বুঝিনা। তবে এটা বুঝি প্রকৃত লেখক কখনও বাস্তব বিমুখ হতে পারে না। লেখককে চোখ বন্ধ করে চললে হবে না। চোখ খুলেই সব দেখতে হবে, দেখাতে হবে বর্ণনার দক্ষতায়।

আমার সব লেখাই জ্ঞাতে কিংবা নজ্ঞাতে দেখা ঘটনা—অপরের বা নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে লেখা। আসল কথা লেখার আগে মনোনিবেশ করা অনেক চিন্তার পর প্রত্যক্ষ দর্শন ও বিচার বিশ্লেষণের পর লেখা।

একটা রচনা কতটা কি হবে, কিংবা কি হবে, কিংবা কি হতে কি হবে, তা নির্ভর করে মন মর্জি অভিপ্রায় আর জীবন দৃষ্টির উপর।

যে কোন লেখক যে মাপেরই হোক, সুখী বা দুঃখী যাই হউক না কেন, জীবন রসিক না হলে সার্থক ভাবে লিখতে পারে না।

আমি জীবন রসিক বা সার্থক লেখক কতটা সে বিচার আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে আমার সারা জীবনের শ্রম, পণ্ডশ্রম ক্লান্তি, আশা আকাঙ্খা আনন্দ আহ্লাদ, হতাশা ব্যর্থতা শোক তাপ ইত্যাদী প্রভৃতিতে ভরে আছে আমার সাহিত্য চর্চায়। একাকীত্ব আমাকে বিমর্ষ করে না।

আমাব রচনাগুলি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য না হতে পারে কিন্তু এই চর্চা আমার মানসিক বা শারিরীক যন্ত্রনার উপর কিছুটা প্রলেপ দেয়। আমি স্বচ্ছন্দ চিত্তে থাকি, মননেও গভীরতা জাগায়।

লিখতে বসে আমি অনেক কিছু ভাবি, মনেও আসে অনেক কিছু কিন্তু সাজানোটাই কঠিন, অথচ সাজানোটাই আসল। সাজলেও মননের সঙ্গে তাল রেখে অনেক কিছু লেখা সম্ভব নয়। লেখার সময় বাহ্যিক গোলমাল বা উপদ্রব হয়েছে তো লেখায়ও গোলমাল অবশ্যম্ভাবী ফলে অভিপ্রেত লেখা হয় না কিংবা অনেক কিছু বাদ পড়ে যায়।

বাদ পড়ার অন্য কারণও আছে, আমার চিন্তা লেখার চেয়ে দ্রুত। লিখতে লিখতে অন্য চিন্তা এসে গেলে লেখাতেও ত্রুটি দৃষ্ট হয়। তখন আবার প্রথম থেকে শুরু।

তা যা হোক অনেক কথা সত্য, অর্ধসত্য, অথবা নির্দোষ অসত্য কিংবা কাল্পনিক যাই হউক না কেন বিনোদনই প্রধান উপলক্ষ্য।

তাহলেও কিছু তো সৃষ্টি হয় এবং সৃষ্টি হলে উল্লাসও জাগে।

সেই সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মনেতে একটা আকাঙ্খাও চাড়া দিল একটা সময় স্থানীয় পত্র পত্রিকায় ছাপাতে দিলে কেমন হয়!

ছাপালে কারও ভাল লাগুক আর না লাগুক অন্ততঃ নিজের ভাললাগার কথাটা তো জানান যায়।

কিন্তু বিনা পৃষ্ঠপোষকতায় পত্র পত্রিকায় ছাপানও সম্ভব নয়।

অল্প স্বল্প বৈপরীত্যের বীজ সকলের মধ্যেই থাকে আমারও আছে, চুল চেরা বিশ্লেষণ না করেই বলা তায় আমি স্বভাবে আত্মাভিমানী। আমি ক্যানৃভ্যাসারের মত পত্র পত্রিকা অফিসে অফিসে গিয়ে খোশামোদ করে বলতে পারিনা আমার লেখাটা ছাপার যোগ্য হলে অনুগ্রহ করে ছাপালে আমি বাধিত হবো। এ জাতীয় হ্যাংলামিতে আমি নেই। আমি ভিন্ন ধাতুতে গড়া।

তবে কেউ যদি সাগ্রহে আমার লেখা কোন রচনা চায় আমি প্রত্যাখ্যান করি না। কারন আমি অনুভব করি সাহিত্য চর্চায় এবং তার উৎকর্ষতার প্রয়োজনে শ্রোতা পাঠকও সমালোচক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লেখকের কৃতিত্ব সেখানেই যেখানে তিনি নিজে কোন বিষয় নিয়ে ভাবেন এবং সেই ভাবনা থেকে পাঠকের চিত্তেও তেমন ভাবনার জাগরন ঘটতে পারে।

এই জাগরনের অর্থ এই নয় যে সব সময় পাঠক নির্বিচারে লেখকের মতামতে সায় দেবে! পাঠকের মনেও লেখকের রচনা থেকে আর নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে।

আবার *Vicc-versa*। অর্থাৎ পাল্টা ভাবে লেখকও উপকৃত হয়।

বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে আত্মাভিমানী হওয়া মনুষ্য স্বভাব সুলভ।

আমি স্পষ্ট বক্তা, মনে মুখে এক। লেখায়ও তেমনটি আমার মধ্যে কোন লুকোচুরি নেই। আমি যা দেখি, শুনি, বুঝি সবই অকপটে লিখি। সে কারণে আমার লিখিত প্রবন্ধ নিবন্ধ বা গল্পাদির ভাল মন্দের জন্য যা কিছু প্রশংসা নিন্দা আমারই প্রাপ্য।

আমি হয়ত যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে অনেক কিছু প্রকাশ করতে পারি না এতৎ সত্বেও ওয়াকিবহাল মহলে আমি শুধু একজন বৃদ্ধ হিসাবে নয়। একজন লেখক হিসাবেও পরিচিত বটে।

মানুষ অভ্যেসের দাস। নিয়ম মেনে লেখা অবশ্যই একজন সার্থক লেখকের প্রথম পরিচ্ছদের প্রথম কথা।

আমি অভ্যেসের দাস হলেও আমার অনেক রচনাই ব্যাকরণ বহির্ভূত কাজ। কারণ আমি তো স্বরস্বতীর বরপুত্র নই।

বরপুত্র না হলেও বয়স সহজ জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার দরুণ ইচ্ছামত লিখতে সাহস পেয়েছি পাইও।

বিভক্ত বাংলার টালমাটাল অবস্থায় অনেক কিছু ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সহজ জীবন যাত্রায় সেই সব সার্বোক ঐতিহ্য বহাল থাকল না। যদি দেশ ছাড়া না হতাম তাহলে পরিবারের সবাই এক সঙ্গে শেষ হয়ে যেতো। দেশ ছেড়ে বেঁচে গেলেও যে ক্ষতি হয়ে গেল তা আর পূরণ হলো না। জীবনটাই হয়ে গেল দিক দিশাহীন। অনেক কিছু সামলাতে হিমসিম খেতে হয়েছে। সে সব কাটিয়ে থিতু হতে, ভুলে যেতে, কেটে গেল কত বছর।

জীবিকান্বেষণে, জীবিকা নির্বাহে সমগ্র পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঠেকে ঠেকে হোঁচট খেয়ে খেয়ে মস্তিষ্কে অনেক কিছু সংগৃহীত হলো।

বিনা পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক স্ট্রাগেল করে টিকে গেছি। তবে কঠোর অভাবেও আমি খোশমেজাজী সদাহাস্যময় ও আমোদ প্রিয় ছিলাম। অর্থনৈতিক জীবন যাপন করা আমার স্বভাবে নেই। ইয়েট আমি লোন্ ফিল করতাম। আর লোনলিনেসে অনেক কিছু ঘটে। লোন্-ম্যান ইজ ইজি টার্গেট।

হ্যাঃ তেমন টার্গেট হয়ে আমার চিত্তও অস্থির হয়েছিল। সবই অসতর্ক মুহূর্তের মোহ-মায়াজাল, যার অন্য নাম প্রেম।

প্রেম করা বা প্রেমে পড়া মোটেও শ্রমসাধ্য নয়। নারী-পুরুষের চৌম্বক শক্তির কম্পনেই প্রেম সৃষ্টি হয়। ওটা বয়সের দমকা। আর যৌবনের তেজে ঝাঁঝ বাতাসে নড়ে—বসন্ত বায়ু।

অর্থাৎ স্ত্রী পুং যোগাযোগে এক সঙ্গে হলে একটা ইচ্ছাই জাগে। যাদের ইতঃস্তততা বেশি অথবা যারা আনাড়ি তাদের সময় লাগে -থামাকা সময় নয় অন্যথায় স্বাভাবিক, সহজাত-প্রকৃতিগত।

প্রেমেতে কে যে কখন কার পাশে এসে যায় কিছুই বলা যায় না।

আমার চিত্ত যে সব বান্ধবীদের খিদে চঞ্চল হয়েছিল এক কথায় অপ্রত্যাশীত। অপ্রত্যাশীত হলেও ভাল লাগার ফুঃ দিতেই ছুঃ মন্তর ছুঃ বশ্য শিষ্যার মত বশীভূত। আর তা হতেই বন্দনার প্রবাহ, স্বতঃস্ফূর্ত মধু মিলন, মনজুড়ে চুম চুম পাল্টাপাল্টি, প্রানবন্ত মস্করা খুনসুটি। গুজ গুজ-ফুস্ফুস্ ফাঁকে ফিকিরে মৃগয়া—স্বপ্নদর্শন। *I promise to give you heaven, I promise to take you to paradise*· ইত্যাদী প্রভৃতি -এবমস্তু। হৃদয়ের মামলা বিচিত্র ঘটনা। আনন্দের চেয়ে উদ্বেগ বেশি।

অজানা রহস্য আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। তবে দিশেহারার মধ্যেও কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়নি। বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতে ভেসে যাইনি। কোন হঠকারী কাজই নয়। ঢিলে ঢালা হলেও শৃঙ্খলার রেখাতেই আলস্যের ছোঁয়া, পেট ভরে ঢাকবার দলে পড়ি না আমি। আমি বরং মরে যাব ভেসে যাব না। এ ছিল আমার মনের গতি।

তবুও এতেই আমার মনে স্ফূর্তি এসেছিল মনকাড়া ছন্দের লহরায় বুকটা স্ফীত হয়েছিল।

কিন্তু তখন সময়টা আমার মোটেও অনুকূল ছিল না। প্রেম করার অধিকার থাকলেও বিবাহ করে সংসার পাতার এলেমই ছিল না। অভিভাবকদের বিনা পৃষ্ঠপোষকতায় বিবাহ সম্ভব নয়। ফলে ভালবাসার ফুঃ ফুড়ুৎ হয়ে গেল। প্রেমিকারা হাত বদল হয়ে যেতেই প্রেমেরও মৃত্যু। হর্ষ থেকে বিষাদ। মনে জাগিয়ে তুলল উদাস করা বিমর্ষতার অনুভূতি।

ঠিক হয়েছে, এটাই দরকার ছিল। আসলে ধাক্কা না খেলে বাস্তব বুদ্ধি খোলে না। সমাজে থেকে সামাজিক সন্ন্যাসী থাকা চলে না। ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে আমি বিবাহ করলাম। বহ্নিকে ঘিরে পতঙ্গের জীবনের কোন অর্থই নেই—বিবাহ যথার্থ পথ।

প্রেম আর বিবাহ *quite different.* বিবাহটা আমাকে ল্যাজে গোবরে করে দিল। স্ত্রী সন্তান ধারণ করল। পিতৃত্বের সুখ কল্পনা স্বপ্নেই মরে গেল। সন্তানরা কেউ সূর্য দর্শন করল না। উৎসাহের আগুনে চুস করে জল। আমি কাঁদতেও ভুলে গেলাম স্তম্ভিত হলাম নৈরাশ্যে। সঙ্গে যুক্ত হলো স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে নানাবিধ *complications*. আরও কত সমস্যা! হে ভগবান!

বিপদের সময় ভগবানও ঊর্ধ্ব থেকে সাহায্য পাঠায় না।

নিজের শক্তিই আসল শক্তি।

এত বছরে জীবনে কত কি ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটল। ভুলে যেতে চাই অনেক কিছু, কিন্তু ভোলা কি সম্ভব? সময়ে অসময়ে বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন যেন মোচড় দেয়। লেখা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায় ওসব কথা উল্লেখে বিরত থাকলাম।

জীবনের প্রকৃতি এতই জটিল যে হাজার বিশ্লেষণেও সব লেখা সম্ভব নয়। অনেক বিড়ম্বনার অভিজ্ঞতা সাফল্য ব্যর্থতা মনের ঝুলিতে ভরে আছে। কত লিখব? কেই-বা পড়বে? তার চেয়ে ওসব বিস্তার থাক।

আসল কথা হল, যে কোন ঘটনার একটা ধাক্কা আছে. তেমন ধাক্কার বেহাল অবস্থা সামাল দিতে লেখা লেখির প্রয়োজন।

জীবনে কয়েকটা মাত্রই গোল্ডেন মোমেণ্ট আসে বাদবাকী-সবই স্মৃতি রোমন্থন। বাকী জীবনের ব্রত।

জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি, এই আছি, এই নেই অবস্থা। দেহের ওজন কমে যেতে যেতে এমন জায়গায় এসে ঠেকেছে কল্পনা করা যায় না। তবু আমি বেঁচে রয়েছি এই লেখালেখির দৌলতে।

বর্তমানে ইট্ ইজ পার্ট অব মাই লাইফ। আমার অস্তিত্ব। তবু ভাবি জীবনের সব কিছুর গভীরে যাওয়া কি সম্ভব? কত সমস্যা কত অজানা বা ভয়ানক ব্যাপার স্যাপার গোপন গুপ্ত তথ্য, কত প্রশ্ন, কত বিচিত্র চরিত্রের মানুষ সব বিশ্লেষণ করতে গেলে কত কথপোকথন! সব লিখতে গেলে লেখার শেষ নেই।

শুধু লিখলেই তো চলবে না, পুরো গ্রন্থনা ঋজু হতে হবে বিশ্বাস যোগ্য ভাবে মনোরম হতে হবে। কারণ মোটা মুটি আমি সত্য ঘটনাই লিখি. যা বাস্তবে ঘটে। যা যা দেখেছি। .

স্বীকৃতির জন্য মাথা কুটতে ইচ্ছা কখনই জাগেনি, এখনও জাগে না। লেখা লেখি আমার কাছে নিসেঙ্গতার সুখ। তবে কেউ যদি আমার লেখা পড়ে বলে "বেশ হয়েছে" তখন যে আনন্দ হয় সে এক আলাদা ব্যাপার, নেহাৎ মামুলী নয়।

কিছু সাধুবাদ যে কপালে না জুটেছে তা নয়, আবার কেউ নিয়ম রক্ষা ভাবে বলেছে, "ভালই তো লিখেছ, চালিয়ে যাও।"

মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই। "যা হচ্ছে তা যথেষ্ট নয় আরও চাই আরও ভাল করে চাই" এ দাবী বা মন্তব্য যে কোন সময় যে কেউ করতে পারে। তাহলেও যেটুকু হচ্ছে সেটুকু কিছুই হচ্ছে না বলে তেমন মন্তব্য কেউ দেয়নি।

আমার সাহিত্য কর্মের সঙ্গে পরিচিত কয়েকজনার সঙ্গে যে সব কথার আদান প্রদান হয়েছে তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই মন্তব্য হল, "লেখাগুলু বেশ সমৃদ্ধ

সাবালকত্বে পুষ্ট এবং প্রত্যেকটি আপন আপন চরিত্র ধর্মে বিশিষ্টতার দাবী করে”—এমন কদর পেয়েছি।

কদর পেলেও সাহিত্যিক হিসেবে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ আমার হয়নি। তেমন স্বপ্নও আমি দেখিনি। স্পর্ধাও হয়নি।

নানা নৈরাশ্যের মধ্যে ঘূর্ণিপাক খেয়ে চাকুরিতে প্রবেশ—সরকারী চাকুরী।

চাকুরিতে অনেক রকম হেপা-ঝক্কি। সরকারী কাজে অফিসারদের যতই গুরুত্ব থাকুক না কেন, কত না ভান ভণিতা, ছল চাতুরি, কৌশল প্রয়োগ, গোটা ব্যাপারটাই পাজেলের মত। কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতাও মনেতে সংগৃহীত হল। লেখার রসদও পেলাম।

নেতাদের বচন অমৃতসমান। বাইরেতে সরল কিন্তু ভেতরে অনেকবৈপরীত্য, কেবল মহিমাময় নয় প্রতাপও বিস্তর সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে এদের তুলনা হয় না। সে আর এক অধ্যায়।

এক এক জনার চেহারা দেখে কথা শুনে মনেই হয় না উনি এমন কোন অপরাধ মূলক দুষ্কর্মে লিপ্ত হতে পারেন এমনই সাদা মাটা, প্রাজ্ঞতার প্রাখর্যও কম নয়। কিন্তু ঐ কথায় আছে না যাহা রটে তার কিছু তো বটে, তাই পণ্ডিত ব্যক্তিটা সমাজেও নানা সন্দেহ থেকে যাচ্ছে. কত যে কলঙ্কের মাটি লেগেছে কার গায়ে ঠিক নেই মুখে প্রশংসাগুণী হলেও চাল চলনে কর্মকাণ্ডে রাজন্যবৎ।

এদের লেজুর ধরে যা চামচা গিরি করে কত দুষ্কৃতকারী যে পার পেয়ে যাচ্ছে ঠিক নেই। এদেরই প্রভাবে বুদ্ধিজীবি টপ পাইদেরও স্বভাব বা আচরণে অনেক ওলট পালট। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ঘন ঘন সিদ্ধান্ত বদল—জো হুকুম স্যার, ইচ্ছামত নড়কে হয়, অযোগ্যকে দিতে পারে যা খুশি, আবার যোগ্য ব্যক্তিকে দিতে পারে ‘কেটে পড়’ আদেশ।

আসলে সার্ভিস নয় সেবার নামে কৌশল প্রয়োগ। সুরুচি কুরুচি বলে কিছু নেই—ক্যারিয়ার সর্বস্ব।

কাকে ছেড়ে কার কথা বলব ? কেউ কম নয়, কিছু কম নয় ওস্তাদ কা ওস্তাদ। মুখে পটিতং জগৎ। ভাবমূর্তি কার কতটা ক্ষতি হল তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নাস্তি। সম্মানজনক রেকর্ড অনেকেরই নেই।

দীর্ঘ ত্রিশ বছরের চাকরির জমানায় অনেক অভিজ্ঞতা হল। অনেক খণ্ড চিত্র বা কিছু কিছু মানুষের স্কেচ্ ফীচার লিখে হাতও পাকিয়েছি, কিন্তু কোন পত্র পত্রিকায় ছাপতে দেইনি। চাকুরির বিধি লঙ্ঘনের জোরালো অভিযোগ উঠতে পারে ভয়ে। কে কীভাবে রী অ্যাক্ট করবে কে জানে। পাগল না মাথা খারাপ !

তার চেয়ে ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে সামনে দেখ আর নিজের কাজ নিজের ভাবে করে যাও। কায়মনোবাক্যে দুষ্কৃত না করার অভ্যেসই যথার্থ জীবন যাপন তার জন্য তেল-তোয়াজ-মোসাহেবীর কোন প্রয়োজন নেই। কার কী নীতি বা রাজনীতি—আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল বা মাথা ব্যথা ছিল না।

চাকুরি তো আর গবেষণা নয়। যা যা পড়েছি হিস্টরী, ইকনমিক্স, লিটারেচারের কিছু কি আর চাকরিতে লাগে। সাধারণ বুদ্ধিই যথেষ্ট সঙ্গে কর্তব্য পরায়ণতা আর দায়িত্ব বোধ নিয়ে তা পালন। ইংরেজী বিদ্যাও ফলাতে হয় না *With reference to your Memo No, So and So, I am to State that .....*এ জাতীয় চিঠির উত্তর প্রত্যুত্তর বাঁধা গতানুগতিক ধারা—*Monotonous*।

তবে *Tour* ছিল বলে একঘেয়েমিটা বিরক্তিকর ঠেকেনি—*Inspection, Supervision*। তেমন কিছু মনে হলে আকস্মিক।

এই জটিল লোকতন্ত্রে কে কি করছে, কে আন্তরিকতায় স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে, কে নানা ফন্দি-ফিকিরে স্বভাব নষ্ট করে ফেলল, কে খবর নেয় বা দেখে ? আমি নিয়েছি, দেখেছি। এবং দেখে কিছু অন্তর্দীপন ঘটেছে—অন্তর্দৃষ্টি।

সংসার যেমন আছে, পাপ পুণ্যও আছে। মৃত্যুর পূর্বেই যে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী স্বর্গফল নরকফল লাভ-এমন কথা সেই ছোট বেলা থেকে শুনে আসছি।

কেন এ বিশ্বাস ? কারণ নেই তেমন। উল্টোটাই তো দেখছি। অনন পরম্পরাগত বাক্যে আমি বিশ্বাস হারালাম।

পাপ করা একটা সাধারণ ইস্যু, এতো হৈ চৈ করার কিছু নেই। দুনিয়া এখন অনেক প্রগতিশীল, অনেক পারমিসিভ। দেখে দেখে মানুষের সহনশীলতা বেড়েছে। ট্যা ফ্যা করেছ তো গেছে।

ঠেকে ঠেকে সহনশক্তি আমারও বেড়েছে।

জীবনের *best Pericd*টা এভাবেই গেল।

অতঃপর প্রচুর সময় মনের মত লেখার—মনের কথা লেখার। লেখা-লেখির ভিতর দিয়েই *I am enjoying the life*। ডুব জলে শ্বাস প্রশ্বাস চলতে থাকলেও এই লেখা লেখিই আমার কাছে তীব্র ভেষজ।

আমি পাগল নই, কিন্তু আমার কিছু ছিট্ আছে, তার মধ্যে প্রধান হলো ১৯৯১ থেকে প্রায় ফি বছর আমি স্বউদ্যোগে নিজ খরচায় একটা না একটা বই ছাপিয়ে প্রকাশ করে চলেছি। উদ্দেশ্য সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে রেখে যাবার।

অবসর নিয়েছি কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে আসা উপার্জন কমেনি। টাকা রোজ-গারটা এখন আমার কাছে অর্থহীন। কারণ টাকা খরচ করার পথ আর এখন আমার নেই। টাকা এখন সব ব্যাঙ্কে জমে যাচ্ছে। এত জমিয়ে হবেটা কি ? নিজেই এখন খরচের খাতায়—ক্ষুৎ পিপাসাই গত। চালচলনে সেই ফুল বাবুটি আমি আর নই।

ইতিমধ্যে আমি তিন তিনটি বইও ছাপিয়ে ফেলেছি 'নঞতৎপুরুষ' 'বিচিত্র সন্দর্ভ' ও অনুভব-অন্বেষণ' এই নামে।

দোকানে দোকানে যে সব বই বিক্রীর জন্য দিয়েছি লাভ হল অষ্টরম্ভা। আজ কাল কেউ বড় বই কেনে না। বিবাহ ইত্যাদীতে বই উপহার দেওয়ার রীতি রেওয়াজও গত ! বিনা পৃষ্ঠপোষকতায় বই বিক্রী সম্ভব নয়।

Yet, Books are the best gift.

কী জানি কেন আমার মনে হয় আমার প্রকাশিত বই যাদের আমি উপহার দিয়েছি তাদের অনেকেই পড়েনি।

দু একজনকে জিজ্ঞেস করেছি "আমার বইগুলি পড়েছ ?"

উত্তর পেয়েছি, "সময় পাইনি। পড়লেই তোমাকে মন্তব্য দিয়ে চিঠি দেব।"

মনটা সঙ্গে সঙ্গে তেতে উঠল, "না, আর পড়তে হবে না, যার এত দিনেও পড়া হলো না, তার কোন কালেই পড়া হবে না অপাত্রে উপহার দান।"

আমার বই পড়া মানে সময়ের অপচয়।

তবে সুখের কথা বিদগ্ধ মহলে আমার তিনটি বই-ই সমাদৃত হয়েছে। এবং মন্তব্যও দিয়েছে কেউ লিখে, কেউ সাক্ষাৎমত বাচনিক ভাবে, কেউ টেলিফোনে।

তাহলে কিছু কথা সাজিয়ে বলতে হয়। তবে যেহেতু এটা নিয়ম মাফিক লেখা বা বৃত্তান্ত নয়, তাই পরের কথা আগে, আগের কথা পরে উল্লেখ করলে ক্ষতি নেই।

তা হলেও কার কথা আগে লিখব ? সবাই যে আমার সুহৃদ প্রতীম।

বিশ্ব বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধী প্রাপ্ত শিক্ষাবিদদের কথাই আগে উল্লেখ করতে হয়। যারা বাড়ীতে এসে স্বহস্তে লিখিত মন্তব্য আমার হাতে দিয়ে গেছেন,

তা সংক্ষেপে এই রূপঃ-লেখক শ্রী দত্ত পরিণত বয়সেও নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন—এখবরটা গ্রন্থপাঠে ও গ্রন্থক্রয়ে উদাসীন সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে রীতি মত লক্ষ্য করার মত ঘটনা…প্রায় প্রতি বছরই উনি একখানা করে বই পাঠকদের উপহার দিচ্ছেন।…এক এক জনার রচনার স্টাইল এক এক রকম যদি কেউ স্টাইলে পৌঁছন শ্রীদত্ত পৌঁছেছেন ব্যক্তিগত দৃষ্টি ভঙ্গি, বর্ণনা ও রচনা কৌশলে। একটা কৌতুক প্রিয়তা জীবনের রূঢ়তা, দীনতা, মান-অপমান, জয়-পরাজয় সব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নিজেরই অভিজ্ঞতা বা উত্তম পুরুষে

লেখা কোনো চোখে দেখা বা কোনোও ভাবে জানা ঘটনা, এসব নিয়ে রসিকতা, বিমল হাস্য রস, ব্যঙ্গ, কোথাও শ্লেষ-কিন্তু সব কিছুকে গায়ে না মেখে হেসে বেরিয়ে যাওয়া শ্রীদত্তর বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যটুকু চারটি খানি কথা নয়।···স্টাইলে এবং বাগধারায় শ্রীদত্ত একজন সফল লেখক····।”

দ্বিতীয় শিক্ষাবিদের মন্তব্য. “সুহৃদবর শ্রীদত্ত তিন খানি বইতেই তার অনুপম উদ্ভাবনী শক্তি, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার নিদর্শন রেখেছেন, সরল সহজ লেখার ধারা, ঝর ঝরে কৌতুক স্নিগ্ধ ভাষা যার লিটারেরী ভ্যালু অমূল্য।”

সুক্ষ্মরূপে পড়ে পড়ে বিশ্লেষণ করে মন্তব্য দিয়েছেন আমার এক ঘনিষ্ঠ স্বজন প্রতিটি রচনার অ্যাগেটনস্ট-এ সংক্ষিপ্ত ভাবে :

কোনটায়—*Positive Note* দিক্‌নির্দেশক।

কোনটায়—সংযত, ব্যঞ্জনা পূর্ণ। *appealing*।

অপরটায়—*Humour of pathos* উপভোগ্য।

আর একটায়—*Fantastic* কিংবা *Fascinating*

আবার অন্যটায়—*universality*,

আবার যেগুলু ভাল লাগেনি তাও *critically* উল্লেখ করেছেন। আবার *Best* বলেও চিহ্নিত করেছে দু চারটায়। চলন সই বা ভাললাগেনি লিখলেও শেষে বলেছেন বাস্তব বর্জিত নয়।

চিঠি দিয়ে অনেকে লিখেছে. জমাটি লেখা, বাস্তব চিত্র পড়ে মজা পেলাম মনোরঞ্জক মশলার আয়োজন ও পরিবেশন প্রচুর।

ব্যক্তিত্বের বিচারে ওজনদার বিজ্ঞানী যে আমার ভাই হয়েও স্রেফ্ বন্ধু টেলিফোনে মন্তব্য করেছে “লেখাগুলু বেশ ভাল লেগেছে রে, পণ্ডিত প্রবর জ্ঞানরস আমার অগ্রজ মন্তব্য দিয়েছেন তার লেখার ওভার অল একটা ছন্দ আছে।”

মোট কথা এমন বিদগ্ধদের কাছে আমার লেখা ভাল লাগাটাই একটা খুব বড় খেতাব পাওয়ার তুল্য তবে যারা মন্তব্য দিয়েছেন তার থেকে যারা মন্তব্য দেন নি তাদের সংখ্যাই বেশি।

ঈর্ষার কারণে কিংবা অতি দেমাকে অথবা অতি ব্যস্ততার দরুন অনেকে মন্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকাটাই যথার্থ ভেবেছেন। অনেক সংকোচের সঙ্গে এড়িয়ে যেতে বলেছে ওটা তো *Book Reviewer* দের ব্যাপার।

আকারে রুক্ষ, প্রকারেও রুক্ষ কিন্তু বিদুষী এমন এক মহিলাকে টেলিফোনে অনুরোধ করেছিলাম, "আমার বইগুলি পড়ে রিভিউ দেবেন?"

"ওরে ব্যপরে! এখন আমার খাতা দেখার সময় ভীষণ ব্যস্ত অন্য কাউকে বলুন"—আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

এমন সরাসরি অস্বীকার করেছেন।

ব্যাপারটা হাস্যকর, অস্বস্তিকরও বটে, অনেক প্রশ্ন আর কৌতুহলে অনেক রহস্য মনেতে জমে যায়, সে সব নিয়েও অনেক কিছু লেখা চলে। অমন চাষা ছোলা কথায় কিছু ক্ষোভ যে না জমেছিল তা না। তবে বড় সাময়িক।

আর এক রমনী যে একসময় অসাধারণ লাবন্যময়ী ছিল, ছিল যৌন বিলাসী। এখনও তার চোখের খরতা শরীরের গঠন থেকে প্রতীয়মান হয়। যার অন্তরাল জীবনের অসংখ্য ঘটনার সাক্ষী আমি যদিও বর্তমানে সম্পর্কটা নাতি নিকট। নাতি দুর—তার বয়ান হল। "তোমার প্রেমাখ্যান গুলিতে যৌন সম্পর্কের প্রাধান্য আছে। খোলামেলা লাভ টক্—এই আমার মত অন্য লোকের ভিন্ন মত থাকতে পারে···"

কথাগুলু অন্যে বললে গায়ে লাগত না। কিন্তু ওর কথাতে আমার প্রতিক্রিয়া হল। যে এক সময় দ্রুত প্রেমিক পাল্টাত। নানা লঘু এবং তরল ভঙ্গিমায় নানা খেল দেখাত যা চিত্রহার—চিত্র মালার বা টিভি'র বিজ্ঞাপন কে হার মানে তার বচনে এমন সুর! আশ্চর্যই তো!

মনের অনুভূতি তিক্ত হতেই আমারও মন্তব্য হল "তোমার মত মতের দাম আমার কাছে মূল্যহীন লিভ্ মী অ্যালোন।"

বিলাসিনীর চোখে একটা কুটিল ভাব দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল, এরপর যেভাবে তাকাল মোটেও প্রেমপূর্ণ নয়।

আসলে প্রেম একটি মূল্যহীন শব্দ মাত্র। সময়ের ব্যবধানে কে কার হয়ে ক্রমশঃ মোহমুক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক।

আর এক বিদ্যাকন্যাকে, "আমার বইগুলির কোন্ কোন্ রচনাটি তোমার ভাল লেগেছে?"

উত্তরটা কি হতে পারে আমার জানা নেই তা নয়, তবু আমি তার মুখ থেকে শুনতে চাই। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাবে তার পাল্টা প্রশ্ন হল, তুমি উপন্যাস লিখতে পার না?"

"তা কেন পারব না, তবে কি জানিস এত বছর, যা দেখলাম, জানলাম, শিখলাম তদ্দরুণ কতটা সাফল্য আর কতটা ব্যর্থতা সে সব যদি লিখতে হয় লেখার শেষ নেই। তবে উপন্যাসের উপাদান ও সযত্নে গোপন করে রেখেছি, এবং তা যখন লিখতে শুরু করব তোর কথাও থাকবে একটা বিশেষ পর্বে ইউ ওয়েয়ার মাই লাস্ট অ্যাণ্ড লস্ট কেস। তা হলেও তোর কথাই আগে লিখব কারণ তুই ছিলি মনোরম ভাবে ফাস্ট ফরোয়ার্ড, তাণ্ডব চরিত্রে নাম্বার ওয়ান, তোর সাবস্টিটিউট্ আর পাইনি যদিও মধুরেন সমাপয়েতের কাছাকাছিও পৌঁছতে পারিনি, শুধু ছক্ বেছকে খুনসুটির কুৎকার—উদারা মুদারা উৎসুকতা আর উৎকণ্ঠা। আশ্চর্য, আশ্চর্য সে সব দিনের স্মৃতি এখনও ভারী টাটকা, লিখব তুই আর আমি কতটা ভিন্ন আর কতটা অভিন্ন ছিলাম সেই সব গুপ্ত কথার উপাখ্যান থাকবে আমার পরিকল্পিত উপন্যাসের একটা পর্বে।"

আমার বক্তব্য শুনে পলকহীন খর চোখে তাকিয়েছিল সেই বিদ্যাকন্যা নিঃশব্দ অথচ চোখের রেনুতে অনেক শব্দের সার, "মাই গড্! ইউ আর

ডেঞ্জারাস।' "রীয়েলি ! ইউ ওয়েয়ার ইকোয়্যালি ডেঞ্জারাস, তোর জবাব নেই।"

এই যাঃ আমি কী লিখতে কি লিখে ফেললাম !

থাক্ ইয়াকি থাক্। আই বেগ টু বী একস্ ফিউ জড্।

পাঠকদের স্বাভাবিক প্রবনতা হল লেখকের লেখার সঙ্গে তার জীবনের মিল খুজতে চাওয়া। উত্তম পুরুষে লেখা অর্থাৎ আমি'র বয়ানে লিখলেই ওরা ভাবে নিজের গোপন কৃত্তি সব প্রকাশ করছি। সে কারণেই আপন কথা লেখা, অপরের কথা লেখার চেয়ে কঠিন।

নিজের কথা লিখতে গেলে অহং অতিকায় রূপ পরিগ্রহ করে সামনে দাঁড়ায়।

উপলব্ধির বিশ্লেষণে বাস্তব একটা কথা আমার মগজে। আমার লেখা পড়ে কে কি বিচার করল বা না করল কিংবা অবিচার করল সে সবের দিকে লক্ষ্য রেখে লিখতে গেলে লেখা এগোয় না।

নিজের লেখার উৎকর্ষ নিয়েই নায্য গর্বে গর্বিত থাকতে চাই সে লেখা যেমনই হউক।

তাই আমার লেখা লেখি নিয়ে কার কি মত জানতে আমার এখন বিন্দুমাত্রও কৌতুহল জাগে না। আমি এ নিয়ে আছি এবং বেশ আছি। পড়া আর লেখা চালিয়ে যেতে না পারলে বেঁচে থাকার কী মানে ?

স্বাস্থ্য হানি জনিত কারণে আমি ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হতে চলেছি। এ অভ্যেসটাও যদি কোন কারণে বন্ধ হয়ে যায় কিংবা আমি লেখা লেখিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলি তাহলে আমি কি নিয়ে বাঁচব ? বেঁচে থাকাটাই মনে হবে বৃথা। এই যেন সেই কবে মৃত্যু হবে বলে আগে থেকে শুয়ে থাকা। তখন আমাকে হঠাৎ মৃত্যু বা অপমৃত্যুর কথাই শুয়ে বসে প্রার্থনা করতে হবে।

তেমন প্রার্থনার চিন্তা আমার স্বপ্নেও আসে না।

তবে কে কখন চলে যায় কে বলতে পারে? হঠাৎ মৃত্যু, অপমৃত্যু, অকাল মৃত্যু লেগেই আছে।

স্বাভাবিক নিয়মেও একজন আর একজনকে ছেড়ে যাচ্ছে।

কেউ বয়সের ক্রমানুসারেও যাচ্ছে না। কে কার আগে বা পরে যাবে কেউ বলতে পারে না। জটিল এই সংসারে কত কি ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে!

এসব ভাবলে টেনশনে বুড়ো আঙ্গুল মুখে চালান করে চোষা ছাড়া কিছু করার নেই।

কিন্তু যারা যাচ্ছে তারা কি নিয়ে যাচ্ছে?

যারা আরও কিছুকাল থাকবে তারা কি নিয়ে থাকবে?

জীবন তো একটাই, সামান্য কিছু কীর্তি সবারই রেখে যাওয়া উচিত—নয় কি?

আমার যা বয়স হয়েছে এখন তো স্বাভাবিকভাবেই যাবার কথা। অপ-মৃত্যু যোগ থাকলে হঠাৎও যেতে পারি। এই তো সেদিন ১৫/৫/৯ তারিখে আমি যখন রিক্সো থেকে নেমে একটু ডানে ঘুরেছি ঠিক তখনি আর একটা চলন্ত রিক্সো আমাকে এমন প্রচণ্ড ভাবে আচমকা ধাক্কা মারল আমি চিতপটাঙ।

সঙ্গে সঙ্গে আশে পাশের ছেলেরা আমাকে ধরে তুলল। আর রিক্সো ওয়ালাকে এ মারে তো সে মারে।

"আরে, আরে, ওকে মারছ কেন? আমি তো বেঁচে গেছি।"

আমার ব্যথা বা যন্ত্রনা থেকে ঐ রিক্সোওয়ালাকে ওদের মার থেকে বাঁচান-টাই আমার প্রধান কর্তব্য হয়ে গেল।

তা, সেদিন তো বেঁচে গেলাম। কিন্তু আজ রাতেই যদি ঘুমের মধ্যে আমার হৃদযন্ত্র বিকল হয় এবং আমি মরে যাই আমার মোটেও আফশোষ হবে না।

প্রাণ যখন ছেড়ে যায়নি যতদিন শ্বাস ততদিনই আঁশ।

আমার ভিতরে সব সময় ছটফটানি কি যেন লেখা হয়নি অথচ লেখা দরকার। আমার আত্মজীবনীটাও সম্পূর্ণ করা দরকার। সাহিত্য বিচারে আধুনিক চিন্তার দিক নির্দেশক না হলেও ওটা যে আমার কাহিনী যার মধ্যে আমার স্বজন-স্বজনীরা আমাকে দেখতে পাবে, আমার নানা রঙের দিনগুলি পাবে, একই সঙ্গে স্বপ্ন পূরণ আর স্বপ্ন ভঙ্গও দেখতে পাবে।

আমার কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকবে না, যদি থাকে, তখন ভেবে নিতে হবে মানুষ অনেক কাজই অসমাপ্ত রেখে চলে যায় —আমিও গেলাম ☐